মন ও মানুষ

॥ স্বামী অভেদানন্দের ব্যক্তিত্ব, বাণী ও চিন্তাধারা ॥

(প্রথম ভাগ)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা

॥ উৎসর্গ ॥

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো
স্বামী অভেদানন্দের কথা ও আলোচনা
শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যেই উৎসৃষ্ট হ'ল।

প্রকাশকের নিবেদন

'মন ও মানুষ'-গ্রন্থের দ্বিতীয় সুসংস্কৃত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হ'ল। দুটি ভাগে এবার গ্রন্থটি নূতন কলেবরে প্রকাশিত হতে চলেছে। এই প্রথম ভাগে একটি ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ 'ভূমিকা' এবং পনেরোটি স্মৃতিরূপ পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হ'ল। দ্বিতীয় ভাগও এ'ধরণের অনেকগুলি পরিচ্ছেদ সহ প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকলো। দ্বিতীয় ভাগের শেষে 'অতীতের পৃষ্ঠা থেকে' একটি মূল্যবান অংশ সংযোজিত থাকবে। প্রথম ভাগে প্রাগের বিদগ্ধ শিল্পী ফ্রাঙ্ক্ ডোরাকের (Frant Dvorak)-অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদাদেবী, স্বামী অভেদানন্দ ছাড়া তাঁদের স্টুডিওর দুটি মূল্যবান ছবি থাক্‌লো। ঐ ছবিগুলি এই প্রথম সাধারণ্যে প্রকাশ করা হ'ল। তাছাড়া ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ ও তাঁর মধ্যম-ভগ্নি হেলেনা ডোরাকের বহু চিঠির মধ্যে চারখানি চিঠির প্রতিলিপি দেওয়া হ'ল। তাছাড়া স্যর সি. ভি. রমণ, টমাস এ. এডিসনের ছবিসহ এডিসন-কর্তৃক প্রদত্ত গ্রামোফোন-যন্ত্রের একটি ছবি দেওয়া হ'ল এবং দেওয়া হ'ল আরও বহু ছবির প্রতিচিত্র।

'মন ও মানুষ'-গ্রন্থ নবকলেবরে বহু ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে প্রকাশিত হ'ল। আশা করি পাঠক-পাঠিকাবর্গের কাছে সমাদর লাভ করবে। ইতি

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

স্বামী প্রণবেশানন্দ
প্রকাশক

॥ সূচীপত্র ॥

॥ ভূমিকা ॥

'মন ও মানুষ' বিরাট ও বিচিত্র-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্থিতপ্রজ্ঞ স্বামী অভেদানন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-গ্রন্থ। সংক্ষিপ্ত পরিচয়-গ্রন্থ বলার উদ্দেশ্য তাঁর জীবনের ঘটনাবলী, চিন্তাধারা ও বিভিন্ন-বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং বিষয়সমীক্ষার বিস্তৃতি ও প্রসারতা অনেক বেশী, এই গ্রন্থে, সেজন্য সেই সকল-কিছুর উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও পরিচয় দান করা অসম্ভব। তাঁর বাল্য ও শিক্ষা-জীবন, দক্ষিণেশ্বরে প্রেমময় আচার্যের নিকট সাধনার ও অভিজ্ঞতার জীবন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনের পর সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে থেকে কৃচ্ছ্রসাধন-জীবন, পরে পরিব্রাজক-জীবন, পাশ্চাত্যদেশে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের শিক্ষাদান-জীবন, পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতে কর্মচঞ্চল-জীবন, সংঘজীবন ও বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টার জীবন এবং সর্বোপরি ব্রহ্মানুভূতির পর আনন্দময়-জীবন প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ-সমন্বিত জীবন-সম্বন্ধে পরিচয় দান করা সত্যই কষ্টসাধ্য, চিন্তাসাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য। এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ছিল নাতিদীর্ঘ কয়েকটি স্মৃতিসম্বলিত স্বামী অভেদানন্দের দীপ্তিময় ও কীর্তিময় জীবনের সাধারণ রূপরেখা. কিন্তু বর্তমান দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ আরও প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ঘটনাপুঞ্জের স্মৃতিকে নিয়ে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত। বর্তমান সংস্করণের রূপ ও প্রকৃতি একেবারে অসাধারণ ও নূতন নয়, কিন্তু তাহলেও বলি যে, পুরাতন ও নূতন অনেক-কিছু কথা ও কাহিনীর উপকরণকে নিয়ে একটু নূতন আকারেই প্রকাশিত হ'ল। বর্তমান বর্ধিত-দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম ও দ্বিতীয় এই উভয় খণ্ডেই পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সংযোজন থাকলো। আর বলে রাখা ভাল যে, সকল স্মৃতিরূপ পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়গুলির উপাদান সংক্ষেপে সূত্রাকারেই লিপিবদ্ধ ছিল, পরে ঐ সূত্রগুলিকে স্মৃতির ফলকে জাগ্রত থাকার কাহিনী ও ঘটনাগুলিকে গ্রন্থাকারের নিজের ভাষায় রূপদান করা হয়েছে। কাজেই লেখার মধ্যে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা বিচিত্র নয়, বরং স্বাভাবিক। সেজন্য ভাষার ও ভাবের অভিব্যক্তি যেখানেই মলিন ও অবরুদ্ধ দেখাবে, সেখানে সম্পূর্ণ ত্রুটি-বিচ্যুতি লেখকেরই, স্বামীজী মহারাজ বলতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নয়। বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে

॥ ২ ॥

'অতীতের স্মৃতি থেকে'-পর্যায়ে এদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন মনীষীদের চিঠিপত্র ও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ-সম্বন্ধে অভিমতের উল্লেখ করা থাকবে—উদ্দেশ্য যে, সাধারণ ও অসাধারণ মানুষের এবং মহামনীষীদের চক্ষে স্বামী অভেদানন্দের ব্যক্তিত্বময় ও প্রতিভাদীপ্ত জীবন কী ধরনভাবে প্রতীত ও অনুভূত হয়েছিল—সে'সবেরই পর্যালোচনা বা সমীক্ষা লিপিবদ্ধ করা। স্বামী অভেদানন্দের জীবনচরিত্রের পরমসমীক্ষা ও চরমবিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল তাঁর প্রেমময় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিজের দ্বারাই। তিনি স্বয়ং নিরূপণ করেছিলেন শুধু স্বামী বিবেকানন্দের ও স্বামী অভেদানন্দের দিব্যসত্তা ও প্রকৃতি নয়, তাঁর সমস্ত অন্তরঙ্গশিষ্যদের দিব্যসত্তা ও প্রকৃতি। অন্তরঙ্গপার্ষদরা ছিলেন লীলাকর্মসঙ্গী এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ছিলেন আদ্যাশক্তিরূপিণী লীলাসঙ্গিনী। সুতরাং এঁদের সম্বন্ধে সাধারণ অজ্ঞানবিলাসী মানুষ যা-ই চিন্তা করুক না যা ই বলুক না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপরিকরদের বা পার্ষদদের তাতে কিছু যায় আসে না সে'সবে তাদের মহিমার সার্থকতার কোন হানি হয় না বা হবে না একথা জানি। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গলীলাপরিকর বা পার্ষদ কারা, শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপরিমণ্ডলে কাদের সার্থকতা ও আবশ্যকতা কম বেশী, কারা পার্ষদ ও কারা পার্ষদ নন—সে'সবের সিদ্ধান্ত ও যৌক্তিকতা বরং শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই নির্ধারণ ও নিশ্চয় ক'রে গেছেন, সেজন্য ঐ সম্বন্ধে অন্যান্য চিন্তানায়ক ও জীবনীলেখকদের কথা ইহবাহ্য ও অবান্তর।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ চিরদিন ছিলেন স্বাধীন স্বতন্ত্র-চিন্তায় বিশ্বাসী। স্পষ্টবাদী ছিলেন তিনি সকল সময়েই, এজন্য বিরাগভাজন হতেন কখনও কখনও অনেকের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঊনবিংশ-বিংশ শতকে এসেছিলেন পুরাতন সকল-কিছু রূপ ও আদর্শকেইমাত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয়, তিনি এসেছিলেন নূতনরূপে নূতনভাবে পুরাতন সমাজের বুকে নূতন পরিবেশ ও নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গলীলাসহচররা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণসূত্রেরই জীবন্ত ভাষ্যকার, অর্থাৎ সূত্রাকারে যা নবযুগের অবতার পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব করেছেন ও সমগ্র বিশ্বসমাজকে দিয়ে গেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদরা সেই সবেরই বিশদব্যাখ্যা দিতে ও পুরাতনের বুকে নূতনের প্রলেপ শুধু নয়, নূতনের জাগরণ ও প্রাণস্পন্দনকে মূর্ত ও জাগ্রত করতে এসেছিলেন। তাই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রায়ই বলতেন:

'স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) যা বলেছেন ও যা দিয়েছেন, আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তবে বর্তমান সমাজ-মনের ও সমাজ-চিন্তার অনুরূপ করেই অনেক নূতন-কিছু বলতেন ও দিতেন, পুরাতনের ও গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তি মোটেই করতেন না তিনি। আমরা তাই বলি যে, শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দের সচঞ্চল নবসংস্কারকারী জীবন ও আদর্শকে অনুসরণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের নবজাগ্রত ভাব ও আদর্শকে আমাদের সকলের জীবনে ও সমাজে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণধর্মে গতানুগতিকতার স্থান নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় জীর্ণ-পঙ্কিল-পুরাতন পরিবেশের সমাদর নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং তাঁর সমস্ত অন্তরঙ্গ-লীলাপার্ষদের বাণী ও আদর্শই তাই যে, সমাজে, মানব-মনে ও জীবনে নূতন ধারণা, নূতন সাধনা ও নূতন জীবনাদর্শকে আবার জাগ্রত করতে হবে, তবেই জয়যুক্ত ও সার্থক হবে নবযুগবাহী অবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব এবং কল্যাণময় হবে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজেরও বাণী ও জীবনের উদ্দেশ্য।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে তাঁর জীবন-বিবরণের কথা লিখে গেছেন—যে বিবরণ অন্যান্য জীবনীকারদের অপেক্ষা নূতন এবং শ্রীরামকৃষ্ণজীবনলীলাক্ষেত্রে গ্রহণীয় ও বরণীয়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে ইংরাজী ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, ২রা অক্টোবর থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ-পর্যন্ত জীবনঘটনাবলী লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৯।১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জীবনঘটনাবলী সময়াভাবে আর লিপিবদ্ধ ক'রে যেতে পারেন নি—যদিও সেই সকল ঘটনার অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে গ্রন্থকাররা পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ নিজেই তাঁর ডায়েরীগুলিতেও লিখে রেখে গেছেন। পুনরায় নিজের লেখা পরপর ডায়েরীগুলি (Diary) থেকে জীবনের শেষের দিকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Leaves from My Diary* নাম দিয়ে ইংরাজীতে পাশ্চাত্যদেশে (লণ্ডনে ও আমেরিকায়) থাকাকালীন তাঁর জীবনের কার্যাবলীর বিবরণ লিখতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে মাস-পর্যন্ত তদানীন্তন আশ্রমের ও নিজের জীবনের ঘটনাবলীর বিবরণ লেখার পর পরবর্তী আর কোন ঘটনাবলী লেখার সময় পান নি, সুতরাং অসমাপ্তই থেকে গেছে কিছুকালের জন্য নিজের লেখার দিক থেকে। তিনি জীবনবিবরণ

লেখার আরম্ভ করেছিলেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট শুক্রবার থেকে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই আগস্ট শুক্রবারের তাঁর বিবরণ হ'ল :

"On Friday, August 6th, 1897 A.D., at 3-30 p.m. after sailing from Southampton by S.S.St. Paul of the American Line, I landed at the port of New York, the commercial capital of the United States of America .."

The Complete Works of Swami Abhedananda, Vol. X-গ্রন্থের ভূমিকায় (Preface) আমরাই উল্লেখ করেছি : "In 1896, Swami Vivekananda needed his help in London, and Swami Abhedananda threw himself heart and soul into the work of preaching to the people of the West, Vedanta, as represented and realized in the luminous life of his Divine Master, Sri Ramakrishna···As a devout religious teacher, as a powerful preacher, who carried conviction into the hearts of the people, and as a saintly man, the name of Swami Abhedananda soon spread far and wide into the homes of the people of America—the United States, Canada, Alaska, Mexico, Brazil, Argentine Republic."

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকা থেকে একবার ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে পদার্পণ করেন এবং পরিশেষে হনলুলু ও কোয়ালালামপুর হয়ে ভারতে একেবারে প্রত্যাবর্তন করেন প্রায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে। ভারতে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি কাশ্মীর ও তিব্বত পরিদর্শন করতে রওহনা হন এবং তিব্বত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন বেলুড়মঠে। কাশ্মীর হয়ে লাদাকে উপনীত হয়ে হিমিস-মঠে তিনি আবিষ্কার করেন রাশিয়ান-পর্যটক নিকোলাস নটোভিচের মতোই ভগবান যীশুখৃষ্টের জীবনের বহু গোপন ও অপ্রকাশিত তথ্যের। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ-লিখিত 'কাশ্মীর ও তিব্বতে'-গ্রন্থ (৪র্থ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৮৯৭) থেকে তাই ঐ বিবরণের কিছু-কিছু এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম—

(এক)

"হিমিস-মঠের নানা স্থানে নানাপ্রকার মণিচক্র স্থাপিত আছে। কোথাও বৃহৎ মণিচক্রটি ঝরণার জলের চাপে আপনি ঘুরিতেছে ও উহার সহিত সংযুক্ত

একটি ঘণ্টা আপনা-আপনি বাজিতেছে। কোথাও ছোট ছোট ঢোলের মতো মণিচক্রগুলি লাইনবন্দীভাবে সাজানো রহিয়াছে। প্রায় দশ-বারোটি ঘরে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্তি রহিয়াছে। এই প্রকারের দেবদেবীর মূর্তি ইতিপূর্বে আমরা অন্যান্য মঠে দেখিয়াছি ও বর্ণনা করিয়াছি। একটি অন্ধকার-ঘরে স্তাগ-সাঙ্গ-রস-চেন নামক লামা-গুরুর প্রতিমূর্তি রহিয়াছে। উহার দিব্যকান্তি, উন্নত দেহ ও প্রশস্ত ললাট বীরত্বব্যঞ্জক। ইনিই এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ইহাকে অনেকে ব্যাঘ্র-লামা বলিয়া থাকেন। অধিকাংশ মূর্তিই সুবর্ণ ও রৌপ্য-নির্মিত। অন্যান্য ধাতু-নির্মিত-মূর্তি এই স্থানে কমই আছে। যে কয়েকটি স্তূপ রহিয়াছে তাহারা আগাগোড়া রূপার তৈরী ও তাহাদের মধ্যে নানাবিধ মূল্যবান পাথর ও সোনার কারুকার্য করা। মূর্তিগুলির দেহের অলঙ্কার সোনা ও মূল্যবান পাথরে নির্মিত। অলঙ্কারের মধ্যে হাতে বালা ও অনন্ত, গলায় হাঁসুলি ও দড়াহার এবং মাথায় সোনার শিরস্ত্রাণই প্রধান। একটি দেবীমূর্তি রহিয়াছে,—এরূপ মূর্তি ইতঃপূর্বে আর কোথাও দেখি নাই। ইহা মন্দরা বা কুমারী দেবীর। ইনি পদ্মসম্ভবের গুরু (রিন্ পোচের) পত্নী ও শান্তরক্ষিতের[১] ভগ্নী। ইনি স্বামীর সহিত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে উত্তর-ভারতের উদ্যান নামক স্থান হইতে ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে মহাযান-বৌদ্ধ-মতবাদ প্রচার করিতেন। সাং যে, চিং ফুগ প্রভৃতি মঠে ইঁহাদের মূর্তি প্রত্যহ ভক্তিভরে পূজা হইয়া থাকে। লামারা পদ্মসম্ভবকে মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া থাকেন।

"হিমিস্-মঠে প্রায় দেড়শত দুগ্-পা-সম্প্রদায়ের গ্যে-লোং বা ভিক্ষু বাস করেন। ইঁহাদের টুপি লালরঙের। প্রত্যেকের ঘর স্বতন্ত্র। ছাদের উপরের ঘরে খাঙ্পো বা মঠাধ্যক্ষ বাস করেন। মঠাধ্যক্ষ অল্প ইংরাজি ও হিন্দী জানেন। আমাদের যিনি তত্ত্বাবধান করিতেছেন তিনি ছাড়া অন্যান্য লামারা কেহই তিব্বতী-ভাষা-ব্যতীত অন্য কোন ভাষা জানেন না। লে হইতে একজন দক্ষ দোভাষী সঙ্গে না আনিলে এখানে কথাবার্তা বলিতে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা হইত।

"প্রায় পাঁচ বিঘা জমি লইয়া মঠটি অবস্থিত। মঠের পূর্বদিক ব্যতীত সকল দিকেই উচ্চ উচ্চ পাহাড়। কতক অংশ পাহাড়ের গায়ের সহিত সংযুক্ত। এই

১। ইঁহার লিখিত বিখ্যাত 'তত্ত্ব-সংগ্রহ'-গ্রন্থ বরোদা-প্রকাশন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মঠটির অধীনে অনেকগুলি ছোট-বড় মঠ, গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র আছে। মঠের কুশাক (মোহান্ত) মহাশয়ের অসংখ্য গৃহস্থ শিষ্য ও ভক্ত আছে। তিনি বৎসরে একবার সকল শিষ্যের বাড়ী গমন করেন ও বহু অর্থ প্রণামীস্বরূপ পাইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত কাহারও কোন অসুখ হইলে বা প্রেতাত্মার ভর হইলে ইনি যাইয়া উঁহাকে দেখিয়া আসেন, তাহা হইতেও যথেষ্ট পারিশ্রমিক উপার্জন করেন। তাঁহার এই আয় হইতেই মঠের সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে।

"কয়েক বৎসর পূর্বে ডক্টর নিকোলাস নটোভিচ নামক একজন রুশদেশীয় পর্যটক তিব্বত-প্রদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এই গুম্ফার নিকট একটি পাহাড় হইতে পড়িয়া গিয়া একটি পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। পরে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে এই মঠের অতিথিশালায় লইয়া আসেন ও লামারা সেবা-শুশ্রূষা করিয়া দেড়মাস পরে তাঁহাকে আরোগ্য করেন। সেই সময়ে তিনি একটি লামার নিকট হইতে সংবাদ পান যে, যীশুখৃষ্ট ভারতে আসিয়াছিলেন ও সেই বিষয়টি মঠের পাঠাগারে অবস্থিত একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে বর্ণিত আছে। তিনি উহা জনৈক লামার দ্বারা আনাইয়া দেখেন ও উহার ইংরাজী-ভাষার অনুবাদ করিয়া লন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি 'দি আন্‌নোন লাইফ অফ জিসাস্" (যীশুর অপ্রকাশিত জীবনী) নামক একখানি পুস্তক লেখেন। তিনি সেই পুস্তকে উক্ত বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করেন।

"স্বামী অভেদানন্দ পূর্বে এই পুস্তক আমেরিকায় অবস্থানকালে পাঠ করিয়া বিশেষ উৎসাহিত হন এবং তাহার বর্ণনা সত্য কি-না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া হিমিস্-মঠ স্বচক্ষে দেখিতে আসেন। স্বামীজী এই মঠের লামাদের নিকট সন্ধান করিয়া জানিলেন যে, ঐ বিষয়টি সত্য। ঐ বিষয়টি যে পুস্তকে লিখিত রহিয়াছে তাহা স্বামীজী দেখিতে চাহিলেন।

"যে লামা স্বামীজীকে সমস্ত দেখাইতেছিলেন, তিনি একখানি পুঁথি তাক (সেল্ফ্) হইতে পাড়িয়া স্বামীজীকে দেখাইলেন এবং বলিলেন এইখানি আসল পুঁথির নকল। আসল পুঁথিখানি লাসার নিকটবর্তী 'মারবুর' নামক স্থানের মঠে রক্ষিত আছে। উহা পালিভাষায় লিখিত, কিন্তু এইখানি তিব্বতীয়-ভাষায় অনুবাদ করা। ইহা চৌদ্দটি পরিচ্ছেদ এবং ২২৪টি শ্লোকযুক্ত। স্বামীজী তাঁহার (লামার) সাহায্যে ইহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া লইলেন।"

॥ অনুবাদ ॥

যীশুখৃষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়া কি কি করিয়াছিলেন, মাত্র তাহাই উক্ত পুঁথি হইতে এইস্থানে উদ্ধৃত হইল—

১০। "ক্রমে ঈশা ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই বয়সে ইস্রাইলরা জাতীয় প্রথানুযায়ী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাঁহার পিতামাতা সামান্য গৃহস্থের ন্যায় দিন যাপন করিতেন।

১১। "তাঁহাদের সেই দরিদ্র-কুটির, ক্রমে ধনী ও কুলীনগণের দ্বারা মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং প্রত্যেকেই ঈশাকে নিজ নিজ জামাতৃ-পদে বরণ করিতে উৎসুক হইলেন।

১২। "ঈশা বিবাহ করিতে নারাজ ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্বেই বিধাতৃ-পুরুষের স্বরূপ-ব্যাখ্যায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিবাহের কথায় তিনি গোপনে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন।

১৩। "তখন তাহার মনের মধ্যে এই বাসনা প্রবল ছিল যে, তিনি ভগবৎ-সাধনায় পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধিলাভ করিবেন এবং যাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ধর্মশিক্ষা করিবেন।

১৪। "তিনি জেরুজালেম পরিত্যাগ করিয়া একদল সওদাগরের সঙ্গে সিন্ধুদেশ-অভিমুখে রওহনা হইলেন। উহারা সেখান হইতে মাল (দ্রব্যসামগ্রী) লইয়া যাইয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানী করিত।

* * *

১। "তিনি (যীশু) চোদ্দ বৎসর বয়সে উত্তরসিন্ধুদেশ অতিক্রম করিয়া পবিত্র আর্যভূমিতে আগমন করিলেন। * *

২। "পঞ্চনদ-প্রদেশ দিয়া যখন তিনি একাকী যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সৌম্যমূর্তি, প্রশান্ত-বদন ও প্রশস্ত-ললাট দেখিয়া ভক্ত-জৈনরা (লামারা) তাঁহাকে ঈশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।[১]

১। যে মূলপুঁথির তথ্যাবলী অবলম্বনে নিকোলাস নটোভিচ 'যীশুর অপ্রকাশিত জীবনী' নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থটি লিখিয়াছিলেন, সেই পুঁথি হইতে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রধান প্রধান বিষয় 'কাশ্মীর ও তিব্বতে'-গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত আছে।

৩। "এবং তাঁহাকে তাঁহাদের মঠে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, কারণ সেইকালে কাহারও যত্ন তিনি পছন্দ করিতেন না।

৪। "তিনি ক্রমে ভগবান কৃষ্ণের লীলাভূমি জগন্নাথধামে উপনীত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি সকলের প্রিয় হইলেন এবং সেখানে বেদ পাঠ করিতে, বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

* * * *

"অতঃপর তিনি রাজগৃহ, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে ছয় বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তু যাত্রা করিলেন।

"সেখানে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের সহিত ছয় বৎসব থাকিয়া পালি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। **

"সেইখান হইতে তিনি নেপাল এবং হিমালয় * * পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন।" * *

"ক্রমে তিনি জরথুষ্ট্রমতাবলম্বী পারস্যদেশে[২] আসিয়া উপনীত হইলেন। * *

"* * শীঘ্রই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। * *

"এইরূপে তিনি উনত্রিশ বৎসর বয়সে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অত্যাচারপ্রপীড়িত স্বজনগণের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

"লামাজী বলিলেন, যীশুখৃষ্ট পুনরুত্থানের (রেজারেক্সন্) পর গোপনে কাশ্মীরে আসিয়াছিলেন এবং বহু শিষ্য-কর্তৃক সমাদৃত হইয়া লাদাকের মঠে বাস করিয়াছিলেন।[৩]

২। এই সময়ে কাবুলের নিকট আসিয়া যীশু পথিপার্শ্বস্থ একটি পুষ্করিণীতে হাত-মুখ ধুইয়াছিলেন ও সেখানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এখনও ঐ জলাশয়টি বিদ্যমান আছে, উহাকে ঈশা-তালাও বলে। ঐ উপলক্ষ্যে ঐ স্থানে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসে। 'তারিখ-ই-আঝাম' নামক আরবি-গ্রন্থে এই বিষয়টি বর্ণিত আছে।

৩। খানাইয়ারীতে যীশুখৃষ্টের কবর (Tomb) অদ্যাপিও বর্তমান আছে। এ' সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী স্বর্গীয় রামতীর্থও নিজের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

"যীশুকে উচ্চ-অবস্থার সাধক জানিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে ভক্তেরা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহন করিতেন। সেই সময়ে যে সকল তিব্বতবাসী তাঁহাকে দেখিয়াছিল এবং যে সকল সওদাগর তাঁহাকে তাঁহার দেশের রাজা কর্তৃক ক্রুশে বিদ্ধ হইতে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের মুখে শুনিয়া আসল পুঁথিখানি তাঁহার দেহত্যাগের ৩।৪ বৎসর পরে পালি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। যীশুখৃষ্টের ভারতে আগমন-সম্বন্ধে নানা স্থানে যে সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত দৃষ্ট হয়, সেইগুলি সমস্ত একত্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিলে তাহা যে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বিখ্যাত মনীষী ও রাজনৈতিক নেতা বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ১৩৩৩ সালের মাঘমাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'সত্তর-বৎসর'-নামক আত্মজীবনচরিত-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মুখ হইতে শ্রুত বলিয়া নাথ-যোগীদিগের সহিত মহামানব যীশুখৃষ্টের যোগসম্বন্ধে একটি বিশেষ কৌতুকাবহ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি—

"পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম যে, তিনি একবার একদল যোগী-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আরাবল্লীপর্বতে গিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের যোগীদের 'নাথ' উপাধি ছিল। ইঁহারা 'নাথযোগী' বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন। ইঁহাদের সম্প্রদায়-প্রবর্তকদিগের মধ্যে 'ঈশাইনাথ' নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনী এই নাথযোগীদের ধর্মপুস্তকে লিখিত আছে। গোস্বামী মহাশয়কে একজন নাথযোগী তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ হইতে ঈশাইনাথের জীবনচরিত পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। খৃষ্টানদের বাইবেলে যীশুখৃষ্টের জীবনচরিত যে'ভাবে পাওয়া যায়, ঈশাইনাথের জীবনচরিত মোটের উপর তাহাই।

"ইহার উপরে বিপিনবাবু নিজে মন্তব্য করেন: 'বাইবেলে যীশুর যে জীবন-ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দ্বাদশ হইতে ত্রিংশৎ ১২-৩৩ বর্ষ-পর্যন্ত এই আঠারো বৎসরের যীশুর জীবনের কোন খোঁজ-খবর (সন্ধান) মিলে না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সময়ের মধ্যে যীশু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তিনিই নাথযোগী-সম্প্রদায়ের এই ঈশাইনাথ।

"যীশুখৃষ্টের জন্মভূমি প্যালেষ্টাইনে এসিনী[১] নামে এক সম্প্রদায় যীশুখৃষ্টের পূর্বেই বর্তমান ছিল। ইহারা নাথ-যোগীদেরই ন্যায় যোগী-সম্প্রদায় ছিল এবং যীশু এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সম্বন্ধে একজন পুরাতত্ত্ববিদ্ মনীষী আর্থার লিলি তাঁহার 'ইন্ডিয়া ইন্ প্রিমিটিভ্ ক্রিশ্চিয়ানিটি'-পুস্তকে (২০০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন: "যীশু একজন এসিনী ছিলেন এবং ভারতীয় যোগীদের ন্যায় নিভৃত স্থানে ব্রহ্মের সহিত একত্ববোধ এবং পরমাত্মার আশীর্বাদ লাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন"।

'এসিনী'-নামের মূলে আমাদের নিকট ভারতীয় 'ঈশান' নাম বলিয়াই বোধ হয়। ঈশান শিবেরই অন্যতম নাম, শিবই বিশেষভাবে যোগের দেবতা। 'এসিনী'-নামটি তাহা হইলে ঈশান বা শিবের উপাসক অর্থে ঈশানী'-নামেরই রূপান্তর বলিয়া অনুমিত হয়। ঈশও শিবের বিশেষ নাম। ঈশাই-নাথ নামও ঈশের বা শিবের উপাসক অর্থ প্রকাশ করে। 'নাথ'-শব্দটি পৃথক-ভাবে শিবেরও স্বরূপ-জ্ঞাপক। যোগী-সম্প্রদায় নাথের বা শিবের উপাসক বলিয়াই নাথ নামের যোগের দ্বারা নাথ যোগী বলিয়া অভিহিত হইত। যীশুখৃষ্ট সম্ভবতঃ নাথযোগী-সম্প্রদায়ের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, উপাস্য-দেবতার নামে ঈশাই-নাথ[২] আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্যালেস্তাইনে ঈশানী-যোগী-সম্প্রদায় থাকিলেও সেই সম্প্রদায়ের মূলস্থানে বিশেষরূপ শিক্ষার জন্য যীশুখৃষ্ট

১। এসিনীদের ইতিহাস-সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত 'ভারত ও তাহার সংস্কৃতি' ('ইন্ডিয়া এণ্ড হার্ পিপ্ল'-এর বঙ্গানুবাদ) পুস্তকে বিস্তৃতভাবে তথ্যসহকারে আলোচনা করা হইয়াছে।

২। মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্রে, যীশু, ঈশা নামে পরিচিত। নাথ-যোগীদিগের ঈশাই নাম হইতেই যে এই নাম পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোঝা হয়। ঈশা-নামের সঙ্গে মেসায়ার অপভ্রংশ 'মসি' নাম যুক্ত হইয়া মুসলমান-দিগের মধ্যে যীশুর পুরা নাম 'ঈশা-মসি' হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণে যীশুর এই নামটি এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

ঈশমূর্তির্হৃদি প্রাপ্ত্যা নিত্যশুদ্ধা শিবঙ্করী
ঈশা-মসীহ ইতি চ মম নাম প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবত ঠিক নহে (?)।[৩] 'ঈশ'-শব্দের অর্থ প্রভু, ঈশ্বর, নাথ শব্দেরও অর্থ প্রভু। ইহাতে যীশু যে, ঈশ্বরকে 'লর্ড' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং নিজেও তাঁহার ভক্তবৃন্দ কর্তৃক 'লর্ড' নামে সম্বোধিত হইয়া থাকেন তাহার সুন্দর ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়" (পৃঃ ১৫৩-১৫৪)।

(দুই)

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮০ তারিখে 'পরিবর্তন' পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যায়) পরিবর্তন-নিউজ-ব্যুরো 'যীশু দু'বার ভারতে এসেছিলেন'-শীর্ষক যে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন তা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের লিখিত বিবরণকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য। সেজন্য আমরা 'পরিবর্তন'-পত্রিকার মাননীয় সম্পাদক অশোক চৌধুরী এবং সংযুক্ত সম্পাদক ধীরেন দেবনাথের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকলাম। 'পরিবর্তন-' পত্রিকা থেকে এখানে বিষয়টি হুবহু উদ্ধৃত করা হ'ল—

"১৮৮৭ খৃস্টাব্দে নিকোলাস নাটোভিচ নামে এক রাশিয়ান-পর্যটক বেরিয়ে পড়লেন পৃথিবী ঘুরতে। তখন প্রাচ্য-ভূখণ্ডে তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার প্রচণ্ড লড়াই চলছে সাম্রাজ্য বিস্তারের তাগিদে। এই যুদ্ধ হয়েছিল ১৮৭৭ থেকে এক বছর ধরে। নাটোভিচ এই সময়ই বলকান-উপত্যকার পরিস্থিতি বোঝার জন্যে সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। মধ্য-এশিয়া ও পারস্যের-ককেশিয়ান-পর্বতমালা পেরিয়ে তিনি ভারতে ঢোকেন ১৮ ৭ খৃষ্টাব্দে। ভারতে আসার জন্যে নাটোভিচ শৈশব থেকেই স্বপ্ন দেখতেন।

৩। ফরাসী-মনীষী আর্নেস্ট রেনাঁ লিখিয়াছেন : "যে এসিনীগণ ইহুদী-যুবকদের শিক্ষাদান করিতেন, তাঁহারা সংসারত্যাগী ছিলেন। ব্রহ্মণ্যধর্ম-প্রবর্তিত গুরুদের সহিত তাঁহাদের সাদৃশ্য ছিল। এই ব্যাপারে কি ভারতীয় মুনিদের আধ্যাত্মিক প্রভাব ছিল না"?—স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত 'ভারত ও তাহার সংস্কৃতি'।

অর্নেস্ট রেনাঁ যীশুখৃষ্টের একজন প্রামাণিক জীবনীলেখক, সুতরাং তাঁহার অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

"কিন্তু স্বপ্ন তাঁর ওলটপালট হয়ে গেল। লাদাকে গিয়েছিলেন নাটোভিচ বৌদ্ধ-গুম্ফাগুলি পরিদর্শনের জন্যে। এই পাহাড়ি-পথে চলতে চলতেই একদিন নাটোভিচ পা-হড়কে পড়ে যান এবং আর উঠতে পারেননি। কয়েকজন বৌদ্ধলামা তাঁকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে আসেন এবং হেমিস-গুমফায় থাকার জন্যে এক অনাবিষ্কৃত রত্নের সন্ধান পেয়ে গেলেন তিনি।

"কি সেই রত্ন? নাটোভিচ মঠের একজন লামার কাছে জানতে পারলেন, তাঁদের গ্রন্থাগারে এমন একটি হাতেলেখা পুঁথি আছে যাতে যীশুখৃষ্টের ভারতে থাকাকালীন পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে। আসল পালিভাষায় লেখা পুঁথি থেকে এটি তিব্বতী-ভাষায় অনুবাদ। মূল সেই পুঁথিটি আছে তিব্বতের মারবুর-গুমফায়। এই পুঁথিটি চোদ্দটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা, এতে মোট ২২৪টি শ্লোক আছে।

"উত্তেজিত নাটোভিচ এই পুঁথিটি অনুবাদ করিয়ে নেন এবং দেশে ফিরে 'দ্য আননোন-লাইফ অব জেসাস ক্রাইস্ট'-নামে একটি বই লেখেন। বইটি পরবর্তী-কালে ফরাসি থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন আলেকসিনা লোরেনজার এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তা প্রকাশও করেন।

"এই বইতে নাটোভিচ লিখেছেন: 'In reading the life of Issa (Jesus Christ), we are at first struck by the similarity between some of its principal passages and the Biblical narrative, while on the other hand, we also find equally remarkable contradictions, which constitute the difference between the Buddhist version and that found in the Old and New Testaments'.

"নাটোভিচ বলেছেন, সম্ভবত মিশরও তখন রোমান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ব'লে যীশু মিশরে না গিয়ে ভারতে আসেন। আর ভারতের শিল্পকলা ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের কথা তাঁর কানেও পেঁছৈছিল।

"প্রথমবারের ভারত-ভ্রমণ-সম্বন্ধেও নাটোভিচের মতো, St Luke says: 'He was in the desert till the day of his shewing into Isrel. Which conclusively proves that no one knew where the young man had gone, to so suddenly reappear sixteen years later.'

"হেমিস-গুম্ফার এই পুঁথিতেই আছে : 'তিনি (যীশু) চৌদ্দ বৎসর বয়সে উত্তর-সিন্ধুদেশ অতিক্রম করতঃ পবিত্র আর্যভূমিতে আগমন করিলেন।

"এখানেই আছে—তিনি কাশ্মীর থেকে বেনারস হয়ে জগন্নাথধাম পর্যন্ত এবং সেখান থেকে কপিলাবস্তু যান। পরে ফেরার পথে পারস্যে জরোথ্রুস্ট-ধর্মের সঙ্গেও পরিচিত হন। ক্রুশবিদ্ধ হবার পর তিনি ভারতেই এসেছিলেন।

"স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় থাকার সময়ে নাটোভিচের এই বইখানি পড়ে উৎসাহিত হন এবং ঘটনার সত্যানির্ণয়ের জন্যে সুযোগ খুঁজতে থাকেন। ১৯২১ খৃস্টাব্দে আমেরিকা থেকে ফিরেই ১৯২২ সালের ১৪ জুলাই বেলুড় মঠ থেকে যাত্রা শুরু ক'রে কাশ্মীর ও তিব্বতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কাশী রামকৃষ্ণ-মিশনে এসে উঠেন। ১৭ জুলাই সেখান থেকে কাশ্মীর চলে যান। 'কাশ্মীর ও তিব্বতে'-নামে বইতে এই হেমিস-গুম্ফা-সম্পর্কে আছে : 'স্বামীজী এই মঠের লামাদের নিকট সন্ধান করিয়া জানিলেন ঐ বিষয়টি সত্য। ঐ বিষয়টি যে পুস্তকে লিখিত রহিয়াছে তাহা স্বামীজী দেখিতে চাহিলেন। এবং বলা বাহুল্য প্রজ্ঞাপুরুষ স্বামী অভেদানন্দকে পুঁথিখানি দেখানো হয়। তিনি ঐ লামার সাহায্য নিয়েই পুঁথির কিছু অংশ অনুবাদ করিয়ে নেন। যীশু ভারতে এসে কি কি করেছিলেন তা এই পুঁথিতে পুঙ্খাণুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। লামা স্বামীজীকে একথাও বলেছিলেন যে যীশুর রিজারেকসনের পর গোপনে যীশু কাশ্মীর এসেছিলেন এবং বহু শিষ্য নিয়ে মঠে বাস করতেন. তাঁর সাধু চরিত্রের জন্যে দেশ-দেশান্তর থেকে ভক্তরা তাকে দেখতে আসতেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন।

"এই পুঁথির প্রামাণিকতা কি ? যীশুর সমসাময়িককালে যে'সব তিব্বতবাসী তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং রোম-সাম্রাজ্যের যে'সব সদাগর তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হতে দেখেছিলেন তাঁদের মুখে যীশু-বৃত্তান্ত শুনে তাঁর মৃত্যুর তিন-চার বছর পরে মূল-পুঁথিখানি পালিভাষায় লিখিত হয়েছিল। এই পুঁথিতেই যীশুর মুখ-নিঃসৃত বাণীও লিপিবদ্ধ করা আছে। নাটোভিচ বলেছেন, বাইবেলের সঙ্গে তার মিলও আছে। এরই এক জায়গায় রয়েছে : 'ইজরেল-বংশধর ইহুদিরা যে ভীষণ পাপকার্য করিয়াছে তাহা জানিয়া পৃথিবী কম্পিত হইল এবং দেবগণ স্বর্গলোক হইতে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন'। অথবা 'এই সংবাদ ইজরেল-

দেশীয় বণিকগণ এদেশে আসিয়া এইরূপ করিয়াছে'। এবং ইজরেলের দেশে এক অপূর্ব শিশুরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এই শিশুর মুখ দিয়া জগদীশ্বর দেহের অনিত্যতা ও আত্মার মহিমা বলিতে লাগিলেন।

"আহমেদিয়া-ধর্মসম্প্রদায় এখনও-পর্যন্ত মনে করে যে, ঈশা অর্থাৎ যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেননি। তাঁরা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান ও বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই বক্তব্যের যুক্তি দেখান। তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এমন কথাও বলেছেন, যীশু ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেন নি। তিনি অশেষ-যন্ত্রণায় অজ্ঞান ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন। প্রায় ছ' ঘণ্টা ক্রুশে থাকার পর তাঁর প্রিয় শিষ্যরা গোপনে তাঁকে নামিয়ে নিয়ে আসেন।

"গুহার ভিতর সুস্থ হবার পর শিষ্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন তিনি (যীশু)। অতঃপর বেরিয়ে পড়লেন নিজ উপজাতির খোঁজে। দিনের পর দিন দুর্গমতর পাহাড়-পর্বত, অগম্য উপত্যকা, গিরিপথ, বরফস্তীর্ণ পথ এবং গ্লেসিয়ার পেরিয়ে কাশ্মীরের পহলগাঁও-তে এসে পৌঁছলেন যীশুখৃষ্ট।

"ইহুদি-উপজাতিগুলি যীশুর জীবনকালেই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কাশ্মীরে এসে এদের মধ্যে যীশুখৃস্ট তাঁর স্ব-উপজাতি-সম্প্রদায়কে যে খুঁজে পেয়েছিলেন এর থেকে সেটাও প্রমাণ হয়।

"জন নোয়েল নামে এক লেখক কাশ্মীরের অধিবাসীদের দেখে বেরনিয়ের মতই বলেছিলেন, কাশ্মীরের কৃষকদের চওড়া কাঁধ এবং স্থাপত্যসদৃশ চেহারা দেখে প্রাচীন সেই ইহুদিদের কথা মনে পড়ে যায়। ইহুদিদের মতই নিরীহ ও শান্ত এদের আচার আচরণ। নোয়েলের মতে, এখন যে ইহুদিদের চেহারা দেখতে আমরা অভ্যস্ত সেই চেহারা নয়, এরাই যেন খাঁটি ইহুদি। বিশেষত কাশ্মীরীদের লম্বা-জোব্বা—সে কথা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দেয়।

"নোয়েলও বলেছেন যে, কাশ্মীরীরা সেই প্রাচীন কালের ইহুদি এবং যীশুখৃস্ট এদের মধ্যেই এসে বসবাস করতেন। তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেননি বলে এখানকার বিশ্বাস। নিজের হারানো উপজাতির সন্ধানে এখানে আসেন এবং তাদের সন্ধান পান।

"কাশ্মীরীদের মধ্যে ধর্মোপদেশ দেওয়া হ'ত ছোট ছোট গল্প ব'লে—যাকে বলা হয় প্যারাবেলস্। গবেষকদের মতে এটি একেবারেই ইহুদি-ঐতিহ্য। আগেকার কাশ্মীরীরা প্যারাবেলসের মধ্য দিয়ে যেভাবে ধর্মপ্রচার করতো এখন

তার কিছু কিছু চালু আছে। যীশুখৃস্ট নিজেও নাকি বৌদ্ধ-ধর্মগুরুদের সঙ্গে ছোট ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে ধর্মালোচনা চালাতেন। নোয়েল বলেছেন, কাশ্মীরে যীশু কথিত সেইসব গল্পেরই কিছু চালু রয়েছে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে।

"এক ফরাসি লেখক সন্ধ্যাবেলা খানাইয়ারিতে যীশুর সমাধি দেখতে যায়। তিনি লিখেছেন: 'It was evening when I first arrived at the tomb, and in the light of the sunset the faces of the man and children in the street looked almost sacred. They looked like people of ancient times. Possibly they were related to one of lost tribes of Israel that they said to have migrated to India'.

"এই ফরাসি লেখক তাঁর 'সারপেন্ট অব প্যারাডাইস'-বইতে নতুন একটি কথা লিখেছেন। যীশুখৃস্ট নাকি যোগসাধানার কথা জানতেন। এই যোগসাধনার বলেই তিনি ইসরায়েলে ফিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বহু অসাধ্য কর্মকান্ড ঘটিয়েছিলেন। অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মগুরুদের কাছে তিনি শিখেছিলেন প্রতীকমুদ্রা।"

(তিন)

তাছাড়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময়ে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে George Routledge and Sons Ltd, London থেকে প্রকাশিত *The Adept of Galilee* (A Story and an Argument by the Author of the Initiate) গ্রন্থখানি সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দের লিখিত *How to be a Yogi*-গ্রন্থ থেকে 'WasChtrist a Yogi ?'-পরিচ্ছেদটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। *The Adept of Galilee*-গ্রন্থে প্রকাশিত 'The Science of Yoga not Confined to India'-শীর্ষক আলোচনায় গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন—

"But it will immediately be asked, how did Jesus come to learn Yoga-Vidya, when there is no evidence of the fact that he ever visited India? And here we are confronted with the

absence of knowledge concerning research on the subject, beyond the narratives to be found in the New Testament ; for, we shall see later, although it matters not whether He (Jesus) went to India or not, yet there are two documents set before the public (out of a goodly number) which state this to be the case. And the first is *The Gospel of the Holy Twelve*, which purports to be 'one of the most ancient and complete of the early Christian fragments, preserved in a monastery of Buddhist Monks in Thibet, where it was hidden by some of the Essene community for safety from the hands of corrupters', while another is the *Unknown life of Jesus Chirst*, discovered also in the monastery, by a Russian, named Notovitch, while travelling in India······Certainly it was known to exist in Egypt, and as the New Testament writers are silent respecting the doings and whereabouts of Jesus from His 12th to His 30th years of age, it is more than probable, taking everything into account, that He (Jesus) journeyed in search of knowledge and having passed His final initiation at about the age of 30, returned in order to undertake His great mission in Palestine" (pp. 15-16). *The Adept of Galibe*'-গ্রন্থে লেখক স্বামী বিবেকানন্দের নামেরও উল্লেখ করেছেন : 'Now until that great Hindu orator, Swami Vivekananda, came to the Western world some twenty years ago ··· ·" (p. 16).

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রায় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কলকাতায় তাঁর কর্মকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন এবং কর্মকেন্দ্রের নামকরণ করেন 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটী'। প্রথমে মেছুয়াবাজারে, পরে ইডেন হস্পিটাল রো-তে, তারপর বিডন স্ট্রীটে ও পরিশেষে নিজস্ব জমী ক্রয় ক'রে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে তিনি তাঁর কর্মকেন্দ্র 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটী'-প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটী' 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' নামে পরিচিতি লাভ করে। এরই মধ্যে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ দার্জিলিঙে রামকৃষ্ণ

বেদান্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠেই ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর সকালে মহাসমাধিতে স্বামী অভেদানন্দ দেহরক্ষা করেন। মহান্ ও সচঞ্চল দিব্য-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর। 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' প্রতিষ্ঠিত আছে উত্তর-কলিকাতায়, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে বিভিন্ন কর্মবিভাগ ও কর্মপ্রচেষ্টার অক্লান্ত কর্মধারাকে নিয়ে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সমগ্র বক্তৃতাবলী এগারোটি:খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে এবং গ্রন্থাকারে সেই বিচিত্র বক্তৃতাবলী ভারতের ও পাশ্চাত্য দেশের সর্বত্র সমাদৃত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নাম আজ বিশেষভাবে সর্ববিদগ্ধ মানুষের সমাজে সুপরিচিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অসাধারণ জীবনমহিমা, দর্শনচিন্তা, সাহিত্যচিন্তা, শিল্পচিন্তা, ধর্মচিন্তা, ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মসাধনার জগতে অক্ষয় ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বিশ্বাস করি। সাধারণ মানুষের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদের জীবনকর্মের ও জীবন-মহিমার মূল্যায়ন নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা বৃথাশ্রম মাত্র, কেননা তাঁরা একমাত্র তাঁদের অসাধারণ ত্যাগদীপ্ত মহিমার ও দিব্যব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্যেই নিজেদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করার অধিকারী এবং সেখানেই তাঁদের জানার, শোনার ও পরিচয়দানশক্তির বিকাশ সমাপ্ত।

(চার)

এই 'মন ও মানুষ'-গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিচিত্র প্রশ্নের হয়েছে জিজ্ঞাসা এবং স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সহজ-সরলভাবে অথচ অনন্যমনীষার সঙ্গে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন ছিলেন দার্জিলিঙ রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে (এই আশ্রম তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে), তখন (১৯৩২) বিদগ্ধ বিজ্ঞানী স্যর সি. ভি. রমণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্যর রমণ তাঁকে দর্শন করার জন্য গিয়েছিলেন। স্যর সি. ভি. রমণের সঙ্গে কথাচ্ছলে স্বামী অভেদানন্দমহারাজ পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক ডক্টর টমাস এ. এডিসনের সঙ্গে যে দু'দিন তাঁর সাক্ষাৎকার এবং ভারতবর্ষ ও 'বেদান্ত'-সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল সেই সকল কথারও উল্লেখ করেছিলেন।

ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় থাকাকালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বিদগ্ধ বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, নাট্যকার, অভিনেতা ও অভিনেত্রী প্রভৃতিদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। আমেরিকায় থাকাকালে তদানীন্তন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মাননীয় ম্যাক কিনলির সঙ্গেও তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক ডক্টর টমাস এডিসনের গল্প তিনি সকলের কাছেই অনেক সময়ে বলেছেন তাঁর অসামান্য আবিষ্কার-প্রতিভার অবদানপ্রসঙ্গে। বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক টমাস এ্যালভা এডিসন (Thomas Alva Edition)-সম্পর্কে অনেকগুলি জীবনী ও বিবরণী-গ্রন্থের মধ্যে ফ্রান্সিস ট্র্যাভেলিয়ান মিলারের (Francis Travelyan Miller)-প্রণীত *Thomas A. Edition* (The John C. Winston Company, Philadelphia, Toronto, 1931) গ্রন্থটি অন্যতম। গ্রন্থকার *Foreword*-এ' লিখেছেন : "This is the story of the adventures and achievements of a great American who rose from the humble begginnings···to become the greatest inventor of all time." স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঐ বিশ্বপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী-আবিষ্কারকের সঙ্গে দু'দিন সাক্ষাৎ করেছিলেন আনুমানিক ১৯১৫-১৯১৬ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে। টমাস এডিসন ৩00,000 সংখ্যারও অধিক বিবরণ রেখে গেছেন—যে'সব থেকে জানা যায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভাপ্রসূত বিচিত্র আবিষ্কারের কথা-কাহিনী ("As proof of this, Edition left in his notebooks more than 300,000 entries in his own handwriting of things that should be done in the next hundred years').

টমাস এডিসন ৬টি বৈজ্ঞানিক-গবেষণাগারে কাজ ক'রে তাঁর বিশ্ববিশ্রুত আবিষ্কারগুলি মানুষের সমাজে দিয়ে গেছেন : "Thomas Edition had six laboratories, or 'invention-shops' during his life. The *first* was in his mother's cellar at Port Huron, Michigon ; the *second* in the baggage car on the Grand Trunk line between Detroit and Port Huron ; the *third* in New York, when he got his first forty thousand dollars for the stock licker ; the *fourth* the famous laboratories at Menlo Park ; the *fifth* the laboratoris at West Orange ; the *sixth* and the last at his winter home at Fort Myres, Florida" (p. 264)। অর্থাৎ (১) মিচিগানেপোর্ট-হুরোণে তাঁর মায়ের

আবাসে, (২) ডেট্রিয়ট ও পোর্ট-হুরোণের মধ্যে গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক লাইনে একটি গাড়ীর মধ্যে ; (৩) নিউ ইয়র্কে, (৪) মেনলো-পার্কে, (৫) ওয়েস্ট-অরেঞ্জে এবং (৬) ফ্লোরিডায় ফোর্ট-মায়াসে। এই ৬টি গবেষণাগার নির্দিষ্ট ছিল এবং তিনি ৭২ বৎসরেরও অধিককাল বিভিন্ন গবেষণায় কর্মরত ছিলেন।

অয়ারলেস-টেলিগ্রাফ (wireless telegraph), টেলিফোন, গ্রামোফোনযন্ত্র, চলমান-ছায়াচিত্র প্রভৃতি টমাস এডিসনের অক্ষয়কীর্তি। সম্ভবত স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মেনলো পার্কের (Menlo Park) অথবা নিউ-ইয়র্কের গবেষণাগারে বিশ্ববিশ্রুত এডিসনের সঙ্গে দু'বার দেখাসাক্ষাৎ ও ভারতের দর্শন 'বেদান্ত'-সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। গ্রামোফোনযন্ত্রটি আবিষ্কার করেন এডিসন মোটামুটি ইংরাজী ১৮৭৭ খৃীষ্টাব্দে : "Thomas Edition has invented *a machine that talks.* The news flashed through the country in 1877. It taxed the credulity of the people···the public press made it the sensasion of the day : '*Here is a machine that is almost human speaks like a human being*'' গ্রন্থকার এফ. টি. মিলার লিখেছেন : "The 'Wizard' was working on his usual sehedule of eighteen to twenty hours a day."—প্রতিদিন টমাস এডিসন ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা গবেষণাকর্মে ধ্যানসিদ্ধ যোগীর মতো কাজে ডুবে থাকতেন।

এডিসনের জীবনী লেখক এফ. টি. মিলার 'Buddhists in sacred Thibet say Prayers to Phonograph' (পৃঃ ১৮৮)-আলোচনায় ফনোগ্রাফ-আবিষ্কারপ্রসঙ্গে লিখেছেন : "This 'Eighth Wonder of the World' found its way into the furthest corners of the earth···A traveller returning from Tibet was amazed to find Edition's phonograph in far off Lassa.···Among such travellers was a certain Burmese marchant···took with him to show the Grand Lama (the then Dalai Lama)···an Edition's phonograph···The marchant asked the Dalai Lama to speak into machine, and he did so proclaiming the beautiful prayer, called '*Om mani padme hum*' or 'Jewel in the Lotus'. Then the cylinder being put to place, the phonograph repeated the prayer in the Dalai Lama's voice to the great amezement···". অর্থাৎ তদানীন্তন লাসা-মঠের অধ্যক্ষ দালাই

লামা এডিসনের আবিষ্কৃত ফনোগ্রামে 'ওম্ মণিপদ্মে হুম্' উচ্চারণ করলে তা যথাযথভাবে প্রতিধ্বনিত হয়।

আমেরিকায় বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক এডিসন ও ভারতের স্যর সি. ভি. রমণ এই দু'জন বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারকের কথা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মাঝে মাঝে আমাদের বলতেন, সুতরাং তাঁদের প্রসঙ্গও এই গ্রন্থে উল্লিখিত হ'ল।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সর্বদাই প্রদীপ্ত ছিল ব্রহ্মজ্ঞানদৃষ্টি ও অপার্থিব। গীতার ৪/২৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বাণী—

'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ
ব্রহ্মণা হুতম, ব্রহ্মৈব
তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা'

(৪/২৪)--জীবনযজ্ঞের সকল কর্মেই ব্রহ্মদৃষ্টি উপদেশ দান ক'রে ব্রহ্মদৃষ্টির ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজেরও সকল রকম আলোচনার ও উপদেশের উদ্দেশ্য ছিল অজ্ঞানের পারে আত্মজ্ঞানের শুভ্র-আলোকে চিরস্নাত করার জন্য, তাই বিশ্বসমাজের প্রতিটি মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে যাতে অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে যেতে পারে এটাই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা।

'মন ও মানুষ'-গ্রন্থের পরবর্তী ভাগে (২য় ভাগে) পুরাতন ও নূতন বহু তথ্য-সম্বলিত ঘটনার সমাবেশ থাকবে এবং সকলের পরিশেষে সন্নিবেশিত থাকবে "অতীতের পৃষ্ঠা হ'তে"—এদেশের তথা ভারতের এবং ওদেশের তথা পাশ্চাত্যদেশের কিছু কিছু মনীষীর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ-সম্পর্কে বক্তব্য ও তাঁর মনীষার স্বীকৃতিসূচক বাণী। বিরাট বিচিত্র মনীষা ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানে উপলব্ধিময় জীবন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ-সম্বন্ধে এ'গ্রন্থ একটি নূতন জীবনীবিশেষ। এগারোটি ভাগে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যদেশে ইংরাজীতে দেওয়া ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি-সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রকাশন-বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে—যেগুলি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মনীষোজ্জ্বল অবদানরূপে তাঁর জীবনসাধনাকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ (কলিকাতার মঠে তোলা)

স্বামী অভেদানন্দের ব্যক্তিত্ব, বাণী ও চিন্তাধারা

॥ স্মৃতি : এক ॥

অংশকে নিয়েই পূর্ণের পূর্ণতা সার্থক হয়। একটি একটি অংশের সমাবেশেই গড়ে ওঠে পূর্ণতার রূপ। রোমনগরী কেন—সকল দেশ, সকল জাতি, সকল সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প, ললিতকলা, ধর্ম ও দর্শন এই অপরিহার্য-নীতিকে কোনদিন অতিক্রম করতে পারে নি। স্বামী অভেদানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্বময় ঘটনাপূর্ণ জীবনের আসল ইতিহাস লেখার এখনো সময় আসে নি, অথচ কোন-কিছু না লিখ্‌লে, সামান্য-কিছুও তাঁর ঘটনাবৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের পরিচয় না দিলে ইতিহাসের পাতায় পরিপূর্ণতারূপ সান্ত্বনার বাণী কিছু পাওয়া যায় না। অসংখ্য অসংভাবনা-সংকোচের দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে স্মরণ ও বরণ ক'রে এবং ছোট ছোট আড়ম্বরহীন উপকরণের অর্ঘ্য সাজিয়ে তাই রচনা করতে চাই স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতির আলেখ্য 'মন ও মানুষ'—তাও মনে করি নির্ভর করে তাঁরই কল্যাণময়ী ইচ্ছা ও অভয়প্রসাদের উপর, আব নির্ভর করে তাঁর আশ্চর্যময় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ-আশীর্বাদের উপর।

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক—অন্ততঃ এটাই মনে হ'ত বাইরের সাধারণ অনেকের কাছে। তাঁর সংগে দিবারাত্র আমরা মিশেছি, কত গল্প—কত হাসি-ঠাট্টা ও আমোদ-আহ্লাদ করেছি, কিন্তু তবুও যেন প্রথম প্রথম মনে কেমন ভয়ের উদয় হ'ত তাঁর সাম্‌নে যেতে, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গা থম্‌ থম্‌ করতো, ভরসায় কুলাতো না তত্তো। তবে যোসো ক'রে যদি একবার হাজির হ'তে পারতাম তাঁর সাম্‌নে তবে সকল ভয়ের

বোঝা, সকল-কিছু সংকোচের ভাব মন থেকে একেবারে ধুয়ে-মুছে যেত। তখন স্বামীজী মহারাজেরও[১] সেই চিরপরিচিতের মতো কথা: 'কিগো, কেমন আছ?' আমরা ঘাড় নেড়ে উত্তর দিতাম: 'আজ্ঞে, ভাল আছি'। তিনি হয়তো একটা চিঠি লিখ্ছেন, না হয় কোন কাজ করছেন, অভয় ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্তেন: 'বেশ, বসো বসো'। তখন হ'ত আমাদের চিরনির্ভয়ের ভাব। দূরত্ব ও সংকোচের ভাব তো পরের কথা, ভাব্তাম স্বামীজী মহারাজ আমাদের কতো আপনার জন, কতো ভালবাসেন আমাদের!

এটাই ছিল স্বামী অভেদানন্দের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছোট-বড় ভাল-মন্দ তাঁর কাছে কিছু ছিল না। ছেলে-বুড়ো মেয়ে--মদ্দো সবাই ছিল তাঁর কাছে যেন একই বয়সের মানুষ, সবার সংগেই ছিল তাঁর প্রাণখুলে মেশা ও অফুরন্ত ভালোবাসা, লুকোচুরি কিংবা আপন-পর ভাব তাঁর জীবনে বিন্দুমাত্রও ছিল না।

একবার একদিনের এক ঘটনার কথা মনে পড়ে। একবার কেন, অনেকবারই ঘটেছে এ'রকম। স্বামীজী মহারাজ কি যেন একটা গুরুতর কথা শুনেছেন কারু কাছ থেকে, মুখ গম্ভীর, মনও একটু চঞ্চল। চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বসে তিনি তামাক খাচ্ছেন। কপালের মাঝখানে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা। চোখের চাহনিও একটু উদাস। ঠিক এমনি সময়ে হাজির হ'ল আমাদের একজন তাঁর সাম্নে। প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই তাকিয়ে তিনি বল্লেন: 'কিগো, এসো'। তারপর আবার একটু উদাস ও আন্মনা। আগত বন্ধুও দু'একটি কথা ক'য়ে চলে আসার উপক্রম কর্ছে। এমন সময়ে তিনি বল্লেন: 'ছাখো, ব্যাপার এই ঘটেছে, কাকেও যেন কিছু ব'লো না বাপু'।

১। আমরা সাধারণত 'স্বামীজী মহারাজ' বলেই সম্বোধন কর্তাম স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে, আর স্বামীজী বলতে জানতাম স্বামী বিবেকানন্দকে।

আগত বন্ধু ঘাড় নেড়ে বল্লে : 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ'। তখন প্রণাম করে দাঁড়াল সে বাইরে।

সংবাদটা কাকেও বলা হবে না—স্বামীজী মহারাজের আদেশ। গূঢ়-তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ! দু'একদিন এ'রকমভাবেই কেটে গেল। কিন্তু তারপর দেখা গেল স্বামীজী মহারাজের গূঢ় প্রাইভেট কথাটি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই জানে, সবাইকে তিনি ঐ এক কথাই বলেছেন : 'ত্থাখো, কাকেও যেন কিছু ব'লো না বাপু'।

কি স্বচ্ছ সাবলীল অভিসন্ধিহীন স্বভাব ও প্রকৃতি! কি সহজ-সরল মনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি! এই সরলতার অধিকারী না হ'লে কি মানুষ সম্পূর্ণভাবে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করতে পারে! কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি—আমরা ভাব্‌তাম তখন একটু অন্যরকম। ভাব্‌তাম—স্বামীজী মহারাজের ভাল-মন্দ বোধশক্তি হয়তো একটু কম। পঁচিশটি বছর লণ্ডন-আমেরিকার মতো সুসভ্য দেশে তিনি কাটালেন কি ক'রে? কাকে কি রকম ক'রে বল্‌তে হয়, কোন্‌টা প্রকাশ্য বা গোপনীয়, কোন্‌টা ভাল বা মন্দ—এটাও কি তিনি জানেন না ভালভাবে? কিন্তু এ'কথা তো তখন বুঝিনে যে, পৃথিবীর যা-কিছু ভাল ও মন্দ, পৃথিবীর যা-কিছু পরিবর্তনশীল ও পঙ্কিল, সে'সবের মর্যাদা ও আদর কেবল আমাদেরই মতো সন্দিগ্ধ মানুষের কাছে, তিনি কিন্তু সে'সবের ছিলেন বহুউর্ধে! সংকীর্ণতা ও গোপনতা তাঁর মাঝে কোনদিনই কিছু ছিল না। পবিত্রতা ও সরলতার ছিলেন তিনি জ্বলন্ত প্রতীক। যা-কিছু তাই আবরণহীন সত্য, সবার কাছে তা' সহজ সরল মন নিয়ে বল্‌তে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করতেন না তিনি কোনদিন। গোপনতার ভান তো পাটোয়ারি বুদ্ধিরই নামান্তর!

সুদীর্ঘ পঁচিশটি বৎসর বিদেশে ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম এবং আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার ক'রে স্বামী অভেদানন্দ ভারতে ফিরে এলেন যখন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি—কি তার শেষের দিকে, সঙ্গে এনেছিলেন তিনি নানান্ রকমের গ্রন্থ।

বেশীর ভাগ গ্রন্থ ছিল অবশ্য ইংরাজীতে। দর্শন, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইংরাজীসাহিত্য, নাটক, কবিতা, শিল্প, ললিতকলা, ধর্ম, তুলনামূলক ধর্ম ও দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব—এই বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থ তিনি সঙ্গে এনেছিলেন আমেরিকা থেকে। তা ছাড়া ছিল স্তূপাকার সংবাদপত্রের কাটিঙস্—যেগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল নিয়মিতভাবে তাঁর দেওয়া বিচিত্র বিষয়ের উপর ভাষণ ও আলোচনা। সংস্কৃত-গ্রন্থও সে'সবের মধ্যে ছিল অনেক। সেই সব গ্রন্থ চোখে দেখার সৌভাগ্যই কেবল আমাদের হয়েছে, কিন্তু পড়ার সুযোগ কোনদিনই হবে কিনা জানি না! খ্রীষ্টধর্মের উপর গ্রন্থও কম ছিল না। সাম্প্রদায়িক-সঙ্কীর্ণতার রিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা ক'রে অনেক সময়ে পাশ্চাত্যে প্রচার করতে হয়েছে তাঁকে ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শন। তাই জীবন ছিল তাঁর গ্রন্থপড়ার জ্ঞান দিয়ে শুধু পরিপূর্ণ নয়, প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার ও আত্মানুভূতির প্রদীপ্ত আলোকে ছিল সমুজ্জ্বল! যেই সকল গ্রন্থ তিনি সংগে এনেছিলেন আমেরিকা থেকে! তাদের কোন-কোনটাব পাতা খুলে দেখার লোভও আমরা অনেক সময়ে সংবরণ করতে পারিনি, কিন্তু দেখে অবাক্ ও স্তম্ভিত হয়েছি যে, কি ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ই না ছিল তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বময় জীবনে! কি নিরলস পরিশ্রম ও মনোযোগিতার স্বাক্ষ্যই না ছিল সেই সব অধ্যয়ন ও অনুশীলনের পিছনে! দেখেছি—গ্রন্থগুলির প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রায় পেন্সিলে দাগ দেওয়া, পাতার ধারে ধারে মার্জিনে অসংখ্য ছোট ছোট নোট লেখা, ভেবেছি এও কি কখনো সম্ভব হয় একজনের পক্ষে। আমাদেরই মতো ছিলেন তিনি একজন পৃথিবীর মানুষ, সারা পঁচিশটি বছর কাটিয়েছেন লণ্ডন, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিভ্রমণে ও অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে, বক্তৃতা দিয়েছেন একদিন ও এক জায়গায় নয়—প্রত্যহ তিন চার বার নানান্ জায়গায়; তা'ছাড়া বইলেখা, বন্ধু-বান্ধব ও আগন্তুকদের সংগে নানান্ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা, ক্লাশ করা, আশ্রমের ও বাগানের কাজ

নিজের হাতে করা—এইসব শেষ ক'রে কখনই বা এত গ্রন্থ তিনি পড়তেন, আর সময়ই বা পেতেন ক্যামন ক'রে! স্মরণশক্তিও ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ। কবে কোন্ গ্রন্থ পড়েছেন তিনি আমেরিকায় ও লণ্ডনে, আর তার চল্লিশ বছর পরে দেখেছি হুবহু সব মনে আছে, এতটুকুও বাদ পড়েনি তাঁর স্মৃতি থেকে! বলেও যেতেন তিনি গ্রন্থের কোন কোন জায়গা থেকে অনর্গল!

পড়ার আগ্রহ, অধ্যবসায় ও একান্ত নিষ্ঠা স্বামীজী মহারাজের জীবনের শেষদিন-পর্যন্ত ছিল অব্যাহত। অবিচলিত ও একাগ্রভাবে ধ্যানমৌন সাধকের মতো তিনি গ্রন্থ পড়ে যেতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, জানার আগ্রহের শেষ আর কোনদিনই তাঁর জীবনে ছিল না! শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বল্‌তেন : 'সখি, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'। তাই সমগ্র সংসারের সকল জিনিসই জানার ও শেখার জিনিস জীবনে! সর্বজ্ঞানময় ভগবানকে জান্‌তে গেলে তাই শেখার জিনিসেরও অন্ত নাই! এই আদর্শই আমরা স্বামীজী মহারাজের জীবনে দেখেছি ও পেয়েছি!

সুদীর্ঘ তাঁর জীবনে বিশ্রামের অবসরও কোনদিন আমরা লক্ষ্য করিনি, বরং দেখেছি যে, বিচিত্র কর্মের ও প্রচেষ্টার ভিতর ছিল নিরলস ও বিরক্তিহীন তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম। ইংরাজী ও বাংলা খবরের কাগজ প্রত্যহ তিনি নিয়মিতভাবেই পড়্‌তেন। কাগজের 'কাটিংস্' কেটে রাখ্‌তেন নানান্ রকম বিষয়ের উপর। নূতন গ্রন্থ পেলে আনন্দের আর পরিসীমা থাক্‌তো না তাঁর মধ্যে! কোথায় কোন্ কাগজে কোন্ গ্রন্থের রিভিউ (পুস্তক-সমালোচনা) প্রকাশিত হয়েছে, কোথায় কোন একটা ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের নূতন গ্রন্থ ছাপা হয়েছে, তিনি সেই সকলের খবর রাখ্‌তেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কাজের ভিতর থেকে একটু সময় পেলেই ধ্যানমৌন সাধকের মতো ছিল তাঁর গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থের আলোচনা করা। যেকেউ তাঁর কাছে আস্‌তেন—অবশ্য বিশেষভাবে জানাশোনা, তাঁকেই তিনি

জিজ্ঞাসা করতেন কোন নূতন গ্রন্থ বার হয়েছে কিনা বাজারে। জানাশোনা লোকের কাছ থেকে বই চেয়ে পড়াও ছিল তাঁর একটি চিরদিনের অভ্যাস। কেউ হয়তো এসেছে তাঁর কাছে আমাদের বন্ধুলোক, অমনি জিজ্ঞাসা করতেন তাকে : 'কিগো, এ' বইখানা কি তোমার আছে?' যদি জানতেন আছে, স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সংগে তখুনি বলতেন : 'একবার আমায় দিতে পারো পড়ার জন্যে'?

একদিনের এক ঘটনার কথা তাই বলি! আমাদেরই বিশেষ একজন পুরাতন বন্ধু দেখা করতে এসেছেন স্বামীজী মহারাজের সংগে। স্বামীজী মহারাজও তাঁকে বেশ জানতেন ও ভালবাসতেন। কথার প্রসংগে রিজ্ ডেভিড্সের (Rhys Davids) 'বুদ্ধিষ্ট ইণ্ডিয়া' থেকে বৌদ্ধযুগের গৌরবকাহিনীসম্বন্ধে দু'এক কথা তিনি আলোচনা করতে লাগলেন। বইখানি নাকি স্বামীজী মহারাজ এর পূর্বে একবারমাত্র পড়েছিলেন আমেরিকায় থাকাকালে। বন্ধুটি উত্তর দিলেন : 'আজ্ঞে হাঁ, আছে'। বইখানির কথা শুনে স্বামীজী মহারাজ একান্ত আগ্রহান্বিত হ'য়ে বল্লেন : "দ্যাখো, রিজ্ ডেভিডসের বইখানা কিন্তু আমি একবারমাত্র পড়েছি। আর একবার আমার পড়া দরকার'। বন্ধুটি শুনে বল্লেন : 'আজ্ঞে, বইখানি যদিও নিজের নয়, তাহলেও আমি এনে দোবো'খন, পড়ুন না'।

আমরা কয়েকজন ছিলাম পাশেই দাঁড়িয়ে। স্বামীজী মহারাজের ঐ বিনীত আবেদনটি কি যেন কেন আমাদের কাণে বেশ ভাল-লাগলো না তখন। ভাবলাম—একখানি বইয়ের জন্য অতো বিনয়ই বা কেন? এতোবড় একজন লোক, ভারতেই শুধু নয়—পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রদ্ধা ও সম্মান অজস্রভাবে তিনি লাভ করেছেন জীবনে, অথচ সামান্য একজন লোকের কাছে তিনি ব'লে ফেল্লেন কিনা—বইখানি তিনি একবার মাত্র পড়েছেন। সীমাবদ্ধ সন্দেহযুক্ত আমাদের মন, তাই ভেবেছিলাম তখন যে, স্বামীজী মহারাজের গরীয়সী-দীনতারূপ দুর্বলতাই কিছু যেন প্রকাশ পেয়েছিল তাতে। কিন্তু এ'কথা তো তখন

বুঝিনি যে, একান্ত সরলতার প্রতিমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান পৃথিবীর যা-কিছু দৈন্য ও মালিন্য—সকলকেই করেছেন অতিক্রম! চির-আনন্দসত্তায় তিনি প্রতিষ্ঠিত, তাই মায়িক সংসারের এটিকেট্ বা আদবকায়দার তিনি ছিলেন অনেক উচ্চে। মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা ও ঘৃণা-লজ্জা সকলই ছিল তাঁর কাছে সমান। তখনই আমাদের মনে হয়েছিল গীতায় সেই স্থিতপ্রজ্ঞ-জীবন্মুক্তের কথা। স্থিতপ্রজ্ঞ-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন (২।৫৭)—

'যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥'

পুনরায় ১২।১৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥'

প্রকৃতপক্ষে যাঁরা 'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ' —শত্রু ও মিত্রে—প্রশংসালাভ ও অপ্রশংসালাভরূপ মানে ও অপমানে সমজ্ঞানী ও সমদর্শী—তাঁরাই ব্রহ্মজ্ঞানী। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দের সমগ্র জীবনেই দেখেছি আমরা এই সমদর্শনের ও সমানুভূতির অপার্থিব ভাব!

দু'দিন পরে সেই বন্ধুটি এনে দিলেন রিজ-ডেভিড্সের 'বুটিষ্ট ইণ্ডিয়া' বইখানি। স্বামীজী মহারাজ সে'টি হাতে তুলে নিলেন আনন্দে ও একান্ত আগ্রহভরে। আগন্তুক দু'চারজন ভদ্রলোকও ছিলেন সে'দিন সেই অফিস-ঘরে। স্বামীজী মহারাজ বইখানি পেয়ে খুব আনন্দিত। তখন হবে প্রায় সকাল সাড়ে-দশটা—কি এগারটা। চেয়ারটি ছেড়ে তিনি দাঁড়ালেন উঠে। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বল্লেন: 'আজ আপনারা সব আসুন, আমি এবার ঘরে যাব'। ভদ্রলোকেরা সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও তাদের সঙ্গে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম সেদিনের মতো। স্বামীজী মহারাজ বইখানি ও দু'চারটি চিঠিপত্র হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে শোওয়ার ঘরে

প্রবেশ করলেন ও ঘরের মধ্যে চেয়ারখানি টেনে নিয়ে তামাক খেতে লাগলেন, আর 'বুদ্ধিষ্ট ইণ্ডিয়া' বইখানি পড়্তে শুরু করলেন। তখন দুনিয়ার কোন খবরই যেন তাঁর কাছে আর রইলো না!

বইখানি তিনি কাছে রেখেছিলেন কতদিন তা মনে নেই, কিন্তু পার্থিব শরীর তাঁর যখন চলে গেছে, হতাশ মন নিয়ে আফিস-ঘরের আলমারিটি'টি একদিন পরিষ্কার করছি, দেখেছিলাম চামড়ায় বাঁধানো তাঁর নোটবুকখানির কয়েকটি পাতায় নোট করা আছে 'বুদ্ধিষ্ট ইণ্ডিয়া' থেকে। সত্য বল্‌তে কি—চোখের জল আর সে'দিন রাখ্‌তে পারিনি! আজও সেই নোটবইখানা সর্ববিধ্বংসী কালের গ্রাসে পড়ে নষ্ট হ'তে আমরা দিইনি, যত্নের সংঙ্গে তুলে রেখেছি তাঁর স্বর্ণস্মৃতিকে স্মরণ ক'রে!

এ'রকম আর একটি ঘটনার কথা আমাদের মনে আছে। স্বামীজী মহারাজের শরীর যাওয়ার ঠিক পাঁচ দিন—কি ছ'দিন পূর্বে হবে। আর-একখানি বই তিনি চেয়ে নিয়েছিলেন মহাযান-বৌদ্ধধর্মের উপর। সেটিও পড়া হয়েছিল কতটুকু তা' জানি না, কিন্তু শরীর তাঁর চলে গেলে দেখেছিলাম—বইখানি পড়ে আছে তাঁর শোওয়ার ঘরে উঁচু একটি টুলের উপর। সেটাও তুলে নিয়েছিলাম আমরা চোখের জল মুছতে মুছতে। বইটি ছিল ডক্টর নলিনাক্ষ দত্তের লেখা হীনযান ও মহাযান-বৌদ্ধধর্মের উপর!

সব-কিছু নোট ক'রে রাখা ছিল স্বামীজী মহারাজের চিরকালের বা চিরাচরিত অভ্যাস। যেকোন গ্রন্থ তিনি পড়্তেন, বরাবরই নোট ক'রে রাখ্‌তেন তার দরকারী অংশগুলি। পরিচয়ও তার পাই বেশী ক'রে নাড়াচাড়া করি যখন তাঁর ইংরাজী-বক্তৃতার ম্যান্সক্রিপ্টগুলি (পাণ্ডুলিপিগুলি)। ছোট ছোট কাগজে অসংখ্য নোট-করা আছে পেন্সিলে বা কালিতে বক্তৃতাগুলির ধারে ধারে। নূতন নূতন বিষয়ের উপরও আছে অসংখ্য নোট-করা—যা এদেশে (ভারতে) ফেরার পর তিনি লিখে রেখেছিলেন পড়ার সংগে সংগে।

আরও একটি কথা মনে পড়ে তাঁর সেই বইপড়ার প্রসঙ্গ থেকে। নিজে বই পড়েছেন যার অন্ত নেই, নূতন বই-পড়ারও শেষ ছিল না, কিন্তু আমাদের পড়ার বেলায়ই ছিলেন তিনি যেন একটু খড়্গহস্ত। তাই সত্য বল্‌তে কি মনে হ'ত তখন—স্বামীজী মহারাজ ছিলেন বোধহয় একটু একদেশদর্শী, অথবা চাইতেন আমাদের মঠের কাজেই কেবল ডুবিয়ে রাখ্‌তে! তাই আমাদের পড়ার বেলায় ছিল তাঁর বিরাগ, আর কাজের বেলায় একান্ত অনুরাগ। সংশয়-আন্দোলিত সীমিত আমাদের মন, কাজেই সন্দেহের কুয়াশা সৃষ্টি হওয়াই ছিল মনে স্বাভাবিক। তবে আমাদের চোখেও কম বড় বুদ্ধিমান আমরা ছিলাম না! বই বগলে ক'রে বেরিয়ে পড়্‌তাম যে-যার সব টোলে পড়্‌তে। গায়ে থাক্‌তো একটা জামা আর চাদর, চাদরের নীচে থাক্‌তো বই লুকোনো, কাজেই টের পাওয়া ছিল বড় কঠিন। স্বামীজী মহারাজ যতক্ষণ থাক্‌তেন সামনে, ততক্ষণই থাক্‌তাম আমরা একান্ত কাজের ছেলে হ'য়ে, কিন্তু তারপরই ছুট্‌তাম পড়ার তাগিদে পণ্ডিত মশাইদের টোলে।

বেদান্ত মঠে পড়াশুনা করি অনেকেই তখন পণ্ডিত মশাইদের টোলে। অধ্যয়ন করি কেউ পাণিনি, কেউ পতঞ্জলির মহাভাষ্য, কেউ উপনিষৎ, যোগদর্শন ও বেদান্তদর্শন। কিন্তু মনে আছে একদিনের এক ঘটনাচক্রের কথা! সকাল তখন হবে ন'টা—কি সাড়ে-ন'টা। পাব্‌লিকেশন-রুমের বাইরে একটা বেঞ্চে বসে দু'তিনজন আমরা পড়্‌ছি খবরের কাগজ। খবর দিলেন এমন সময়ে একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ : 'ব্যাপার বড়ই গুরুতর, স্বামীজী মহারাজ ভীষণ রাগ করেছেন'। শুনে তো আমরা একেবারে হতভম্ব ও অবাক্ হ'য়ে গেলাম। হাতের কাগজ গেল মাটিতে পড়ে। ব্রহ্মচারিজীকে ভয়ে ও উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম : 'কেন ভাই, হয়েছে কি?' ব্রহ্মচারিজীর মেজাজ দেখ্‌লাম তখন একটু চড়া, কথার সুরও বেশ সপ্তমে বাঁধা! তিনি বল্লেন : হবে আর কি? ঐ

একটা কি ন্যায়দর্শনের নোটবুক পাওয়া গেছে তাঁর সেল্‌ফ সাফ (পরিষ্কার) করার সময়ে'। শুনে আমাদের অন্তরাত্মা গেল শুকিয়ে। ব্রহ্মচারিজী বিরক্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন: 'কই, যাবেন না? মহারাজ যে ডাক্‌ছেন?' আমরা বল্লাম: 'ভাই বলোগে, স্কুলের এখন ভীষণ কাজ। যাবো'খন একটু পরে'। ব্রহ্মচারিজী ব্যাপার-স্যাপার দেখে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে অন্তর্ধান হলেন। আমরাও বাঁচ্‌লাম একটু হাঁফ-ছেড়ে। কিন্তু সে'স্থানে অপেক্ষা করাও আর সমীচীন বোধ কর্‌লাম না—কি জানি কেন মহারাজ পাঠান যদি আবার ব্রহ্মচারীকে জরুরী তলব দিয়ে! সরে পড়ার সকলেই উপক্রম কর্‌তে লাগ্‌লাম, কিন্তু এমন সময়ে শুন্‌লাম স্বামীজী মহারাজের গলার এক বেজায় ধমকের শব্দ। গলার আওয়াজ সামান্য-কিছু শোনাই যাচ্ছিল নীচে থেকে। সুতরাং কৌতূহল হ'ল আরো-কিছু শোনার আড়াল থেকে, অথচ ভয়ও হচ্ছিল পাছে এসে পড়ে আবার ব্রহ্মচারী মহারাজ ধমকের চোটে। তাহলেও শোনার আগ্রহটাই ছিল তখন বেশী। দাঁড়ালাম তাই মহারাজের ঘরে ওঠ্‌বার সিঁড়ির নীচে গিয়ে—যদিও সকল কথা শোনা যাচ্ছিল না সেই বাতাসহীন ছোট্ট জায়গাটি থেকে। কেবল এ'টুকুই মনে আছে যা শুন্‌তে পেয়েছিলাম: 'ছেলেগুলোর সব মাথা গেছে খারাপ হয়ে! কেবল নব্যন্যায়ের কচ্‌কচি, আর রাজ্যের উদ্‌ভুট্টি-উদ্‌ভুট্টি সব বই পড়া। আরে—বলি যা, তা শোন্‌ না কেন। শুধু পড়ে কি আর ভগবান লাভ হয়? জ্ঞান, ভক্তি, বিচার ও ভগবানে অনুরাগ এ'সব লাভ কর্‌ আগে, তা নয় দিনরাত্তির কেবল আজে-বাজে ক'রে সময় কাটানো—গল্প আর আড্ডা'।

সে'দিন তো গেলো কোন রকমভাবে কেটে। আর একদিনের কথাই বলি এখানে। সে'দিন অবস্থা হয়েছিল আমাদের আরো বেশী রকমের শোচনীয়। মহারাজের শরীর যখন ছিল ভাল, তখন প্রত্যহই বেড়াতে বেরুতেন তিনি বৈকালে মঠের পিছনে খোলামাঠে। মঠের ডানদিকে ছিল লাইব্রেরী কাঠের দোতলার নীচে। একদিন

বেরিয়েছেন তিনি বেড়াতে, সংগে কেউ নেই। আমরাও ফির্ছি তখন পণ্ডিত মশাইদের টোল থেকে মুক্তবিহংগের মতো। বগলে আমাদের ছিল কাপড়ে-ঢাকা বই আর খাতা। মহারাজ যে নাম্ছেন সিঁড়ি দিয়ে—খেয়ালই ছিল না সে'দিকে। অবশেষে পড়্লাম তো পড়্লাম একেবারে তাঁর সাম্না-সাম্নি। মহারাজ কিন্তু বল্লেন না তখন কোন কথাই ? তাকালেন মাত্র একবার ও চলে গেলেন ধীরে ধীরে নিজের গন্তব্যপথে মাঠের দিকে। এটাই ছিল তাঁর জীবনের চিরকালের অভ্যাস। রাস্তা দিয়ে যখন চল্তেন, কথা কইতেন না তিনি কখনও কারুর সংগে। সকল সময়েই প্রকাশ পেত তাঁর জীবনে ধ্যানঘন একাগ্রতা ও একনিষ্ঠার ভাব, আর তারসঙ্গে মেশানো থাক্তো গাম্ভীর্য !

স্বামীজী মহারাজ মাঠ থেকে বেড়িয়ে উঠ্লেন উপরের ঘরে সন্ধ্যার কিছু পরে। সে'দিন ছিল প্রতিপদতিথি। সরুকাস্তের মতো চাঁদখানি ঢলে পড়েছিল পশ্চিম-আকাশের কোলে। কালো-অন্ধকারের নিবিড়তা আকাশে হয়েছে আরো গভীর। আমরাও ধরে নিলাম আমাদের ভাগ্যগগণ সে'দিন কিছুটা দুর্যোগপূর্ণ ! স্বামীজী মহারাজ উপরে উঠে জামা-কাপড় ছাড়্লেন শোওয়ার ঘরে গিয়ে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পরে এসে বস্লেন অফিস-ঘরের চেয়ারটিতে। তামাক দিয়ে গেলেন তাঁর সেবক। আগন্তুক ভদ্রলোক ছিলেন দশ-বারো জন হবে। রাত্রি সাড়ে ন'টা-পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা কর্লেন তিনি তাঁদের সঙ্গে। তারপর ফিরে গেলেন আবার শোওয়ার ঘরে ও ডুবে গেলেন বইপড়ার আনন্দে !

প্রতিদিন সকালেও মহারাজের কিছুক্ষণ বেড়ানো ছিল অভ্যাস। মঠের পিছনের দিকে ছিল খানিকটা খালি জায়গা—সেকথা বলেছি। তারই পূর্বদিকে ছিল বিরাট একটা টিনের দোতলা-চালা।[১]

১। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামীজী মহারাজের পার্থিব শরীর অন্তর্হিত হয়। তার ঠিক এক বছর পরে (সেপ্টেম্বর মাসে, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে) দোতালা টিনের চালাটি যায় পুড়ে ইলেকট্রিক্ ফিউজ হ'য়ে। এখন সেখানে তৈরী

চালার একতলার সমস্তটাতে ছিল মঠের লাইব্রেরী ও ফ্রি-রিডিঙ-রুম। প্রতিদিন সকাল সাতটা—কি সাড়ে-সাতটার সময়ে নেমে আস্‌তেন তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে। গ্রীষ্মকালে গায়ে থাক্‌তো একটা গেঞ্জি ও চাদর, আর শীতকালে গায়ে দিতেন তিনি গরম একটি পশমী-জামা ও গেরুয়া-আলোয়ান। সিঁড়ি দিয়ে নামার সঙ্গে সঙ্গে বল্‌তেন: 'কই, বৃন্দাবনের সখিরা সব গেল কোথায়?' প্রভাতে নবজাগরণের বাণী নিয়েই যেন আহ্বান জানাতেন তিনি আমাদের সকলকে! আমরাও অনুভব কর্‌তাম তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ও অন্তরের একান্ত আকর্ষণ! আমাদের প্রাণের মধ্যেও ফুটে উঠ্‌তো এক প্রেরণাময় পবিত্র ভাবের অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা!

সেই দিনকার সকালের কথাই বলি এখানে স্মৃতি থেকে স্মরণ ক'রে। তিনি নেমে এলেন দোতলা থেকে ধীরে ধীরে নীচে। আমরা ছিলাম সকলেই লাইব্রেরীতে খবরের কাগজ-পড়ায় ব্যস্ত। সোজাসুজি মাঠে গিয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগ্‌লেন আপন মনে। আমরা পড়্‌লাম তখন একটু মুস্কিলে। মহারাজ পায়চারী কর্‌লেন দশ—কি বারো মিনিট হবে। তারপর ফিরে তাকালেন একবার আমাদের দিকে, আমরাও প্রণাম ক'রে দাঁড়ালাম মহারাজের পাশে গিয়ে। আমাদের দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন: 'কিগো, কাল আস্‌ছিলে কোথা থেকে?' আমরা একটু ইতস্ততঃ ক'রে ঢোক গিলে বল্লাম: 'আজ্ঞে, গিছ্‌লাম ঐদিকে'। স্বামীজী মহারাজের মুখে ফুটে উঠ্‌ল গাম্ভীর্যের মধ্যেও একটু চাপাহাসি। তিনি পায়চারী করতে করতে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন: 'হ্যাঁ, তাতো বুঝেছি, কিন্তু হাতে একটা কি ছিল দেখ্‌লাম?' আমরা বল্লাম: 'আজ্ঞে, বই'।

—'ওঃ, কেন, কোথায়ও পড়া হয় নাকি?'

হয়েছে আবার একটি টিনের-সেড। সেখানেই আছে লাইব্রেরী ও লেকচার-হল্। এই লেকচার্-হলের নাম 'অভেদানন্দ-শতবার্ষিকী-লেকচার-হল'।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কি পড়ো?'

—'ঐ পণ্ডিত মশায়ের কাছে একটু যাই মাত্র, কিন্তু পড়া তেমন আব হয় কই'।

স্বামীজী মহারাজ শুনে বল্লেন: 'তা' তো বটেই, সত্যিকার পড়া আর হয় কৈ? তা' বেশ্ তো, তোমরা পড়্ছো তাতে আর আমার আপত্তি কি। তবে পড়ার সংগে সংগে চাই সাধন-ভজন আব ঈশ্বর-দৃষ্টি। আমরাও তো বরানগর-মঠে পড়াশোনা কর্তাম। তবে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিল ধ্যান ও সাধন। পড়ার বিষয়বস্তুর উপব যেমন ধ্যান থাক্তো, তেমনি থাক্তো আবার জীবনের লক্ষ্যের দিকে! তবে বুঝেছো—কেবল বই পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায়, নাম-যশ পাওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বর লাভ করা যায় না। শুক্নো-পাণ্ডিত্যকে রামকৃষ্ণদেব তাই বল্তেন আলুনি। পড়া তো কেবল বিচারের জন্য, চিত্তশুদ্ধির জন্য, ভগবানকে ক্যামন ক'রে লাভ কর্বে তারই উপায় জানার জন্য, নইলে বিচারহীন ও বিবেক-বৈরাগ্যহীন পড়া ও পাণ্ডিত্য অবিদ্যার সামিল। ভগবান লাভ করাই সকলের জীবনের উদ্দেশ্য। তাই পড়ার সংগে সংগে চাই বিচার-বুদ্ধি ও সত্যকার জ্ঞানের অনুভূতি। এখনই হ'ল তোমাদের পরিশ্রম করার সময়, এরপর তো কেবল পেন্‌শানভোগ। যতটুকু এখন পরিশ্রম কর্বে, তাব ফল ভোগ কর্বে পরে। শরীর অপটু হ'লে কি আর ধ্যান-ভজন করতে পার্বে?

আসলে বিচারহীন পড়া ও তথাকথিত পাণ্ডিত্যের উপবই স্বামীজী মহারাজের ছিল বিরাগ, কিন্তু শুদ্ধবিচার, চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্য পড়ার উপর ছিল তাঁর একান্ত অনুরাগ। বল্তেনও তিনি: 'বই পড়্লে বুদ্ধির বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধিরই খেলা, কিন্তু ভগবানকে লাভ কর্তে গেলে বুদ্ধির এলাকা পার হ'তে হয়। উপনিষৎ তাই বলেছে—'মনসা ন মনুতে', মন দিয়ে ও বুদ্ধির খেলা দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। ভগবান কখনো কারুর বিদ্যার ঐশ্বর্য দেখেন না,

তিনি দেখেন কেবল মানুষের মনকে বা হৃদয়কে। ধর্মজীবনে উন্নতি করতে গেলে ভগবানের চরণে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হয় মনকে। প্রথমে প্রথমে তাই সাধন-ভজনে মন দিতে হয়, মন তৈরী হ'লে তখন আর মন কোন-কিছু অনিষ্ট কর্‌তে পারে না। তখন পড়্‌তে ইচ্ছে হয় পড়ো, কিন্তু পড়া হবে তখন আত্মবিচারের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য—স্বার্থসিদ্ধি বা পাণ্ডিত্যাভিমানের জন্য নয়'।

স্বামীজী মহারাজের মনের বহির্বিকাশটা ছিল সাংসারিক ভালো-মন্দরূপ আলো-ছায়ার দ্বন্দ্বরূপের সঙ্গে মেশানো। তাই যেমন পছন্দ কর্‌তেন না তিনি বিবেক-বৈরাগ্যহীন শুষ্ক জ্ঞানবিচারকে, তেমনি ভালবাস্‌তেন না বিদ্যাবুদ্ধিহীনতার গাঢ়-অন্ধকারকে ও পুঞ্জীকৃত কুসংস্কারকে! তাঁর ক্ষমাসুন্দর চক্ষে উদ্ভাসিত ছিল আত্মপ্রসারতার মহিমোজ্জ্বল রূপ, আর উৎসারিত ছিল তাঁর জীবনে পরিপূর্ণ বিকাশের প্রতিদ্বন্দ্বহীন গতি। পূর্ণতালাভই হবে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ। বাইরের আড়ম্বর ও পল্লবগ্রাহীতাকে কোনদিন তাই তিনি প্রশংসা করতে পার্‌তেন না। তাই কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যবিলাসী মন নিয়ে পড়ার তিনি ছিলেন যেমন বিরোধী, তেমনি বিচার-নিষ্ঠাযুক্ত পড়ার প্রতি ছিলেন পরম-অনুরাগী। কতবারই না তিনি বলেছেন: 'ত্মাখো, মূর্খের কখনো ধর্ম হয় না—ভগবান লাভ তো পরের কথা। জানার আগ্রহ যার মধ্যে যত বেশী—ততই সে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জান্‌বে। পরিপূর্ণতাই ভগবানের রূপ! আত্মানু-ভূতিতেই আসে আসলে পূর্ণতার রূপ। শিখ্‌বো না কিছু, জান্‌বো না বা কর্‌বো না কিছু—এতো মহাতমোগুণের লক্ষণ। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) গেলে দেখ্‌বে জ্ঞানের মর্যাদা ওরা ক্যামন ক'রে দেয়। ওদেশে লিখ্‌তে পড়্‌তে জানে একশো জনের ভিতর আশী-নব্বই জন লোক। খবরের কাগজ পড়ে, লাইব্রেরী থেকে নিয়মিতভাবে বই দেওয়া-নেওয়া ক'রে, দেশ-বিদেশের খবর রাখে ও কত-কিছু বিষয়ের আলাপ-আলোচনা করে। কিন্তু এদেশে (ভারতবর্ষে) ওদের তুলনায়

এ'সব কতো কম। এদেশে সকলেই পণ্ডিত সাজ্‌তে চায়, অথচ শেখার বা জানার আগ্রহ অধিকাংশের মধ্যেই নেই জান্‌বে। যে যত জান্‌তে ও শিখ্‌তে চাইবে, সে ততোই পরমজ্ঞানরূপ ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাবে। এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বগুণের লক্ষণ, আর পিছিয়ে থাকা তমোগুণের লক্ষণ। কিছু জান্‌বো না, শিখ্‌বো না, যা জমা আছে—তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক্‌বো—এতো মহাতমোগুণের লক্ষণ! সত্ত্বগুণের প্রকাশ না হ'লে বন্ধনমুক্ত হওয়া যায় না, সংসারবন্ধন দূর হয় না। সেজন্যই তো পড়াশোনা। পড়াশোনার অর্থ ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাবে কী ক'রে তার উপায় ও সন্ধান জানা।

স্মৃতি : দুই

একদিন রাত্রিবেলার কথা। স্বামীজী মহারাজ তামাক খাচ্ছেন তাঁর কলকাতার অফিস-ঘরটিতে বসে। রাত্রি তখন হবে আটটা। ঘরে আছি আমরা তিন-চার জন। একজন ভদ্রলোক এসে প্রণাম করলেন তখন মহারাজকে। লোকটিকে দেখে মনে হ'ল তিনি আস্ছেন একেবারে নূতন, আমরাও দেখিনি তাঁকে কখনও কোনদিন। স্বামীজী মহারাজ ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন স্বাভাবিক শিষ্টাচার ও বিনয়ের সংগে: 'মশায়ের আসা হচ্ছে কোথা থেকে?' স্বামীজী মহারাজের স্বভাবের বৈশিষ্ট্যই ছিল তাই। কাকেও তিনি 'তুমি' বা 'তুই' ব'লে সম্বোধন করতেন না—একান্তভাবে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা পূর্ব থেকে তার সঙ্গে না থাকলে। সম্বোধনের এই শিষ্টতা যে কেবল অপরের বেলায়ই ছিল—তা' নয়, আমাদেরও তিনি সম্বোধন করতেন ঠিক একই রকমভাবে কখনও কখনও। যেমন কাকেও তিনি বল্তেন 'তুমি', আবার কাকেও বল্তেন 'তুই'। তা'ছাড়া বাইরের লোকদের সাম্নে আমাদের সকলকেই তিনি সম্বোধন করতেন 'ইনি' বা 'তিনি'. ব'লে। যেমন আমাদেরই একজনকে কোন ভদ্রলোকের সংগে একদিন পরিচয় করিয়ে দেবার সময়ে বল্লেন: 'দেখুন, ইনি ভারী পণ্ডিত ও গাইয়ে লোক। আস্বেন, এঁর সংগে মিশ্বেন, আলাপ-আলোচনা কর্বেন, মনে আনন্দ পাবেন, ইত্যাদি'।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি যে ছিল অপরিচিত তা' পূর্বেই বলেছি। স্বামীজী মহারাজও কোন আবশ্যকতা বোধ করলেন না তাঁর পরিচয় জানার জন্য। দেখে মনে হ'ল লোকটি একটু উদ্‌গ্রীব মহারাজকে কোন-কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য। কিন্তু মহারাজই তার পূর্বে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে: 'তা—মশায়ের জিজ্ঞাসার কোন-কিছু আছে কি?' ভদ্রলোকটি উত্তর করলেন: 'আজ্ঞে হ্যাঁ—মনে যদি না করেন'।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ভদ্রলোকটির সংগে দু'এক কথা বলছিলেন বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার বেশ একটু আনমোনা হ'য়ে পড়ছিলেন। মনে যতটুকু আছে--তখন চৈত্রমাস। বেশ গরম পড়েছে। আফিসঘরের পশ্চিম দিকের দুটো জানালা দিয়ে ভেসে আসছিল ধীরে ধীরে গরম দখিন-বাতাসের ঢেউ। মাথার উপর ঘুরছিল ইলেকট্রিক-পাখা। অম্বুরী ও বিষ্ণুপুরীতে মেশানো তামাকের ধোঁয়ার গন্ধে ঘরটি বেশ মস্‌গুল হ'য়েছিল। ভদ্রলোকটির কথা শুনে মহারাজ হাসিমুখে বল্লেন : 'না না, সে কি কথা। জিজ্ঞাসা করবেন বৈকি ?'

ভদ্রলোকটি কেন যেন একটু ঢোক গিলে বল্লেন : 'আ—জ্ঞে দেখুন, আপনাদের এই চে—য়া—র টে—বি—ল আমাদের চো—খে—।' স্বামীজী মহারাজ সহাস্যে ভদ্রলোকটির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লেন : 'হ্যাঁ বুঝেছি, আপনার বক্তব্য হ'ল যে, আমরা সাধু-সন্ন্যিসী মানুষ, কোথায় থাকবে গায়ে ছাই-ভস্মমাখা, হাতে একটা চিম্‌টে বা ত্রিশূল, গলায় মোটামোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে বিভূতি ও সিন্দুরের ফোটা, চারপাশে ধুনিজ্বালা আর শিষ্য-সামন্তে ঘেরা, তা' নয় সাহেবী চাল-চলন ও বিলেতী আদবকায়দা নিয়ে চেয়ার-টেবিলে বসা, ফিট্‌ফাট পোষাকপরা, বাবুর মতো বসে গড়-গড়ায় তামাক-খাওয়া! সত্যই বড় অশোভনীয় ও অসহনীয়ও বটে! এ' তো ন্যায্য কথাই বলেছেন, বলাও আপনাদের উচিত। কিন্তু আমরাই বা কি করি বলুন দেখি ? ভিক্ষেশিক্ষে ক'রে এই চেয়ার-টেবিলগুলো কিনেছি, আপনারা তো নিজেদের ইচ্ছায় দেবেন না কোন-কিছু, সুতরাং শুধু বলায়ই কি ফল হবে বলুন ? তা'ছাড়া একটা কথা, বাদশাহী-আমলের টাকা এ' যুগে চলে না। নিশ্চয়ই জানেন যে, সমাজটা বদ্‌লাচ্ছে অনবরত মানুষের রুচি ও দৃষ্টির অনুসারে। মানুষ চায় বিচার ক'রে সব-কিছুকে এখন বাজিয়ে নিয়ে চলতে। তাই মডার্ন আদব-কায়দা এখন একটু দরকার আছে বৈকি। তবে বিলাসিতার বাবুয়ানাটা ভাল নয়।

তারপর সাম্‌নের দিকে টাঙানো 'কালী-তপস্বী'-ছবিটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মহারাজ বল্লেন: 'ঐ দেখুন দেখি, ওটা কার ছবি। চিন্‌তে পারেন ?' ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ অথচ উৎসাহ ও ঔৎসুক্যের সঙ্গে ছবিটির দিকে চেয়ে বল্লেন: 'আজ্ঞে না, ঠিক চিনতে পারছি না'। স্বামীজী মহারাজের মুখ বেশ প্রশান্ত ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত। তর্জনী-অঙ্গুলিটি নিজের দিকে হেলিয়ে বল্লেন: 'ওটি হচ্ছেন ইনি—যিনি এই চেয়ারে এখন বসে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর যখন গেল, অনেকেই তখন যে যার যেদিকে খুসী বেরিয়ে পড়লো অনেকে।[১] আমিও তাই করলাম। ওটা আমারই পরিব্রাজক-অবস্থার ছবি। তখন একখানিমাত্র কাপড় ছিল আমার

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ *History of the Ramakrishna Math & Mission* (1957)-গ্রন্থে লিখেছেন: "At this time we find the sons of the Master going to places of pilgrimage and practising spiritual austerities···". গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) সে সময়ে তিব্বতের পথে রওয়ানা হন। তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বরানগর-মঠে যোগদান করেন। নিরঞ্জন মহারাজ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, এপ্রিল মাসে পুরীধামে রওয়ানা হন। বাবুরাম, শরৎ ও কালী (স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ) পদব্রজে পুরী রওয়ানা হন (সম্ভবত ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের পর), রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) শ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে পুরী রওয়ানা হন। যোগেন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ) সাধারণত শ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গেই সেই সময়ে তীর্থভ্রমণে যেতেন, সুতরাং বরানগর-মঠে তিনি বেশীর ভাগ সময়ে থাকতেন না। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হয়ে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন বরানগর-মঠে। সুবোধ ও সারদা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) সে' সময়ে মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণে অতিবাহিত করতেন। হরিপ্রসন্ন (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে একেবারে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ এখানে অন্যান্য বিষয়েরও উল্লেখ করেছেন (*History of the Ramakrishna Math & Mission* গ্রন্থে, পৃ. ৬৩)।

সম্বল। পয়সা-কড়ি কিছু ছুঁতাম না। এক বাড়ী বা তিন বাড়ী মাধুকরী[২] ক'রে যা জুটতো তাই মনের আনন্দে খেতাম। এই ক'রে আসমুদ্রহিমাচল সারা ভারতবর্ষটা খালিপায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি। এখনই না হয় দু'একটা চেয়ার-টেবিল হয়েছে! কিন্তু ছেলেদের আমি কি বলি জানেন? বলি—তোমাদের আদর্শ হবে ঐ কপর্দক-হীন একটি বস্ত্রমাত্রসম্বল পবিব্রাজক কালী-তপস্বী, চেয়ার-টেবিলে বসা এই বয়সের অভেদানন্দ নয়'।

ভদ্রলোকটি একটু অপ্রতিভ ও নির্বাক। ঘরের পরিবেশ তখন জমাট-গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। মহারাজ একটু আনমনা, কিন্তু প্রদীপ্ত ও প্রসন্নোজ্জ্বল তাঁর মুখমণ্ডল। এক মিনিট—কি দু'মিনিট চুপ ক'রে থেকে আবার বলতে লাগলেন তিনি : 'ত্যাগ, তপস্যা, ভগবানে নিষ্ঠা ও অনুরাগ—এ'গুলোই আসলে সাধুর লক্ষণ। বাইরের ভড়ঙ্ তো লোকদেখানো মাত্র, ভিতরের ত্যাগই ত্যাগ। যথার্থভাবে যারা ভগবানের জন্য সব ত্যাগ করেছে—তারাই ধন্য, তারাই জানবেন সংসারে ঠিকঠিক ভোগ করতে জানে। তারা ভোগ করে, কিন্তু ত্যাগের মহিমোজ্জল আলোকে তাদের তথাকথিত স্বার্থের অন্ধকার উজ্জ্বল থাকে। তাদের নিরাসক্ত ভোগ তখন বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হয়, ক্ষুদ্রস্বার্থের ও বিলাসিতার জন্য নয়'।

গীতায় (৩।২০) শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানদীপ্ত অসংসারী বিদেহরাজ জনকের উদাহরণ দিয়েছেন। এ' প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥'

জনক, অশ্বপাত প্রভৃতি রাজারা কর্ম আচরণ ক'রে চিত্তের শুদ্ধি-সাধন করেছিলেন এবং চিত্তশুদ্ধির আলোকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে

২। 'মাধুকরী' বলতে ভিক্ষা।

অনাসক্তভাবে সংসারে সকল কাজ করতেন। তাঁদের জীবন ছিল বিশ্বজনের কল্যাণসাধন করার জন্য। 'লোকসংগ্রহ'[৩] অর্থে লোক সকলকে স্ব-স্ব ধর্মে ও কর্মে প্রবৃত্ত ক'রে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা তাঁদের মুক্তি-লাভ করানো, বা মুক্তিপথে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দান করা। বিদেহরাজ জনক ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে 'এদিক ওদিক দু'দিক'—সংসার ও ব্রহ্মজ্ঞান—আসক্তি ও অনাসক্তি উভয়কে নিয়ে সংসার করতেন। যথার্থ সন্ন্যাসীদের কথা আলাদা। তাঁরা আসক্তির সংসারে থেকেও পরিপূর্ণ নিরাসক্ত জীবন যাপন করতে পারেন। সংসারে ভোগ ও কামনার বন্ধন তাঁদের আর আবদ্ধ করতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন : 'হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্‌লে হাতে আটা লাগে না, তেমনি ঈশ্বর লাভ ক'রে সংসারে থাকলে সংসারের কোন আসক্তিতে মানুষকে আবদ্ধ করতে পারে না'। তাই ঈশ্বরলাভ আগে, তারপর সংসার-করা। কিন্তু তা আর ক'জন করতে পারে ? পারে না বলেই নিন্দা ও স্তুতির ভাগী হয় তারা। কিন্তু পূর্বেই বলেছি যে, জ্ঞানীদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা ভোগের সংসারে থাকলেও ত্যাগের ভাব নিয়ে নিস্পৃহ থাকেন সর্বদা। সংসারে ভোগ-বাসনাহীন জনক রাজা প্রভৃতি সর্বসাধারণের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্যই তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

ভদ্রলোকটি তখন বেশ লজ্জিত হ'য়ে পড়েছেন ব'লে মনে হ'ল। তাঁর মুখে অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য ক'রে স্বামীজী মহারাজের হৃদয়ে যেন একটু বেদনা ও করুণার ভাব ফুটে উঠ্‌লো। তাই সমবেদনার সুরে ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন ক'রে মহারাজ বল্লেন : 'তা—আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। আপনি তো ঠিকই বলেছেন—সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনে ঐশ্বর্যের ও বিলাসিতার ভাব পোষণ করা মোটেই সমীচীন নয়। তবে জ্ঞানীরা সকল-কিছুর পারে'।

৩। আচার্য মধুসূদন-সরস্বতী বলেছেন : 'লোকাণাং স্বে স্বে ধর্মে প্রবর্তন-মুন্মার্গান্নিবর্তনঞ্চ লোকসংগ্রহঃ'। লোককে রক্ষা করাও লোকসংগ্রহকর্ম।

স্বামীজী মহারাজ ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে তারপর ধীরে ধীরে গান করতে লাগলেন—

'আপনাতে আপনি থেকো যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি, (ওরে) খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরমধন সে পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে।
(ও'মন) কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥'

ভগবানের কাছে যে যা চাইবে—তাই পাবে। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু।[৪] আমরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও মুক্তি চেয়েছিলাম, তিনি আমাদের সেই চাওয়া পূর্ণ করেছিলেন। তিনি পরশমণি, স্পর্শ ক'রে আমাদের সোনা ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাই ব'লে আমরা যা করবো, অন্যের পক্ষে তাই হুবহু অনুকরণের বস্তু নয়। ভগবানের উপর আত্মসমর্পণের ভাব না এলে মানুষ নিজের ইচ্ছায় কখনো কিছু করতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমরা সবই সঁপে দিয়েছিলাম—তনু, মন, বুদ্ধি—সবই। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই আমাদের সকল ভার নিয়েছিলেন, বেতালে কোনদিন আর পা ফেলতে দেন নি।

ভদ্রলোকটি স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। মহারাজ সস্নেহে তাঁকে বল্লেন : 'আবার আসবেন'।

প্রসন্নমূর্তি স্বামীজী মহারাজের সেই দিনকার সদয় আচরণ দেখে আমরা সকলেই বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। স্পষ্টবাদীতার সংগে সংগে ভালবাসা ও করুণাপূর্ণ হৃদয়-বিনিময়ের ভাব সংসারে একেবারেই বিরল। অনন্যসাধারণ ছিল তাঁর মধ্যে গাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গে

৪। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন—
'আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে (মন)
চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥'…
চারি ফল—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কল্পতরুর (ভগবানের) কাছে যা চাওয়া যায় (আন্তরিকভাবে), তাই পাওয়া যায়।

কমনীয়তা ও কোমলতার স্পর্শ, আর বিরাট-বিপুল ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মনীষা! জ্ঞানে গুণে পাণ্ডিত্যে বিচারে কথায় গল্পে হাসি-ঠাট্টা-তামাসায় সকল-কিছুতেই তিনি ছিলেন সুদক্ষ ও মহান্! কোন-কিছু বিষয়ে দৈন্য তাঁর জীবনে কোনোদিনই আমরা দেখিনি। রক্তে-মাংসে-গড়া আমাদেরই মতো ছিলেন যেন তিনি সাধারণ মানুষ, আমাদেরই মতো করতেন আহার-বিহার, কইতেন কথাবার্তা, অথচ জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও চিন্তায় ছিলেন আমাদের চেয়ে কতো মহান্। তারপর এতগুলি গুণ ও শক্তির সমাবেশ একটিমাত্র মানুষেই বা সম্ভব হ'তে পারে কিভাবে—এটাই হয়েছিল তখন যেন আমাদের গবেষণার বিষয়। বিচিত্র বিষয়ের উপর অধিকার ও অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ। গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সূক্ষ্মচিন্তা ও বিচারশীলতা, বিরাট পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিকতার সংগে সংগে সাংসারিক খুঁটিনাটির জ্ঞানও ছিল তাঁর জীবনে অপরিসীম ও অফুরন্ত। মোটকথা সকল অভিজ্ঞতার তিনি ছিলেন যেন প্রশান্তমহাসাগর। ভারতীয় দর্শনের প্রতিটি শাখা, গ্রীক, জার্মান ও য়ুরোপীয় দর্শনের খুঁটীনাটি, তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান, ধর্ম ও বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য, কাব্য, নাটক ও ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্প, উভয় দেশের তুলনামূলক সঙ্গীতের বিজ্ঞান, উদ্ভিজ্জবিজ্ঞান, প্রাণীতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান প্রভৃতি ছাড়াও জানতেন তিনি কৃষিবিজ্ঞান ও হাতেনাতে চাষের কাজ, দর্জীর ও কাঠের কাজ, বাড়ীঘর তৈরী করার নিয়মনীতি ও কাজ, রান্নার কাজ প্রভৃতি। পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচারে গিয়ে তিনি ওদেশের ধর্ম, আচার, দর্শন ও ইতিহাস প্রভৃতি যেমন আয়ত্ত করেছিলেন, তেমনি আয়ত্ত করেছিলেন খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক জ্ঞান। পড়েছিলেন বাইবেল, বাইবেলের যতরকম ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনী, হায়ার-ক্রিটিসিজম্ প্রভৃতি। তাছাড়া পড়েছিলেন চার্চের ইতিহাস (এক্লেসিয়েসটিক্যাল্ হিষ্টরি অব্ চার্চ্) ও ভিন্ন ভিন্ন রকম ভার্সনের বাইবেল ও তাদের ইতিহাস। এতো সব পড়ার সুযোগ-পেয়েছিলেন তিনি তদানীন্তন আমেরিকার সুবিখ্যাত মনীষী

হিবার-নিউটনের সুরক্ষিত সুবিশাল লাইব্রেরীতে। হিবার-নিউটন ছিলেন তাঁর একজন পরমবন্ধু।[৫]

খ্রীষ্টধর্মসম্বন্ধে জ্ঞান ছিল স্বামী অভেদানন্দের কত গভীর তা লিখে বোঝানো কঠিন। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার পরিপূর্ণ অনুভূতি নিয়ে তিনি পদার্পণ করেছিলেন খ্রীষ্টধর্মপ্লাবিত পাশ্চাত্যভূমিতে সুমহান্ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সার্থক হয়েছিল

5. THE STATESMAN, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 1906. states: "SWAMI ABHEDANANDA, the spiritual brother (Gurubhai) of the late Swami Vivekananda, whose series of remarkable addresses at the World Congress of Religions, held at the World's fair in Chicago in 1893, will be remembered, arrived in Calcutta on Sunday after an absence from India of over nine years. He told a representative of the *Statesman*, who called on him yesterday that he went to London in 1896 and after lecturiug for about a year crossed to New York at the invitation of the Vedanta Society of the New York. He had been in America ever since, and had continued the work begun by his brother disciple Vivekananda. Reviewing very briefly the progress of Vedanta in America, the Swami said he had met with much sympathy on all hands and, as a matter of fact the only people in the United States, who had shown any unfriendliness, were the clergy who had a special interest in Indian missions.

"Have you been able to enlist the particular interest of the clergy in the preaching of Vedanta ?" asked the interviewer,— "Oh yes! The Rev. R. Heber Newton, D.D. of New York, an anglican priest is an honorary member of the Society and a number of others. Prof. Lanman of Herverd is another, so is Prof. Hiram Corson of Cornell, whilst the president and officers are all men highly educational and scientific circles. I was also, when in New York shortly before my departure, invited to lecture to a meeting composed of clergymen, and did so. They herad my message sympathetically."

তাঁর কল্যাণময়ী প্রচেষ্টা। অসংখ্য প্রতিকূল অবস্থার ও পরিবেশের সংগে অক্লান্ত সংগ্রাম করতেও হয়েছে তাঁকে কম নয়। বিরুদ্ধবাদী গোঁড়া খ্রীষ্টান-পাদরী ও পণ্ডিতদের অপপ্রচার ও অযথা সমালোচনার বিপক্ষে অভিযান চালাতে হয়েছে তাঁকে অজস্রভাবে। কিন্তু অতিক্রম করেছিলেন তিনি সকল বাধা-বিপত্তির ঝঞ্ঝাকে নিজের অসাধারণ প্রতিভা, অবিচলিত আত্মপ্রত্যয়, প্রদীপ্ত ত্যাগ-তপস্যা, প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও প্রত্যক্ষ-আত্মানুভূতির প্রজ্ঞানদীপ্ত আলোকে।

শুধুই খ্রীষ্টধর্ম কেন—সকল ধর্মের ছিলেন তিনি সমান পূজারী। এই সুমহান্ মনোভাবের শক্তি, আদর্শ ও উদারতা লাভ করেছিলেন তিনি তাঁর বিশ্ববরেণ্য আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ পমহংসদেবের কাছ থেকে। অন্যায় ও অযথা অত্যাচার, অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রান্তধারণা, অযৌক্তিক ভাবপ্রবণতা ও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্রমাগতই সংগ্রাম করেছিলেন তিনি বীরসন্ন্যাসীর মতো, বিজয়লাভও করেছিলেন জীবনের প্রতিটি কর্মে পাদক্ষেপে ও প্রচেষ্টায়।

খ্রীষ্টধর্মের আদর্শের উপর ছিল মহারাজের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। যীশুখ্রীষ্টকে তিনি বলতেন একজন পরমযোগী, ঈশ্বরলাভ করেছিলেন যীশুখ্রীষ্ট সাধকেরই মতো ঐকান্তিক অধ্যাত্মসাধনার ভিতর দিয়ে। "হাউ টু বি এ-যোগী" বা 'যোগশিক্ষা'-গ্রন্থে তিনি 'যীশুখ্রীষ্ট যোগী ছিলেন কি-না' আলোচনায় প্রমাণ করেছেন: যীশুখ্রীষ্ট এসেছিলেন মধ্য-এশিয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষে ও শিক্ষা করেছিলেন ভারতীয় সাধনার পদ্ধতি। খ্রীষ্টধর্মের ভিতর গোঁড়ামীর ভাবকে মহারাজ পছন্দ করতেন না কোনদিনই। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) সোজাসুজিভাবে খ্রীষ্টধর্মসেবীদের তিনি বলতেন: 'আপনারা গোঁড়ামী ছাড়ুন ও সত্যকারের খ্রীষ্টান হোন'। তিনি বলতেন: 'খ্রীষ্টান-পাদ্রীরা ও পরবর্তীকালে চার্চের সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণভাবসম্পন্ন নিয়ম-কানুনই খ্রীষ্টধর্মকে করেছিল অনুদার ও বিকৃত, অথচ খ্রীষ্টধর্মই শিক্ষা দেয় সার্বজনীন ভ্রাতৃপ্রেম ও ভালবাসা (universal brotherhood and love)। সুতরাং

সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ-দৃষ্টি থাকা উচিত নয় খ্রীষ্টধর্মের ভিতর। যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন মহামানব এবং মানবতার ছিলেন পরিপূর্ণ প্রতীক'।

যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর ধর্মচিন্তা-সম্বন্ধে অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন : "Jesus was a great Yogi, because He realized the transitory and ephemeral nature of the phenomenal world, and, discriminating the real from the unreal, renounced all desire for worldly pleasures and bodily comforts. Like a great Yogi, He lived a life of seclusion, cutting of all connections with earthly friends and relatives, and having neither home nor possessions of His own.

"Jesus the Christ was a great Karmayogi, because He never. worked for results. He had neither desire for name nor ambition, for fame or for earthly prosperity. His works were a free offering to the world. He laboured for others, devoted His whole life to help others, and, then, He died for others. Being unattached to the fruits of His actions, He worked incessantly for the good of His fellowmen, directing them to the path of righteousness and spiritual realization through unselfish works. He understood the law of action and reaction, which is the fundamental principle of Karma Yoga, and, it was for this reason, He declared, 'What so ever a man soweth, that shall he also reap.'

"Jesus of Nazareth proved Himself to be a great Bhakti Yogi, a true lover of God, by His unswerving devotion and His whole-hearted love for the Heavenly-Father. His unceasing prayers, incessant supplications, constant meditation, and unflinching

self-resignation to the will of the Almighty made Him shine like a glorious morningstar in the horizon of love and devotion of a true Bhakti Yogi. Christ showed wonderful self-control and mastery over His mind throughout the trials and sufferings which were forced upon Him. His sorrow, agony, and self-surrender at the time of His death as well as before His crucifixion, are conclusive proofs that He was a human being with those divine qualities which adorn the soul of a true Bhakti Yogi. It is true that his soul laboured for a while under the heavy burden of His trials and sufferings ; it is also true that He felt that His pain was becoming wellnigh unbearable when He cried along three times, praying to the Lord, 'O my Father, if it be possible, let this cup pass from me.' But He found neither peace nor consolation until He could absolutely resign His will to that of the Father and could say from the bottom of His heart, 'Thy will be done. Complete self-surrender and absolute self-resignation are the principal virtues of Bhakti Yoga, and as Christ possessed these to perfection up to the last moment of His life, He was a true Bhakti Yogi.

"Like the great Raja Yogis in India, Jesus knew the secret of separating His soul from His physical shell, and He showed this at the time of His death, while body was suffering from extreme pain, by saying, 'Father, forgive them, for they know not what they do.' It is quite an unusual event to see one imploring forgiveness for his persecutors while dying on the cross, but from a Yogi's point of view, it is

both possible and natural. Ramakrishna, the greatest Yogi of the nineteenth century, whose life and sayings have been written by Max Muller. was once asked, 'How could Jesus pray for His persecutors when He was in agony on the cross ?' Ramakrishna answered by an illustration : 'When the shell of an ordinary green cocoanut is pierced through, the nail enters the kernel of the nut too. But, in the case of the dry nut, the kernel becomes separate from the shell, and so when the shell is pierced, the kernel is not touched. Jesus was like the dry nut, i.e., His inner soul was separate from His physical shell, and, consequently, the sufferings of the body did not affect him.' **Therefore He could pray for the forgiveness of His persecutors even when His body was suffering ; and all true Yogis are able to do the same. There have been many instances of Yogis whose bodies have been cut into pieces, but their souls never for a moment lost that peace and equanimity which enabled Jesus to forgive and bless His persecutors. By this Christ proved that, like other Yogis, His soul was completely emanicipated from the bondage of the body and of the feelings. Therefore Christ was a Yogi.

"Through the path of devotion and love Jesus attained to the realization of the oneness of the individual soul with the Father or the Universal

Spirit, which is the ideal of a Jnana Yogi as well as the ultimate goal of all religions. A Jnana Yogi says: 'I am He'; 'I am Brahman'; 'I am the Absolute Truth'; 'I am one with the supreme Deity.' By good works, by devotion, love, concetration, contemplation, long fasting, and prayer, Jesus the Christ realized that His soul was one with God, therefore, He may be said to have attained the ideal of Jnana Yoga."

অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট একাধারে কর্মযোগী, ভক্তিযোগী, রাজযোগী ও জ্ঞানযোগী ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ ক'রে বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করেছিলেন, বহু সাধু-সন্ত-যোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং ভারতবর্ষে যোগসাধনা শিক্ষা ক'রে ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন। সেজন্যই তাঁর জীবনে ও শিক্ষায় আমরা ভারতীয় ধর্ম ও ধর্মানুভূতির প্রোজ্জ্বল আদর্শ লাভ করি।

পুনরায় অভেদানন্দ মহারাজ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বলেছেন: 'যীশুখ্রীষ্ট যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, গ্যালিলি ছিল তখন বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল, আর পারসিক, গ্রীসীয়, পীথাগোরিয়ান্, এসেনি, থেরাপুত্ত ও বৌদ্ধ ধর্মের আলোক ছিল সেখানে চিরসমুজ্জ্বল! বৌদ্ধশ্রমণরা ভারতের সংস্কৃতির বীজ ছড়িয়েছিল উত্তর-প্যালেস্তাইনের চারদিকে যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় দুশো বছর আগে। সর্বত্যাগী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা (ভিক্ষুরা) প্রচার করেছিলেন মৈত্রী, করুণা ও বিশ্বপ্রেমের ভাবধারা শুধুই প্যালেস্তাইনে ও সিরিয়াতে নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতেই। ইহুদী-সম্প্রদায়ের এসিনী ও থেরাপুত্ত-সম্প্রদায়ই তার চাক্ষুষপ্রমাণ। যীশুখ্রীষ্ট আসলে ছিলেন এসিনীসম্প্রদায়ের সাধক তান্ত্রিকচক্রের অনুষ্ঠান করতেন তিনি পর্বতগুহার ভিতর নিশীথে ও নিরালায় বসে এবং ঐতিহাসিক নজিরও তার পাওয়া যায় প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্য মনীষীদের লেখার ভিতর। এসিনী 'ঈশানী'-শব্দের অপভ্রংশ।[৬] 'ঈশানী' মহাদেবী গৌরী বা দুর্গার এক নাম। দেবী দুর্গা আদ্যাশক্তিরূপিণী, সুতরাং ঈশানীর উপাসকরা ছিলেন যে পুরোদস্তুর তান্ত্রিকসম্প্রদায়ের সাধক তাতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। অনেকের মতে তন্ত্রবাদ বা তন্ত্রাচার বেদাচারেরই সমসাময়িক। এসিনীসম্প্রদায় যে তান্ত্রিকসাধনার অনুষ্ঠান করতেন, তা তাঁদের চক্রানুষ্ঠান ও নিভৃতে-সাধনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এসেনীকে অনেকে 'ঈশাহী'-সম্প্রদায়ভুক্ত বলতে চান।

এসেনী ও বৌদ্ধশ্রমণ এই উভয়ের আচার-ব্যবহার ও সাধনার মধ্যে বেশ কিছুটা মিল পাওয়া যায়। থেরাপুত্তবাদ বৌদ্ধধর্মেরই অংশ ও রূপান্তর। 'থেরাপুত্ত' নাম পালিশব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃতে এর নাম 'স্থিরপুত্র'। 'স্থির' বা 'থের' বুদ্ধদেবের একটি নাম। তথাগত-বুদ্ধ ছিলেন শান্তি ও সাম্যের অবতার। যীশুখ্রীষ্টের আদর্শও তাই। যীশুখ্রীষ্ট চেয়েছিলেন সংস্কারাচ্ছন্ন ইহুদীধর্মের অস্থি-মজ্জায় নবপ্রাণ ও নবচেতনার সঞ্চার করতে। তাই স্বর্গরাজ্য ও পৃথিবীর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছিলেন যীশুখ্রীষ্ট। পরবর্তীকালে স্বর্গরাজ্যকে পৃথিবী থেকে পৃথক করেছিলেন মনীষী সেন্ট্‌পল। যীশুখ্রীষ্টের বাণী ছিলঃ 'স্বর্গরাজ্য

৬। পুরাতত্ত্ববিদ্ মনীষী আর্থার লিলি তাঁর *India is Primitive Christlinity*-গ্রন্থে লিখেছেন: 'যীশু একজন এসিনী ছিলেন এবং ভারতীয় যোগীদের মতো নিভৃত স্থানে ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ববোধ ও পরমাত্মার আশীর্বাদ লাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন'।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *India & Her People*-গ্রন্থে লিখেছেন 'এসিনী নামের মূল (origin) আমাদের নিকট ভারতীয় 'ঈশান' নাম বলিয়া মনে হয়। ঈশান শিবেরই অন্যতম নাম। শিব বিশেষভাবে যোগের দেবতা। * * ঈশও শিবের বিশেষ নাম। ঈশাইনাথ নামও ঈশের বা শিবের উপাসক অর্থ প্রকাশ করে। 'নাথ'-শব্দটি পৃথকভাবে শিবেরও স্বরূপ-জ্ঞাপক। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই মন্তব্য করেছেন পুনরায় তাঁর 'কাশ্মীর ও তিব্বতে'-গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৮)।

আমাদেরই (মানুষেরি) হৃদয়রাজ্যে অধিষ্ঠিত' ('Kingdom of Heaven is within us')। আদম ও ইভের কথাও তাই। ইভা তথা সমগ্র নারীজাতির উপর পাপের বোঝা চাপিয়েছিলেন সেন্টপল ও পরবর্তী খ্রীষ্টানচার্চের অধিনায়করা। এ'কথাও আবার সত্য যে, খ্রীষ্টধর্ম একরকম লোপ পেতেই বসেছিল যীশুখ্রীষ্টের মহাপ্রয়াণের পর, মহাত্মা সেন্ট্পলই করেছিলেন তার মৃতপ্রায় শরীরে নবপ্রাণের সঞ্চার। বর্তমান খ্রীষ্টধর্ম তাই ঋণী সেন্ট্পলের কাছে। কিন্তু এ'কথাও আবার সত্য যে, সেন্টপল অনুসরণ করেছিলেন যদিও যীশুখ্রীষ্টের সাম্যের আদর্শ, কিন্তু অটুট রাখতে পারেন নি সেই আদর্শকে তাঁর পরবর্তী জীবনে। পাপ-পুণ্যের ব্যবধানই বরং কলঙ্কিত করেছিল খৃষ্টধর্মের পবিত্রতাকে, আর পৃথিবীকে সেন্টপল বলেছিলেন পঙ্কিল স্বর্গরাজ্যের তুলনায়।

স্বামীজী মহারাজের মতে স্বর্গরাজ্য সুদূর আকাশে মেঘের আড়ালে অথবা পরীদের দেশে নয়, মানুষের হৃদয়েই তা অধিষ্ঠিত। মানুষই তার ধারণা দিয়ে স্বর্গলোক সৃষ্টি করেছে। যা একান্ত সুন্দর ও যার চাইতে উৎকৃষ্ট ও কল্যাণদায়ী আর-কিছু নেই, হিন্দুরা তাকেই 'স্বর্গ'-আখ্যা দিয়েছেন। পুরাণে স্বর্গের বর্ণনা নানান্ রকমভাবে দেওয়া আছে। স্বর্গেরই বিপরীত ধারণা-রূপে নরকের সৃষ্টি। আসলে স্বর্গ ও নরক দু'টিই মানুষের মনের সৃষ্টি। মানুষের মনের কল্পনাই এ'দুটিকে সৃষ্টি ক'রে করেছে এককে অন্য থেকে পৃথক। স্বামীজী মহারাজ তাঁর Path of Realization-গ্রন্থে বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বর্গের বিভিন্ন ধারণার কথা বর্ণনা করেছেন।

যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন : 'Love thy neighbour as thyself'— 'আমাদের নিজেদের উপর যে'রকম মমতা ও ভালবাসা, প্রতিবেশী বা সমগ্র মানবজাতি ও প্রাণীর উপর ঠিক সে'রকম ভালবাসাই থাকা

৭। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : 'ঈশ্বরঃ' সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'। উপনিষদে আত্মার স্থান হৃদয়পুণ্ডরীকে, বা হৃদয়পদ্মে নির্দিষ্ট।

উচিত'। এর নাম সমদর্শন বা সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'—এটি এ' ধারণারই সমগোত্রীয়। যীশুখ্রীষ্টের এ'কথা বলার উদ্দেশ্য যে, ভালবাসা দিয়েই স্বর্গরাজ্য জয় করা যায়। 'ভালবাসা দিয়ে অধিকার করা' বলতে নিজের প্রেম-স্বরূপ আত্মার অনুভূতি লাভ করা। পবিত্রতাও মানুষের জন্মগত সংস্কার, বরং নরকের ধারণাই খ্রীষ্টানধর্মে অভিশাপ সৃষ্টি করেছে। যীশুখ্রীষ্ট তাই বলেছেন : 'The Kingdom of Heaven is within us; seek and itshall begiven unto you,'—একান্ত আকুলতার ও মুক্তির আকাঙ্খাই মানুষকে শাশ্বতী শান্তির সন্ধান দিতে পারে। পাশ্চাত্য দার্শনিক গ্রীন (T.H. Green) বলেছেন : 'আকুলতা বলতে তীব্রক্ষুধা বা হাংগার (hunger) । Hunger বা অন্তরের যথার্থ ক্ষুধার নাম 'মুমুক্ষুত্ব' বা মুক্তির ইচ্ছা। মুক্তির ইচ্ছাকেই যীশুখ্রীষ্টের কথায় বলা হয়েছে 'knock করা' বা আঘাত দেওয়া। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন : 'Knock and the door shall be opened upto you,'—ভগবানকে জানার একান্ত আগ্রহ ও আকাঙ্খাই হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করে। 'রুদ্ধদ্বার' বলতে জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত অজ্ঞান-সংস্কার (সূক্ষ্মবাসনা)—যার জন্য মানুষ মুক্তির আলোক থেকে বঞ্চিত হয়। মানুষের মনে তাই ঐকান্তিকী ইচ্ছা ও তীব্র আকুলতা থাকলে অজ্ঞান-অন্ধকার এ'জন্মেই জ্ঞানের আলোকে প্রোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। মুক্তিলাভের ইচ্ছা বা 'মুমুক্ষুত্ব' অন্তরে তাই থাকা চাই। কেবল পাপচিন্তা বা নিজেকে হীন-দীন ও অপবিত্র ব'লে চিন্তা করলে মায়ার অন্ধকার দূর করা যায় না, বরং মায়া অন্ধসংস্কারের আকারে অন্তরে থেকে যায়।

খ্রীষ্টানধর্মের সম্বন্ধে বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর মনীষাপূর্ণ আলোকে বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে স্পষ্টভাবে করেছেন। তার সাক্ষ্য তাঁর 'ডিভাইন্ হেরিটেজ অব্ ম্যান্', 'হোয়াই এ' হিন্দু এক্‌সেপ্টস্ খ্রাইষ্ট্ এ্যাণ্ড্ রিজেক্টস্ চার্চিয়ানিটি',

'ওয়াজ খ্রাইষ্ট্ এ' যোগী','ডিড্ খ্রাইষ্ট্ টিচ্ এ' নিউরিলিজিয়ান' প্রভৃতি বক্তৃতামালা। ইংরাজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার আমেরিকার 'দি সান্'-পত্রিকায় স্বামী অভেদানন্দ 'খ্রাইষ্ট্ ওয়াজ এ' গ্রেট্ যোগী'-সম্বন্ধে বক্তৃতার যে সারাংশ ছাপা হয়েছিল তা' সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে এক তীব্র-আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক খ্রীষ্টান ও পণ্ডিতসমাজ স্বামী অভেদানন্দকে কী ধরনের শ্রদ্ধা ও সমাদরের অঞ্জলি দান করেছিলেন তা' তখনকার বিখ্যাত পণ্ডিত হায়রাম কর্সনের (Hiram Corson) প্রশংসা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। অধ্যাপক হায়রাম কর্সন ছিলেন আমেরিকার কর্ণওয়েল বিশ্ববিত্থালয়ের (Cornwell University, U. S. A.) ইংরাজী সাহিত্যের এমেরিটাস্ অধ্যাপক। তিনি স্বামী অভেদানন্দের সারল্যে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'য়ে স্বামীজীর সঙ্গে চিরদিনের জন্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মনীষী হায়রাম কর্সন অভেদানন্দ মহারাজের দেওয়া দু'চারখানি বই পড়ে আনন্দে একবার লিখে পাঠিয়েছিলেন : 'I have read carefully well of your publications, some of them several times, and I do not remember that I come upon anything which I could not endorse intellectually or spiritually'—'স্বামীজী, আপনার সমস্ত গ্রন্থ আমি একান্ত আগ্রহ ও যত্নের সংগে পড়েছি। তাছাড়া তাদের ভিতর কয়েকখানি গ্রন্থ অনেকবারই পড়েছি এবং আমার মনে হয় যে, আমি এমন-কিছু পেয়েছি যা বিচার বা আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে তাদের পূর্ণসমর্থন না পেয়েছি'। 'ওয়াজ খ্রাইষ্ট্ এ যোগী[৮]— বক্তৃতা পড়ে মনীষী কর্সন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে আর একবার

৮। আমেরিকায় প্রকাশিত 'অ্যাডাপ্ট অব গ্যালিলি'-গ্রন্থে এই-বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে সে ভারতীয় যোগসাধনার ধারা সঞ্জিবীত ছিল, 'অ্যাডাপ্ট অব গ্যালিলি'-গ্রন্থ তা প্রমাণ করে। এই গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে যে, যীশুখ্রীষ্ট ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তা ছাড়া 'আনসিন্ লাইফ অব্ খ্রাইষ্ট'-গ্রন্থেও একথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

লিখেছিলেন : '* * which clears up so much in regard Jesus,'—'আপনার বক্তৃতা প'ড়ে যীশুখৃষ্টসম্বন্ধে আমার চিন্তা ও ধারণার জগতে একটা যুগান্তর এনে দিয়েছে'। 'It is a conclusion to which Christian *orthodoxy* must finally come'—যীশুখৃষ্ট-সম্বন্ধে আপনি এমনি চূড়ান্ত-মীমাংসা করেছেন যাতে গোঁড়ামীভাবাপন্ন খ্রীষ্টানমতকেও পরিশেষে আপনার সিদ্ধান্তের কাছে মাথা নত করতে হয়েছে'।

স্বামী অভেদানন্দের 'ডিভাইন্ হেরিটেজ অব্ ম্যান'-গ্রন্থসম্বন্ধে আধ্যাপক হায়রাম্ কর্সন পুনরায় মন্তব্য করেছেন : 'This book is throughout a golden treasury of religious thought',—গ্রন্থটি ধর্মচিন্তার স্বর্ণখনিবিশেষ বা 'refined gold'—খাঁটি-সোনা। তিনি আরও লিখেছিলেন : 'The spread of the Vedanta philosophy will do much to bring about a return to essential Christianity as distinguished from Churchianity. Your lecture on *Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity*, I value very much. It is an exposition, as are all your writings, of true Christianity, without its theological worths or rumours'.—'বেদান্তদর্শনের প্রচার অথবা কথিত গির্জার আওতা থেকে পৃথক ক'রে খ্রীষ্টধর্মের উপর সত্যকার চেতনা ও ধারণা আনতে আপনার গ্রন্থ যথেষ্ট সাহায্য করবে'। 'কেন হিন্দু খ্রীষ্টকে মানে এবং গির্জাকে বর্জন করে'-শীর্ষক আপনার বক্তৃতাটিকে আমি অত্যন্ত অধিক মূল্য দান করি। আপনার অন্যান্য অভিব্যক্তির মতো এটিও ধর্মের চাকচিক্য ও অপাঙ্গের বাইরে প্রকৃত খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যা'।[৯]

এই ধরনের কতশত প্রশংসাবাদ ও মন্তব্যের উল্লেখ ক'রে আলোচনার বিষয়কে এখানে অযথা ভারাক্রান্ত করতে চাই না,

৯। পরিশিষ্টে ইংরাজীতে এ' সম্বন্ধে একটি পত্রের অনুলিপি দেওয়া হয়েছে।

তবে খ্রীষ্টধর্মপ্লাবিত সুদূর পাশ্চাত্যদেশে নগণ্য অজ্ঞাতকুলশীল একজন ভারতীয় ধর্মপ্রচারকের খ্রীষ্টধর্মসম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যসমর্থিত সুনিশ্চিত সমালোচনা তখনকার বিখ্যাত চিন্তাশীল অধ্যাপক হায়রাম কর্সন, অধ্যাপক রয়েস্, উইলিয়াম জেমস, অধ্যাপক জ্যাক্সন, অধ্যাপক পার্কার, মনীষী হিবার নিউটন, মাননীয় কার্টার-প্রমুখ মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই অতীত পরাধীনতার যুগে একজন ভারতবাসীর পক্ষে এটি বড় কম সম্মান ও গৌরবের বিষয় নয়!

॥ স্মৃতি ঃ তিন ॥

স্বামী অভেদানন্দের জীবন ছিল বিচিত্র রকমের অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিপূর্ণ। সাধারণ সাংসারিক জ্ঞান—যেমন জমি কেমন ক'রে চাষ করতে হয়, কখন ও কি রকমভাবে জমিতে সার দেওয়া প্রয়োজন — এ'সকল বিষয়ও তাঁর বিশেষভাবে জানা ছিল। আমেরিকায় থাকাকালে হাতেনাতে সকল কাজই তিনি করতেন। আপেল, আলু, ধান, গম, ভুট্টা ও নানান্ রকমের শাকসব্জীর চাষও তিনি রীতিমতভাবে করেছিলেন এসব বিষয়ের উপর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ পড়ে ও জেনে। পশুপালন করার অভিজ্ঞতা-অর্জনও তাঁর জীবনে বাদ পড়েনি। দুধের তৈরী জিনিস, ভিন্ন ভিন্ন রকমের মিষ্টি তৈরী, হরেক রকম রান্নার প্রণালী, ছাড়া ছুঁতোরের কাজ, দর্জীর কাজ —জামা প্যান্ট কোর্ট সার্ট টুপি প্রভৃতির ছাঁট, সেলাই, ডিজাইন করা সমস্তই তিনি শিক্ষা করেছিলেন। সাইকেল ও ঘোড়ায় চড়া, মোটর-চালানোও তিনি শিক্ষা করেছিলেন আমেরিকায় থাকাকালে তাঁর প্রচারকর্মের কাজের সুবিধার জন্য।

আমেরিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর যখন স্বামী অভেদানন্দ ক'লকাতায় থাকতেন্ তখন নিজের হাতে তৈরী করতেন জামা, কাপড়, টুপী ও মোজা থেকে আরম্ভ ক'রে পোষাক-পরিচ্ছদ সকল-কিছুই। আমাদেরও তিনি বলতেন অনেক সময়ে : 'সাধু হয়েছ ব'লে অভিমান ও কুঁড়েমি করবে কেন ? 'জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত সকল জিনিষই শিখ্তে হয় ও কর্'তে হয়। ভগবান লাভ কি আর সহজে হয় ? কোন কাজেই ফাঁকি দিতে নেই। এতটুকু কুঁড়েমি বা দীর্ঘসূত্রতা থাকলে হবে না। জীবনে পরিপূর্ণতার নামই তো মুক্তি। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান কি আর আস্‌মান থেকে অম্‌নি পড়ে, —না গাছে ফলে। সকল-কিছুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জীবনটাকে পরিপূর্ণ ক'রে তুল্‌তে হয়। নইলে হয়তো জিজ্ঞাসা করলাম :

'কিরে, এটা জানিস্?' বল্লে—'আজ্ঞে না'। 'ওটা জানিস্?' 'আজ্ঞে না'। সবটাতেই কেবল—না না, আর না। এ'রকম হ'লে কি হবে বলো? ভগবান লাভ—সে' বড় শক্তকথা! সবার চাইতে সেই লাভ হ'ল বড়কথা। এটা পারবো না, ওটা পারবো না, কিন্তু ভগবান লাভ করবো—এ' কেমন ক'রে হয়? কিছু পার্‌বো না—এ'তো কুঁড়েমি! কোন কাজ করবো না বা কোন কাজ শিখবো না, কিন্তু কেবল বসে বসে ধ্যান কর্‌বো—এতো চালাকি। কাজে ফাঁকি দেওয়ার এও একটা মতলব মাত্র। সকল বিষয়ে ফাঁকি দিলে নিজেকে শেষপর্যন্ত ফাঁকিতে পড়্‌তে হয়। তাই কোন বিষয়ে কুঁড়েমি করা ভাল নয়। তোমরা বীর্যবানের সন্তান, অমৃতের সন্তান। জগতে সবটার ভিতরেই সাকসেস্ (success—কৃতকার্যতা) চাইবে। তবেই জীবনে সিদ্ধি'।

স্বামীজী মহারাজের ছিল অপার্থিব ও পরিপূর্ণ জীবন। তেজোদীপ্ত ছিল তাঁর মুখ, দৃঢ়তাব্যঞ্জক ছিল দৃষ্টি, কথা ও কাজের মধ্যে ছিল সামঞ্জস্য বা balance। তাছাড়া সকল কাজেই ছিল তাঁর একান্ত উৎসাহ, অনুরাগ ও কৃতকার্যতার ভাব। গভীর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ডুবে থাকলেও তাঁর শরীরের প্রতিটি শিরায় সঞ্চারিত ছিল অফুরন্ত কর্মের প্রচণ্ড প্রেরণা। সমগ্র জীবনে কর্মস্রোতের ভিতর দিয়ে ছুটতেও হয়েছে তাঁকে অবিশ্রান্তভাবে! জীবনের শেষমুহূর্ত-পর্যন্ত বিশ্রাম তাঁর জীবনে ছিল না।

আমেরিকায় থাকাকালে এমন কতদিন গেছে যে, হোটেলের ভাড়া-পর্যন্ত তিনি দিতে পারেন নি, সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয়েছে সর্বহারার মতো! মালপত্র গাড়ীতে বোঝাই দিয়ে চলতে হয়েছে কতদিন নিরুদ্দিষ্ট পথে, মাথা রাখার স্থানও এতটুকু ছিল না। তার ওপর সকলেই ছিল সেখানে অপরিচিত। একদিন হয়তো উঠলেন একটা হোটেল থেকে আর একটা হোটেলে গিয়ে, ভাড়াও ঠিক হ'ল, কিন্তু একটি পয়সাও নেই হাতে। জিনিষপত্র

রেখে গেলেন হয়তো একটা পাবলিক (সাধারণ) হলে বা লাইব্রেরীতে, শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে আলাপ ক'রে বন্দোবস্ত করলেন কোন লেকচারের বা ক্লাসের। যৎসামান্য যা-কিছু পেলেন তা' থেকে চালালেন তিনি সেদিনকার খাওয়া-পরা ও হোটেলের ভাড়া দেওয়া কোন রকমে। এ' রকম করেই কেটেছে তাঁর আমেরিকায় কতদিন তার ইয়ত্তা নেই। তারপর হয়তো ক্লাস করতে করতে লোকের সংগে হ'ল পরিচয়, শিক্ষিত লোকেরা বুঝ্‌লেন স্বামীজী মহারাজের পাণ্ডিত্য, সুতরাং সহানুভূতি পেতে লাগলেন ক্রমে বিদ্বন্মণ্ডলীর কাছ থেকে, মাথা গোঁজার স্থানও হ'ল তখন একটু কোন রকমে।

এ'ধরনের কত কথাই না শুনেছি তাঁর মুখ থেকে আমরা কতদিন। *Leaves from My Diary*-তে তিনি এ'সম্বন্ধে কিছু উল্লেখও করেছেন। তিনি বলেছেন: 'I was determined to find ways and means for making a success of the Vedanta work in New York, which was started by Swami Vivekananda. There were neither funds nor donations to carry on my work. I had to earn my living pay the room rent as well as for my meals in resturants, the rent of the hall and meet my personal expenses and the expenses of weekly advertisements in various newspapers. I had no other source of income than the voluntary contributions, taken in a basket after my classes and public lectures which were not enough to meet all these expenses. Therefore I tried to economise and sacrifice my personal comforts, by accepting the invitations for my meals from the students of my classes.

This was like the *bhiksha'vritti* of the Hindu Sanyasins in India'.—অর্থাৎ 'স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তপ্রচারের যতটুকু সূত্রপাত করেছিলেন আমেরিকায়, তাকে সফল ক'রে তুলতে আমি উপায় খুঁজতে লাগলাম। কাজ চালানোর জন্য আমার কাছে তখন টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না, বা কোন রকম দানও ছিল না, কাজেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমাকে একাই থাকবার ঘরভাড়া ও হোটেলের খরচপত্র, লেক্‌চারহলের ভাড়া, নিজের পকেট-খরচা, বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও অন্যান্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার টাকা-পয়সা—সবই সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ক্লাস ও সাধারণ বক্তৃতার পর শ্রোতারা স্বেচ্ছায় যে যা বাক্সে দিতেন তা' ছাড়া টাকা পয়সা পাওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু আমার যা খরচ, তার তুলনায় আয় খুব সামান্যই ছিল। কাজেই নিজের সকল-কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে তখন ছাত্রদের কাছেই আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাকে অনেকদিন খরচ-সংকুলান করতে হয়েছে। এটা ছিল এক রকম ভারতের সন্ন্যাসীদেরই ভিক্ষাবৃত্তির মতো'।

তিনি আরও লিখেছেন: 'All the expenses in connection with my lectures, the rent of the hall, etc., including my lodging and boarding expenses were paid from subscriptions and collections in public meetings. As there was no permanent place for me to stay in New York and no fund to meet my expenses when I was not holding classes and delivering lectures, I was obliged to give up my room in boarding houses and to stay as a guest of my acquaintances who invited me in their homes in other cities'.—অর্থাৎ 'আমার বক্তৃতা, খাওয়া-পরা ও হলের ভাড়া-বাবদ সমস্ত খরচ চাঁদা ও সাধারণ বক্তৃতায় যে যা স্বেচ্ছায় দান করতেন সেইসব থেকেই

চল্‌তো। কিন্তু দিনকতক ক্লাস করা বা লেক্‌চার দেওয়া যখন বন্ধ রেখেছিলাম তখন বাধ্য হ'য়ে আমাকে আবার বোর্ডিং ত্যাগ করতে হয়েছিল। অন্যান্য শহরে থাকার সময়ে পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা আমায় এক-একদিন নিমন্ত্রণ করতেন, তাদের সেখানে গিয়ে কোন রকমে খাওয়া-থাকা চালাতাম। তখনও কিন্তু আমি নিউ-ইয়র্কে স্থায়ীভাবে থাকার কোন স্থান করতে পারিনি, টাকা-পয়সাও কিছু আমার সংগে ছিল না'। 'All the belonging of the Vedanta Society, which I had packed in my trunk travelled with me wherever I went';—'কাজেই আমেরিকায় বেদান্ত-সমিতির যা-কিছু জিনিসপত্র ছিল—সবই ট্রাঙ্কে ভর্তি ক'রে যেখানে আমি যেতাম সেখানেই সংগে সংগে সেগুলিকে নিয়ে যেতে হ'ত'।

এ'সকল অসুবিধা ও কষ্ট হয়েছিল বেশীর ভাগ সময়ে স্বামী অভোদানন্দ মহারাজের ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে। একদিন অভেদানন্দ মহারাজ স্বীকারও করেছিলেন : 'একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়া ও স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) অফুরন্ত ভালবাসাই আমার সকল কষ্টকে তখন ভুলিয়ে দিত'।

আমেরিকায়থাকাকালেস্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সকলজিনিসই নিজের প্রচারকার্যের সুবিধার জন্য শিখেছিলেন। তিনি চিরদিনই ছিলেন অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু ও সাবলম্বী। নিজের পায়ের উপর দাঁড়ানোকে তিনি গৌবব ব'লে মনে করতেন। এতটুকু শক্তি-সামর্থ্য থাকতে কখনো পরমুখাপেক্ষী হতেন না। নিজের হাতেই সকল কাজ তিনি করতে চাইতেন ও তার জলন্ত নিদর্শন পেয়েছি আমরা তাঁর জীবনে প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে। আমেরিকায় থাকাকালে তিনি নিজের মাথা-গোঁজার মতো একটা স্থায়ী আশ্রয় ক্রমশঃ তৈরী করতে পেরেছিলেন। কালে সে আশ্রম বিরাট হয়েছিল। জমি-জমা, বাগান, শাক-সবজীর তত্ত্বাবধান তিনি নিজেই করতেন।

মোটকথা স্বামীজী মহারাজের জীবনে ছিল বিচিত্ররকম অভিজ্ঞতার সমাবেশ। সকল রকম সামাজিক পরিবেশ, চিন্তা ও কর্মপ্রবাহের সংগে তিনি নির্বিচারে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন। Adaptabilty (খাপ খাইয়ে নেওয়া) ছিল তাঁর জীবনের একটি বড় গুণ। পাশ্চাত্যে যখন ধর্মপ্রচারক-রূপে ছিলেন, তখন সামাজিক আচার-ব্যবহার, মেলামেশা, আদান-প্রদান সব-কিছুই করতেন তিনি একেবারে ওদেশের মতো। সেখানকার লোকেরাও মনে করতেন তাঁকে তাঁদের নিজেদের সমাজের বা পরিবারের মধ্যে একজন—একান্ত আপনার জন। এই নিজের ক'রে নেওয়া স্বভাবের জন্য পাশ্চাত্যে তাঁর প্রচার ও কর্মপ্রচেষ্টা কৃতকার্যতায় পরিপূর্ণ হয়েছিল। 'হিন্দুইজ্‌ম ইনভেড্‌স আমেরিকা'-গ্রন্থের (*Hindusim Invades America*) লেখক ওয়েলডন টমাস একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকারও করেছেন। টমাস লিখেছেন: 'In Abhedananda * * we notice considerable adaptation * * who was willing to adjust himself to American institutions in both message and method'. —অর্থাৎ 'স্বামী অভেদানন্দের মধ্যে আপন ক'রে নেওয়ার শক্তি বিশেষভাবে আমাদের নজরে পড়েছে। মার্কিন-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাদের কথায় ও জীবনধারাতে নিজেকে মিলিয়ে নিতে তিনি সর্বদাই ইচ্ছুক ছিলেন'।

আমেরিকার সকল রকম প্রতিষ্ঠান ও সমাজ তাঁকে নির্বিচারে আপন ব'লে গ্রহণ করতে ও ভালবাসতে পেরেছিল। শ্রদ্ধাপরিপূর্ণ হৃদয়ে পাশ্চাত্যে কর্মপ্রচেষ্টার কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় ওয়েলডন টমাস পুনরায় উল্লেখ করেছেন: 'Paying more attention to history and his field of operation, Swami Abhedananda did more than his leader to adjust Vedanta to Western culture. Rather than over-

power by flashing oratory, he seeks to convince by sweet reasonableness and a vast array of new and picturesque facts.'—'ঐতিহাসিক ঘটনা ও কর্মক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি যে, স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বিশ্ববরেণ্য নেতা বিবেকানন্দের চেয়ে প্রাচ্যের বেদান্তকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সঙ্গে বরং অধিকতরভাবেই খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন। জ্বলন্ত ও অনর্গল ভাষানিঃসারী বাগ্মীতা দিয়ে অভিভূত না ক'রে সত্যকার যুক্তি-বিচারে ও নূতন নূতন ঘটনাবৈচিত্র্যের সমাবেশে পাশ্চাত্যবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করার দিকে স্বামী অভেদানন্দ অধিক নজর দিয়েছিলেন'। স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা-সম্বন্ধে টমাসের নিজের ধারণা শ্রদ্ধা ও নির্বাচনী বুদ্ধি প্রবল থাকলেও তাঁর 'Swami Abhedananda did more than his leader' এই স্বীকৃতির ভিতর স্বামী অভেদানন্দের প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব ও পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারে সাফল্য-সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মনোভাবই সুপরিস্ফুট।

আমেরিকার বিদ্বদ্‌সমাজ ও জনসাধারণের ভিতর স্বামী অভেদানন্দ এমনই নিবিড়ভাবে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন যে, শুধু পাশ্চাত্যে ধর্মগুরু ও প্রচারকরূপেই তিনি পরিচিত ছিলেন না,—ছিলেন একাধারে সকলের ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, পিতা, মাতা ও সকল রকম সম্বন্ধে আবদ্ধ। বিপদে-সম্পদে তিনি আমেরিকায় ছিলেন সবার উপদেষ্টা ও সান্ত্বনাদাতা। ছোট ছেলেমেয়েদেরও তিনি ছিলেন অভিভাবক ও শিক্ষক। সকল সমাজে ও সম্প্রদায়ে ছিল তাঁর অবাধ গতি ও প্রভাব। এক কথায় স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন সকলেরই একান্ত আপনার জন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমেরিকার নাগরিক অধিকারের (citizenship) আমন্ত্রণও পেয়েছিলেন তিনি অনেকবার, কিন্তু প্রত্যাখান করেছিলেন প্রাচ্যের পবিত্রতম আদর্শকে স্মরণ ও আমরণ ভারতবাসী ব'লে নিজেকে গৌরবের পরিচয় দান ক'রে।

আমেরিকার নাগরিক অধিকার প্রত্যাখানের পিছনে তাঁর অলৌকিক আচার্যের অশরীরী আদেশ এবং ইংগিত ছিল আমরা শুনেছি।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এ'প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন: 'একবারমাত্রই নয়, তিন-চারবারের ঘটনা যা ঘটেছিল আমেরিকার সিটিজেনশিপ নিয়ে, সত্যই তা' অপূর্ব ও আশ্চর্য রকমের!' প্রথম-বারের ঘটনাসম্পর্কে তিনি বলেছিলেন: 'সিটিজেনশিপের ফর্ম দেওয়া হ'ল আমাকে সই করার জন্য। কলমও তুলে নিলাম সই করবো ব'লে। কিন্তু কে যেন তখন ব'লে উঠল পেছন থেকে: 'কালী, তুই কি শুধু আমেরিকার? তুই যে সমগ্র বিশ্বের'। আমি সচকিত হলাম, কণ্টকিত হ'য়ে উঠল আমার সর্বশরীর। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু কাকেও দেখতে পেলাম না, কাজেই সে'দিন আর সই করা হ'ল না, বিস্ময়ে ও পুলকে মন স্তব্ধ হ'য়ে গেল। ঠিক এ'রকমটি হয়েছিল আরো দু'বার। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তারপর—মনে আর কখনো চিন্তাও আনবো না আমেরিকার সিটিজেন হবার জন্য।[১] মনে হয় শ্রীশ্রীঠাকুরই (শ্রীরামকৃষ্ণদেবই) আমায় ইঙ্গিত করেছিলেন এ'ভাবে যে, আমেরিকার আবেষ্টনী কখনো বিশ্বপ্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানের পক্ষে নির্দিষ্ট স্থান হ'তে পারে না, সমগ্র বিশ্বই যে তার কর্মক্ষেত্র'।

স্বামী অভেদানন্দ সারা পঁচিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে ভারতের আদর্শ, ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির রূপ ও আদর্শ পাশ্চাত্য জগতের সামনে প্রচার ক'রে কৃতকার্যতার জয়মাল্য বরণ করেছিলেন—তার কারণ হ'ল পাশ্চাত্যসমাজের প্রতিটি পরিবেশ এবং মানব-মন ও প্রকৃতির সংগে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্য সমাজে তিনি ছিলেন যেন পাশ্চাত্যবাসী, কিন্তু তাঁর হৃদয়বেদীতে চিরদিনই প্রজ্জ্বলিত ছিল

১। এই আমেরিকার সিটিজেনশিপ নিয়ে বেলুড় মঠে (ভারতে) একটি বিভ্রান্তিকর-ধারণারও সৃষ্টি হয়েছিল—যেটি নিছক ভুলধারণা মাত্রই ছিল।

প্রাচ্যের মহিমোজ্জ্বল আদর্শের ও প্রেরণার প্রদীপ্ত দীপশিখা। সন্দেহলিপ্ত আমাদের মন তাই তাঁর উদার প্রকৃতি ও আচরণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেও কখনো কখনো পশ্চাদপদ হ'ত না। তাঁর পাশ্চাত্য সমাজের আচার-বিচার ও রীতিনীতির সংগে সম্পূর্ণ খাপ-খাওয়ানোর ভাবকে সময়ে সময়ে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতেও আমরা পশ্চাদ্পদ হতাম না, প্রকাশ ক'রে ফেলতাম কখনো কখনো আমাদের সন্দেহ-আন্দোলিত মনোভাব তাঁর সাম্নেও। একদিনের কথা স্বামীজী মহারাজ তাঁর অফিসঘরটিতে বসে আছেন। আনমনা ও উদার তাঁর দৃষ্টি। কাছেও বিশেষ কেউ ছিল না। আমরা দু'তিনজন প্রণাম ক'রে বস্লাম তাঁর সামনে। তখন রাত্রি হবে সাড়ে আটটা—কি ন'টা। আমাদের দেখে তাঁর যেন একটু হুঁ'স্ ফিরে এলো। তিনি বললেন: 'ও, এই যে, কখন সব আসা হলো?' আমরা বললাম: 'এই মাত্র'।

'কেন হঠাৎ এই সময়ে?'

'আজ্ঞে, এলাম অমনি।'

'ও, কারণ তাহ'লে কিছু নেই? সম্ভবতঃ সময় আছে ব'লে এলে? আমেরিকায় থাকতে আমার কিন্তু বাবু সময়-টময় বড় একটা হ'ত না। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর বিশ্রাম করার সময় পেতাম মাত্র তিন—কি সাড়ে-তিন ঘণ্টা। তাও সব দিন নয় যদিও লোক-জন থাকতো সাহায্য করার জন্য, তাহলেও নিজের হাতেই কাজ করতে হ'ত আমায় বেশীর ভাগ সময়'।

আমাদের ভিতর থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলো হঠাৎ: 'মহারাজ, ওদেশের লোক আপনাকে গ্রহণ করেছিল কিভাবে?'

স্বামীজী মহারাজ হেসে বললেন: 'কেন—ওদেশেরই মতো। সাধারণ লোক ভারতবর্ষের লোকদের মনে করে কালা-আদমী ও অসভ্য ব'লে। ওদের বেশীর ভাগ লোকেরই ধারণা যে, ভারতবর্ষের লোকগুলো বুনো—একেবারে এবোরিজিনস্। শিক্ষা-দীক্ষা নেই,

সভ্যতাহীন ও হাফনেকেড্ (অর্ধনগ্ন) মানুষ। অবশ্য শিক্ষিত লোকদের কথা আলাদা। তাঁরা কিন্তু আমাকে দেখতেন ওদেরি একজন ব'লে'।

'কিন্তু আপনাকেই বা ওরা অতো আপনার ব'লে নিয়েছিল কেন? ইণ্ডিয়ানদের তো ওরা ঘৃণা করে—তা তিনি পণ্ডিতই হোন, আর মূর্খ'ই হোন, ধর্মপ্রচারকই হোন, আর ভ্রমণকারীই হোন'।

'হাঁ, কথাটা অবশ্য সত্য। তবে পূর্বেই বলেছি যে, ওদের (পাশ্চাত্য) সমাজে মিশেছিলাম আমি সম্পূর্ণ ওদেরি মতো। এক মুহূর্তের জন্য ওরা ভাবতে পারতো না যে আমি বিদেশী। কথাবার্তায়, জীবনযাপনে ও ভাবের আদানপ্রদানে ওরা ধরে নিয়েছিল আমি ওদেরি দেশের একজন। ওদের সমবেদনা এবং সহানুভূতিও পেয়েছিলাম তাই পরিপূর্ণভাবে'।

'কিন্তু তাহলেও ইষ্ট ইজ ইষ্ট, ওয়েষ্ট ইজ ওয়েষ্ট (প্রাচ্য প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যের ভাব নিয়ে থাকবে)—এটাই সাধারণ নীতি। পাশ্চাত্যে থাকলেও প্রাচ্যের ভাব ও আদর্শকে প্রাচ্যবাসীর বাঁচিয়ে রাখা উচিত। ওয়েষ্টারনাইজড্ (পাশ্চাত্যভাবাপন্ন) হওয়া মানেই ইষ্টার্ণ আইডিয়ালকে (প্রাচ্য-আদর্শকে) বিসর্জন দেওয়া। এ'ভাব কিন্তু আমরা সমর্থন করতে পারি না। প্রাচ্যদেশ থেকে যখন আপনারা গেছেন, তখন প্রাচ্য ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে রাখা আপনাদের কর্তব্য হবে। তাতে ওদেশের লোকেরাও আমাদের আদর্শ কিছু শিখতে পারবে। তা নইলে ওদেশে গিয়ে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হ'লে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য আর থাকে কেমন ক'রে'?

আমাদের অকাট্যযুক্তি শুনে বালকের মতো হেসে উঠে মহারাজ বললেন: 'তা ঠিক কথাই বলেছ। শৃঙ্খলতাপূর্ণ সচল জীবনের আদর্শ তো তোমরা অনেকদিন থেকেই ভুলে গেছ, কাজেই যুক্তি তোমাদের অকাট্যই হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে, ইষ্টার্ণাইজড্ (প্রাচ্যভাবাপন্ন) বা ইণ্ডিয়ানাইজড্ (ভারতীয়) আদর্শটার স্বরূপ

আসলে কি বল দেখিনি? কেবল খাওয়া-দাওয়ার রেসট্রিক্‌সন (বাঁধন-কসন) আর ধপ্‌ধপে পোষাক-পরিচ্ছদ পরে থাকলেই কি ইষ্টার্ণ-আইডিয়াল (প্রাচ্য-আদর্শ) বজায় রাখা হ'ল? ওগুলো তো দেশাচার ও লোকাচারমাত্র,—ধর্ম, জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও আন্তর শুচীতার সংগে ওসবের কোন সম্পর্ক নেই। ভারতের ত্যাগ, তপস্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও আদর্শ নিয়ে আমরা পাশ্চাত্য-দেশে গেছি ধর্মপ্রচার করতে। ভারতের যা-কিছু ভাল, পবিত্র ও কল্যাণতম সেগুলিকে পাশ্চাত্যবাসীর সামনে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই মিশতে হয়েছে নির্বিচারে ওদেশের সঙ্গে, ওদের ভিন্ন ভিন্ন সমাজে, ক্লাবে, লাইব্রেরীতে, স্কুলে, কলেজে, ইউনিভারসিটিতে, চার্চে, আমোদ-আহ্লাদের জায়গায়—সর্বত্র। ওদের মতনটি না হ'লে তো আর ওদের পূর্ণসহানুভূতি ও সহযোগিতা পাওয়া যায় না! ওরাই বা তোমাদের মতবাদ নেবে কেন বলো? জোর ক'রে কোন মতবাদ কারু ঘাড়ে চাপানো যায় না। তারপর তোমরা বোধহয় জান না যে, গেরুয়াপোষাক পরে সাধু-সন্ন্যাসীরা আমেরিকার মতো দেশে গেলে ওখানকার লোকে তাদের শ্লেভ (দাস) বা কয়েদী ব'লে মনে করে সাধারণত। পুলিশেও তাদের ধরে গারদে পুরে রাখে। মাথা নেড়া করা ওদেশে ভারী লজ্জাস্কর ব্যাপার। ওটা ওদেশে বরং শ্লেভারিরই (দাসত্বেরই) চিহ্নবিশেষ'।

স্বামীজী মহারাজের মুখ ক্রমশ রক্তিম হ'য়ে উঠলো। তেজো-ব্যঞ্জক ও সুদৃঢ় তাঁর কণ্ঠস্বর। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে ডানহাতের তর্জনী-অঙ্গুলি ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন: 'জানোতো—স্বামীজীকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) তাঁর গেরুয়াপোষাকের জন্য কম লাঞ্ছনা প্রথমে ভোগ করতে হয়নি? তিনি নিউ-ইয়র্কে গিয়ে হাজির হলেন, মাথায় গেরুয়া-পাগড়ী, গায়ে আলখাল্লা, পরণে গৈরিককাপড় ও গৈরিকচাদর, লোকে তাঁকে দেখে ভাবলো পৃথীবীর কোন একটা অদ্ভুত জীববিশেষ হবে। কেউ

টানে কাপড় ধরে, কেউ টানে আলখাল্লা ধরে, ছেলেমেয়েরা ঢিল ছুড়তে লাগলো রাস্তায় যাবার সময়ে। কি ভয়ানক বিপদের ভিতর তাঁকে পড়তে হয়েছিল বলো দেখি? তোমরা বাপু থাকো এদেশে, (ভারতে), বই পড়েই কেবল ইষ্টার্ণ-আইডিয়াল (প্রাচ্য-আদর্শ) রক্ষা করতে চাও। কাজেই তোমাদের কাছে হবে ওদেশের সমস্ত জিনিসই অন্যায় ও দোষদুষ্ট, সবটাই বেখাপ্পা ও বেয়াড়া। কিন্তু নিজেরা যদি কোনদিন ঘুরে দেখার সুযোগ-সুবিধে পাও—তবে দেখবে সব ভিন্ন রকমের। আমি কিন্তু ওদের আচার-বিচার ও ব্যবহারের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাইনি। ভাব নিয়েই হ'ল কথা। ধর—তুমি গেছ ওদেশে ধর্ম ও ধর্মের আদর্শ প্রচার করতে, ভারতের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য ওদেশের চোখের সামনে ধ'রে তাদের মনের ভুলধারণা ভাঙতে। তাতে তুমি যে-রকম পোষাকই পরো না কেন, যেরকম ভাষাতেই কথা বলো না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি নিজের আদর্শে ঠিক থাকলেই হ'ল, তখন দুনিয়ার কেউ আর তোমায় টলাতে পারবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের নিজের হাতেই গড়েছিলেন। তাঁর নাম নিয়েই তো আমরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে বিদেশে গেছি। ভাল-মন্দ সব-কিছুই যখন তাঁর পায়ে সঁপে দিয়েছি, তখন ভাল হ'লেও তিনি দেখবেন—আর মন্দ হ'লেও তিনি দেখবেন'।

আমরা সকলে চিত্রার্পিতের মতো স্থির হ'য়ে বসে তাঁর কথা শুনছি। শেষের কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের আবেগে তাঁর মুখ রক্তিম ও জ্যোতির্ময় হ'য়ে উঠলো। তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে আবার বলতে লাগলেন: 'এই দেখনা, তোমরা মুখে ইণ্ডিয়ান-আইডিয়াল—ইণ্ডিয়ান-আইডিয়াল (প্রাচ্য-আদর্শ, প্রাচ্য-আদর্শ) ব'লে চিৎকার করো, কিন্তু আসল কাজের বেলায় তার এ্যাপ্লিকেশন্ (যথার্থপ্রয়োগ) কোথাও দেখা যায় না। তাই মুখ ও মনের মধ্যে মিল রাখতে হয়। আসলে তোমরা কিন্তু ইণ্ডিয়ানাইজড্ বা

ইষ্টার্ণাইজড্ (ভারতীয় ও প্রাচ্য-ভাবাপন্ন) অথবা ওয়েষ্টার্ণাইজড্ (পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন) কোনটাই নও, বরং একটা তালপাকানো জগাখিচুড়িবিশেষ। ভারতীয় আদর্শ অটুট রাখতে হ'লে বৈদিক যুগের আদর্শকেও আমাদের ভুলে গেলে চল্‌বে না। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ক্রমবিবর্তনের ধারাকেও অনুসরণ করতে হবে। বৈদিককে না ভোলা বলতে আমি বৈদিকযুগের সমস্ত-কিছুকেই নির্দোষ ও অন্ধভাবে অনুকরণ করতে বলছি না। বৈদিকসমাজের রীতিনীতিকে এখন সমাজে হুবহু চালাতে গেলে ভুল করা হবে, তাতে সমাজ সচল না থেকে বরং অচল হ'য়েই উঠবে। কিন্তু বৈদিকযুগের পবিত্র আদর্শ, সত্যনিষ্ঠা, অধ্যাত্মভাব, প্রেম, ভালবাসা—এ'সবকে ভুলে গেলে চল্‌বে না। ভারতের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যই হ'ল মৈত্রী, করুণা, প্রেম, ভালবাসা, উদারতা, পরোপকার, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, তপস্যা, প্রভৃতি। সবার চেয়ে একাত্মানুভূতি ও সমদর্শনই ভারতের নিজস্ব সম্পদ। এই সদ্‌গুণগুলিকে জীবনে ফুটিয়ে তোলার নাম ইণ্ডিয়ান-আইডিয়াল (ভারতীয়-আদর্শকে) অটুট রাখা। সকল জাতির আচার-ব্যবহারকে হুবহু অনুকরণ ক'রে তোমরা এখন তোতাপাখীর দলে নাম লেখাতে যাচ্ছ, তাতে ক'রে নিজের আদর্শেও জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছো। এটা কি তোমাদের পক্ষে একান্ত গৌরবের জিনিস?'

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'আচ্ছা মহারাজ, ওদেশের লোকদের ভেতর আমাদের ভারতীয় ভাবধারা নেবার আগ্রহ কি রকম দেখেছেন?'

আমাদের ভাবগতিক লক্ষ্য ক'রে একটু হেসে তিনি বল্‌লেন: 'খুব আগ্রহ, তোমাদেরও বরং ছাড়িয়ে যায়। তবে ওদেশে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের আগ্রহ ও ধর্মের দিকে টেনডেন্সিই (প্রবৃত্তি) বেশী। ভারতীয় আচার-বিচার পালন করা, পূজো-অর্চনা করা ও সাধন-ভজন যোগ ইত্যাদি শিক্ষা করার দিকে তাদের অত্যন্ত আগ্রহ। তবে একথা বলছি না যে, আমেরিকার দেশশুদ্ধ লোকই আমাদের

সকল বিষয় জানতে বা শুনতে আগ্রহশীল। আমাদের দেশের সব লোকই কি আর বিদ্যা, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা লাভ করবার জন্যে পাগল? ভাল-মন্দ লোক সকল দেশেই আছে। তবে ওদেশে ভারতীয় আদর্শের প্রচার হওয়া আরো দরকার। আমরা তো মাত্র গোড়াপত্তন ক'রে গেলাম, এরপর আরো কত-কিছু হবে'।

'ওদেশের আগ্রহশীল অনেকে আমার কাছে নিয়মিতভাবে আস্‌তো। জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম, আসন প্রভৃতির উপদেশ যেমন যেমন দিতাম, ঠিক তেমনিভাবে ওরা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সংগে গ্রহণ করতো। আসন ক'রে বসে যোগ অভ্যাস করতো। ওদের তিতিক্ষা, নিষ্ঠা, ভক্তি ও উদ্যম আমাদের চেয়ে বরং বেশী বই কম নয়'।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বল্‌লেন: 'একথা তো ঠিক যে, মানুষের সঙ্গে সমানভাবে না মিশলে তাদের ভালবাসা ও সহানুভূতি লাভ করা যায় না। সর্বদা দূরে দূরে থাকলে মানুষকে নিজের করা যায় না। অন্তর জয় করতে হ'লে অন্তরের বিনিময় থাকা উচিত। ভালবাসা পেতে গেলে ভালবাসতে হয়। পরস্পর-বিনিময় দরকার। কেবল আমি ভোগ করবো, অন্য কাকেও কিছু দেব না, এতে হয় না। প্রাণখুলে সকল বিষয়ে ওদের (পাশ্চাত্য-বাসীর) সংগে মিশেছিলাম বলেই তো ওদের সমস্ত খুঁটিনাটি জানার আমার সুযোগ-সুবিধা হয়েছিল। ওদের কাছে কোনদিন আমার কিছুই গোপন ছিল না। ওদের কাছ থেকে নিজের শেখাও হয়েছে অনেক। তা' না হ'লে দীর্ঘ পঁচিশটা বছর ওদের সংগে কাটালাম কেমন ক'রে বলো? জানবে—সবার মূলে আছে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ ও অফুরন্ত করুণা। শ্রীশ্রীঠাকুর ছাড়া আমাদের পৃথকসত্তার কোন অর্থ নেই!'

* * *

স্বামী অভেদানন্দের কথা ও কাজ বা মন ও মুখ ছিল সমান্তরাল সরলরেখার মতো। আমরা পূর্বে অনেকবারই বলেছি যে, বিদেশে

গিয়ে বিদেশের সমাজ, রীতিনীতি ও সকলের হৃদয়ের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিলেও ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে তিনি অন্তরে সর্বদা বিকশিত ও জাগরুক রেখেছিলেন। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর বিদেশে ধর্মপ্রচার ক'রে ফিরে এলেন তিনি ইংরাজী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি বা প্রায় শেষের দিকে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেও ভারতে এসেছিলেন একবার প্রচারের উদ্দেশ্যে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নব্যভারতের পুণ্যতীর্থ বেলুড় মঠে পদার্পণ ক'রেই তিনি নাপিতকে ডেকে পাঠালেন মাথার নীলাভকৃষ্ণবর্ণের চুল ফেলে দেওয়ার জন্য। মাথার চুল ছিল তাঁর সুন্দর ও কোঁকড়ানো। সমগ্র মাথা কামিয়ে ফেলে তিনি নূতন কাপড়-জামা পরলেন সব খদ্দরের। তখন ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের অগ্নিযুগ। স্বামীজী মহারাজেরও স্বদেশী জিনিসের ওপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। দার্জিলিঙে স্টেপ্-এ্যাসাইডে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা ক'রে নিজের মত-বিনিময়ও করেছিলেন। পাশ্চাত্যবেশভূষা ত্যাগ ক'রে তিনি মুহূর্তের মধ্যে আবার ভারতীয় ভাবের ও পরিবেশের ভিতর নিজেকে খাপখাইয়ে নিতে পেরেছিলেন।

॥ স্মৃতি ঃ চার ॥

স্বামী অভেদানন্দ কি ধরনের সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন—তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। একটি অভিমত থেকে অন্য অভিমতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া যে কত সহজ কাজ ছিল তা ব'লে বোঝানো যায় না। তুচ্ছ ছোটখাটো কত ঘটনা যে ঘটে গেছে তাঁর জীবনে, সেই সকলের কথা না হয় নাই উল্লেখ করলাম এখানে।

তবে একবারের ঘটনা! আমরা চার-পাঁচ জন শ্রীশ্রীতুর্গাপূজার পূর্বে দার্জিলিং-আশ্রমে যাচ্ছি। সেটি হ'ল ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর (১৬ই আশ্বিন ১৩৪৪)। তখন লেবঙে ঘোড়দৌড়ের মাঠে তখনকার বাঙলার গভর্ণর স্যর জন এ্যাণ্ডারসনের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য পাশপোর্ট (ছাড়পত্র) পাওয়া ছিল ভারি মুস্কিল ও হাঙ্গামার কথা। শিলিগুড়িতে নেমে দার্জিলিঙ-হিমালয়ান-রেলে বা মোটরে চড়ার পূর্বে যাত্রীদের রীতিমত সার্চ করা হ'ত। তাই পাশপোর্টের ব্যবস্থা ছিল। স্বামীজী মহারাজ আমাদের পাঁচজনের নামে টাইপ-করা একখানি সার্টিফিকেটপত্র সঙ্গে দিলেন। শিলিগুড়ি-ষ্টেশনে নেমে পুলিশকে সেটা দেখাতেই আমাদের সাতখুন মাপ হ'য়ে গেল। আমরা দার্জিলিঙ-হিমালয়ান-রেলের কামরায় গিয়ে বসলাম এবং নানান দৃশ্য দেখতে দেখতে বেলা প্রায় তিনটার সময়ে দার্জিলিঙয়ে গিয়ে পৌছালাম। দার্জিলিঙে সে'দিন বৃষ্টি ছিল না, আকাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকায় মনে ভারি আনন্দ হ'ল। দার্জিলিঙে গিয়ে থাকবো দিনকতক এটাই ছিল পূর্ব থেকে ঠিক করা। কিন্তু দু'চারদিন থাকার পর হঠাৎ একখানা টেলিগ্রাম এলো—'You five must come by the first train', —'তোমরা পাঁচজনে অতি-অবশ্য প্রথম গাড়ীতেই কলকাতায়

ফিরে আসবে'। পড়ে তো হতভম্ব হ'য়ে গেলাম আমরা, ভাবলাম সকল ফন্দিই আমদের নিস্ফল হ'ল।

ফন্দিটা আমাদের যে কি ছিল সেটা এখন খুলে বলা দরকার। স্বামীজী মহারাজের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কোথাও যাওয়া তখন সহজে কারু ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটতো। কাকেও বাইরে (দেশান্তরে) যেতে দিতে তিনি চিরদিনই রাজী ছিলেন না। বলতেন : 'কি হবে গো ? এখানেই (মঠেই) ভাল। মঠ, মিশন, আশ্রম—এ'সব হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) well-protected fortress (সুরক্ষিত দুর্গবিশেষ)'। কিন্তু বাইরে যাওয়ার দল আমরা সে'সব কথায় বিশেষ কান দিতাম না, অথচ স্বামীজী মহারাজের কাছে গিয়ে বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেওয়ার সাহসও আমাদের কারু মধ্যে ঘটে উঠতো না যদি বা কেউ গিয়ে বলতো দিনকতকের জন্য কাশী, হরিদ্বার বা উত্তরকাশী যাব, তবে মহারাজ তখনই বলতেন : 'কিসে ক'রে যাবে ? গাড়ীতে চেপে দেশভ্রমণ তো ? পায়ে হেঁটে যাওদিকিনি কাশী—কি হরিদ্বার, দেখি কি রকম বৈরাগ্য ? এই তো আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ যাওয়ার পর পায়েহেঁটে সারা ভারতবর্ষটা ঘুরে বেড়িয়েছি, আর তোমাদের কিনা গাড়ী না হ'লে চলে না'। এ'পর্যন্ত বলেই তিনি চুপ ক'রে থাকতেন, বা অন্য কথা বলতেন। এ'সবের পরও যদি কেউ একবার অনুরোধ জানাতো অনুমতি পাবার জন্য, তখন স্বভাবতই একটু গম্ভীরভাবে তিনি বলতেন : 'তপস্যা মানে ছত্রের রুটি-খাওয়া নয়। সে' এখানেও পাবে। বেশ তো, এখানেই দিনকতক কাজ-টাজ থেকে ছুটি নিয়ে দিনরাত্তির ধ্যান-জপ করো না কেন ? খাবার-যোগানোর ভার রইলো আমার'।তারপর ধীরে ধীরে বলতেন : ঈশ্বর তো সর্বত্র আছেন। ঈশোপনিষদে আছে—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্,'—ঈশ্বররূপ মহাচৈতন্যের

দ্বারা বিশ্বচরাচর পরিব্যাপ্ত। তাই প্রথমে মনটাকে স্থির করো, তা হলেই সব-কিছু বুঝবে। এখানে বসেই সব হবে। বাইরে গেলে থাকা-খাওয়ার ভাবনা-চিন্তা করতে হয়। বাইরে কতরকম অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি। এখানে সেই সবের বালাই নেই। নিরিবিলি (নির্জনতা) তো আর বনে-জঙ্গলে নেই, মনটাকে স্থির করলেই নির্জনতা। মন স্থির হ'ল তো সব ঠিক হ'ল। এজন্য ধ্যানে মনকে স্থির করতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে মন-প্রাণ বিকিয়ে দিয়ে দিন কতক কাজ করোদিখিনি। নিষ্কামভাবে কাজ করতে হবে। 'আমি করছি', 'আমি না হ'লে মঠ ও আশ্রমের কাজ চলবে না'—এ'সব চিন্ত মোটেই মনে স্থান দেবে না। এ'সব ভাব অহংকারের ও 'আমি'-অভিমানের নামান্তর। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে সর্বদা স্মরণ করবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। তিনি তোমাদের বাড়ীর পাশে এসে এবার জন্মেছেন কিনা—তাই তাঁর কদর ঠিকঠিক বুঝলে না। কাশী যাবো, হরিদ্বার যাবো, উত্তরকাশী যাবো—এই সব'।

এ'সকল কথা বলতে বলতে স্বামীজী মহারাজের মুখ ক্রমশই প্রদীপ্ত ও রক্তিম হ'য়ে উঠতো। তখন দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলতেন: 'নিষ্কাম-কর্মই আসল। গীতায় আছে: 'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচার। অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ'। মনে সর্বদা ভক্তি, বিশ্বাস ও বিচার আনবে। সব-কিছু এখানে (মঠে, আশ্রমে) বসেই হবে। ভগবানের রাজত্ব পৃথিবীটা জুড়ে। তিনি এক জায়গায় না থাকেন তো অন্য জায়গায়ও থাকবেন না। তাই বনেই যাও, আর হিমালয়েই যাও, এই মন নিয়েই তো যাবে? মন তো আর দু'টো নয়। অস্থির চঞ্চল মন নিয়ে দুনিয়া ঘুরে বেড়ালে

প্রাণে শান্তি পাবে না।[১] যার মন শান্ত হয়েছে, সে সব-কিছুরই পারে গেছে। গীতার সেই 'আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠম্'[২] ও 'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ'[৩] শ্লোকদুটি স্মরণ

১। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর ইংরেজী 'ওয়ে টু দি ব্লেসেড লাইফ'-গ্রন্থে (পৃঃ ১২) ঠিক এ'ধরনের কথাই বলেছেন। যেমনঃ 'Where shall we find that true life? Shall we have to go into a cave, or a desert to find it! No. It is dwelling within the cave of each individual heart and we must search within.'—অর্থাৎ যথার্থ-আদর্শবান জীবন বা আত্মস্বরূপের সন্ধান আমরা কোথা গেলে পাবো? গিরিগহ্বর, অরণ্য বা মরুভূমির মধ্যে কি তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে? কখনই না। আত্মা—'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্' 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'। প্রতিটি প্রাণীর হৃদয়গুহার মধ্যেই জ্যোতির্ময় আত্মা আছেন, সেজন্য বাইরে কোথাও তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে না, তাই নিজের অন্তরের মধ্যেই আত্মার কল্যাণতম রূপ দর্শন করতে হয়।

২। 'আপূর্যমাণমচল প্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥'

—গীতা ২।৭০

যেমন নদ-নদী তরঙ্গবিহীন প্রশান্ত সাগরে প্রবেশ করে, তেমনি সমস্ত কামনার অবসান যাঁদের হয়েছে, যাঁরা পরমনির্বিকার, তাঁরাই যথার্থ-শান্তির অধিকারী। কামনাসক্ত চঞ্চল মনের লোকেরা শান্তির সন্ধান কোনদিনই পায় না।

৩। 'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥'

—গীতা ২।৭১

যার বাসনা শান্ত হয়েছে, একমাত্র সে' ভাগ্যবানই যথাযথভাবে মমতা, অহংভাব ও স্পৃহাশূন্য হ'য়ে সংসারে বিচরণ করতে পারেন। তিনিই পরমশান্তি লাভ করেন—'পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।'

মধুসূদন সরস্বতী বলেছেনঃ 'ঈশ্বরার্থং' কর্ম কুর্বন্ সত্ত্বশুদ্ধি-জ্ঞান-প্রাপ্তি দ্বারেণ পরং মোক্ষমাপ্নোতি পুরুষঃ'। ঈশ্বরের জন্য ও পরহিতার্থে কর্ম করলে চিত্তশুদ্ধ হয়।

করবে, তাদের অর্থ ধ্যান করবে, তাহলেই ঠিকভাবে ধারণা হবে, আর ধারণা দৃঢ় হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হবে'। তাই ধ্যানের পূর্বে ধারণা অভ্যাস করতে হয়। ধারণা বলতে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত মনোবৃত্তিকে একটি কেন্দ্রে বারবার ধরে রাখার অভ্যাস।

স্বামীজী মহারাজের এই সকল কথার পরে আমাদের কারুর আর কোন কথা বলার তখন সাহস থাকতো না। তাই কোন রকমের ছাড়পত্র পেয়ে মুক্তবিহঙ্গের মতো দার্জিলিঙ-আশ্রমে গিয়ে হাজির হয়েছি, তাই সহজে না-ফেরার ফন্দিই ছিল আমাদের সকলের ভিতর। তাছাড়া আরও এককথা যে, প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময়ে কলকাতার মঠে ঘটেপটে মহামায়ার পূজা হ'ত। পূজা হ'ত শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবীর প্রতিকৃতিতে। সুতরাং পূজার পূর্বে যখন আমরা দার্জিলিঙ রওয়ানা হচ্ছি তখন পূজার কিছু পূর্বে আমাদের মঠে ফেরা উচিত। কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম একটু ভিন্নভাবে যে, মহারাজ নিজে যখন কলকাতার মঠে আছেন তখন তাড়াতাড়ী না ফিরলেও ঘটেপটে দুর্গাপূজা তিনি চালিয়ে নেবেন কাকেও দিয়ে, সুতরাং কলকাতায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পূর্বে না ফিরলেও বিশেষ-কিছু ক্ষতি হবে না।

কিন্তু সুচতুরম্মন্য আমাদের চেয়ে মহারাজের বুদ্ধি যে অনেক প্রখর, ক্ষুরধার ও সুদূরপ্রসারী ছিল তা' আমরা তখন খতিয়ে বুঝিনি। ভেবেছিলাম আমাদের মতলবই জয়টীকা পাবে। কিন্তু স্বামীজী মহারাজের টেলিগ্রামের তাড়া খেয়ে আমাদের সকল ফন্দীই ফাঁস হ'য়ে গেল, দার্জিলিঙে দিনকতক থাকার প্রশ্ন আর থাকলো না। তাড়াতাড়ি বাসের (Bus) টিকিট কাটতে দেওয়া হ'ল ও পোটলা-পুঁটলি বেঁধে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে ঠিক দুপুরবেলাই দার্জিলিঙ-আশ্রম থেকে ক'লকাতার দিকে রওয়ানা হওয়া গেল -- ৯ই অক্টোবর (১৯৩৭, ২৩শে আশ্বিন ১৩৪৪) শনিবার।

সন্ধ্যার কিছু পরে দার্জিলিঙ থেকে এসে পৌঁছিলাম শিলিগুড়ি-ষ্টেশনে। দার্জিলিঙ-মেল[৪] তখন প্ল্যাটফরমে প্রায় তৈরী হয়ে আছে। কলকাতার টিকিট কেটে গাড়ীতে উঠে বসলাম। সারারাত্রি কাটলো কতক বসে, কতক গোলমালের ভিতর দিয়ে বিপর্যস্তভাবে। সে'দিন গাড়ীর বিলম্ব হয়েছিল ছাড়তে। তাই শিয়ালদহ-ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিল অনেক বিলম্বে, অর্থাৎ বেলা প্রায় ন'টায় (১০-ই অক্টোবর, রবিবার)। একটা ঘোড়ার গাড়ী ক'রে পৌঁছানো গেল মঠে। এসে শুনলাম আমাদের পৌঁছানোর বিলম্ব দেখে স্বামীজী মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে ইতিমধ্যেই পাঠিযে দিয়েছেন শিয়ালদহ-ষ্টেশনে। চিন্তিতও হয়েছিলেন খুব বেশী রকমভাবে। শুধু তাই নয়, আরো একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছিলেন দার্জিলিঙ-আশ্রমে—তাড়াতাড়ি যাতে রওয়ানা হই আমরা কলকাতার দিকে।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে (রাজা রাজাকৃষ্ণ স্ট্রীটে) পৌঁছে অফিস-ঘরে গিয়ে স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করলাম সকলে। তখন অন্যমনস্কভাবে তিনি তামাক খাচ্ছিলেন চেয়ারে বসে। দেখলাম বেশ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। আমাদের দেখে আশ্বস্ত হ'য়ে তিনি বল্লেন : 'এই দ্যাখোদিখিনি—মহাচিন্তায় পড়েছিলাম। সকাল আটটায় কোথা পৌঁছানোর কথা, আর বাজ্‌তে চল্লো এখন প্রায় এগারোটা। আটটা, ন'টা, দশটা পরপর বেজে গেল—ভেবেই অস্থির। যাইহোক তোমরা যে নিরাপদে পৌঁছেছো, ভালো হয়েছে। সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা'!

আমরা পাঁচজনে প্রণাম ক'রে নীচে নামবার উপক্রম করছি, এমন সময়ে স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'দ্যাখো, একটা কথা শুনে

৪। দার্জিলিঙ-মেলের নাম ছিল তখন নর্থবেঙ্গল-এক্সপ্রেস। গাড়ী সে' সময়ে পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে পার্বতীপুর ও জলপাইগুড়ি হ'য়ে শিলিগুড়ি পৌঁছুতো।

যাও। আমি একরকম ঠিক করেই ফেলেছি যে, এ'বছর প্রতিমা এনে মঠে শ্রীশ্রীদুর্গার পূজা হবে'। ২৫শে আশ্বিন (১৩৪৪ সাল, ১১ই অক্টোবর ১৯৩৭) সোমবার শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। আমরা এসে পৌঁছেছি কলকাতায় রবিবার (২৪শে আশ্বিন), সুতরাং পূজার বাকী ছিল মাত্র একদিন। স্বামীজী মহারাজের কথা শুনে আমরা তো অবাক। বল্লাম—'সে কি মহারাজ, টাকা কোথায়?' মহারাজ বল্লেন: 'টাকা-পয়সার ভাবনা নেই, তোমরা লেগে পড়োদিখিনি'। সে'কথা শুনে আমরা আরো আশ্চর্যান্বিত হলাম ও বুঝতে পারলাম 'You five must come by the first train' টেলিগ্রামের নিগূঢ়-তাৎপর্যটা কি!'

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম তখন: 'মহারাজ, কতো টাকা আপনি পেয়েছেন?' স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'আরে হবে—হবে। পঞ্চাশ টাকা ক—বাবু দেবেন বলেছেন। ওতেই সামান্য ক'রে পূজো হবে'। পঞ্চাশ টাকার কথা শুনে আমরা আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। আমাদের হাসি দেখে মহারাজ গেলেন বেশ একটু চটে। তিনি গম্ভীরভাবে বল্লেন: 'ঐ তো সব তোমাদের ছেলেমানুষী। যাও, এ'সব নিয়ে এখন আর মাথাঘামাতে হবে না। মা-র কাজ মা-ই ক'রে নেবেন, তোমরা উপলক্ষ্যমাত্র। হাত-মুখ ধোও গে। প্রতিমা এনে দুর্গাপূজা এবার মঠে করতেই হবে, কারুর কথাই আমি শুনবো না'। মহারাজের অন্তরে সরল অথচ দৃঢ়বিশ্বাস দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম।

ব্যাপার বুঝলাম বেশ গুরুতর। বুঝলাম সরলবিশ্বাসী স্বামীজী মহারাজকে নিশ্চয়ই কেউ বুঝিয়েছে যে, সামান্যভাবে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পঞ্চাশ টাকাতেই সম্ভব হবে। দেখলাম ঐ বিশ্বাসে তিনি একেবারে অচল-অটল। শুনলাম যে, আমাদেরই মধ্যে থেকে একজন বিশেষজ্ঞ নাকি ঐ মন্তব্য তাঁকে দিয়েছেন। সুতরাং দুর্গাপূজা

না হবার কারণ বা ওজর-আপত্তি কিছুই আর থাকতে পারে না। —দেখলাম এত শীঘ্র ব্যাপারটাকে নড়চড় করাও সহজ কাজ হবে না। কাজেই কোন রকম বোঝানোর ব্যাপার থেকে তখনকার মতো নিবৃত্ত হওয়া গেল।

আসল ব্যাপারটা এখানে গোপন করায় কোন লাভ নাই। স্বামীজী মহারাজের কাছে থেকে তাঁর নিছক সারল্যের সুযোগ গ্রহণ করার ফন্দি-ফিকির আমরা কিছু-কিছু শিখে ফেলেছিলাম। একান্ত সরলবিশ্বাসী স্বামীজী মহারাজকে পঞ্চাশ টাকায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সহজসাধ্য—একথা অবশ্যই কেউ বুঝিয়েছে তা টেরও পেযেছিলাম পরে। কাজেই তখন দরকার তাঁকে বুঝানো আবার যে, পঞ্চাশ টাকায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা কোনদিনই সম্ভব নয়।

হ'লও তাই। কিছুক্ষণ পরে আমাদেরই মধ্যে একজন প্রণাম করার অছিলা নিয়ে হাজির হ'ল স্বামীজী মহারাজের কাছে। স্বামীজী মহারাজ তাঁকে দেখেই জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কিগো, ফর্দ তৈরী করেছো?' সে বল্লে: 'আজ্ঞে ফর্দ তৈরী তো করেছি, কিন্তু কথা হ'ল—যে টাকা আপনি পেয়েছেন তাতে প্রতিমার দামই তো হবে না,—তা পূজো'!

স্বামীজী মহারাজ বালকের মতো অবাক হ'য়ে বল্লেন: 'সে কি, প্রতিমাই হবে না?' আমাদের বন্ধু উত্তর দিলেন: 'আজ্ঞে না, এক প্রতিমার দামই খুব কম ক'রে পড়বে দেড়শো-দু'শো টাকা'। স্বামীজী মহারাজ বিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন: 'বলো কি?' তারপর কিছুটা চিন্তান্বিত হ'য়ে বল্লেন: 'তা হো-লে যেমন হয় তেমনি ঘটেপটে এবারেও শ্রীশ্রীমা-র পূজা হবে, তাতে আর কি'। তবে এবারে তাহলে বিধিমতো ঘট প্রতিষ্ঠা ক'রেই পূজা হোক, প্রতিমার কোন দরকার নেই। ষোড়শোপচারে পূজা, আরাত্রিক, ভোগ—এই সব হবে। বরাবর সাধারণভাবেই ঘটেপটে শ্রীশ্রীমার

প্রতিকৃতির সামনে পূজা হ'ত। কিন্তু এবারে তার চেয়েও ঘটা ক'রে পূজা হবে'। বন্ধু দেখলো—হলো আরও মুস্কিল। এক বিপদ এড়াতে গিয়ে আর এক নূতন বিপদ এসে হাজির হ'ল। বন্ধুকে চিন্তা করতে দেখে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন: 'কি বলো?' বন্ধু বল্লে: 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। কিন্তু তাই বা ক্যামন ক'রে হবে?' স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'কেন'? বন্ধু বল্লে: 'আজ্ঞে ঘটেপটে হলেও পূজো তো নিখুঁতভাবেই করতে হবে? তাও আবার মঠের পূজো, সকলেই আসবে—নিমন্ত্রণ করুন আর নাই করুন। সামান্য ভাবে হলেও প্রসাদ সকলকেই দিতে হবে। টাকা কম আমরা না হয় বুঝ্‌লাম, কিন্তু লোকে তা বুঝবে কেন বলুন? তারপর ঘটেপটে ষোড়শোপচারে পূজা করলেও সকল উপকরণ, কাপড়-চোপড়, ভোগ-রাগ ইত্যাদিতে অন্ততপক্ষে দু'শো-আড়াইশো টাকা তো লাগবেই তিন দিনের পূজায়'।

স্বামীজী মহারাজ আমাদের বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন: 'তা তো বটেই! মঠের পূজো, সকলেরই সমান অধিকার। সবার আনন্দের জন্যই তো শ্রীশ্রীমহামায়ার পূজো, তা' অতো দীনভাবে করলেই বা চলবে কেন? দেখোদিখিনি, ওটা কি মুখ্যু। ও আমাকে ক্যামন সোজাসুজি বুঝিয়ে দিলে যে, পঞ্চাশ টাকায় দুর্গাপূজা হবে। আমি প্রথম ভেবেছিলাম যে, অত কম টাকায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা হয় ক্যামন ক'রে। কিন্তু অ—বল্লে—আজ্ঞে হয়। সুতরাং আমিও তাই বুঝলাম। এখন দেখ্‌ছি—ঠিকই বলেছো, পঞ্চাশ টাকায় দুর্গাপূজার মতো মহাপূজা ক্যামন ক'রে হয়? ওটা কিচ্ছু জানে না, তোমার কথাই ঠিক। অন্ততপক্ষে চারশো-পাঁচশো টাকা তো চাইই—কি বলো?'

বন্ধু বল্লে: 'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'তাহলে কেবল পটেই হোক শ্রীশ্রীমহামায়ার পূজা সাধারণভাবে। শ্রীমা-র প্রতিকৃতিতেই পূজো করবে। শ্রীশ্রীমাকেই কল্পনা করবে দেবী দশভূজারূপে'। বেদান্ত মঠে প্রতিমাসহ দুর্গাপূজার সমারোহ সে' বৎসর বন্ধই হোল।[৫]

কাজ সহজেই সফল হয়েছে দেখে আমরা অত্যন্ত খুসী হলাম। স্বামীজী মহারাজ চিরদিনই ভোলানাথ শিব। শিবসর্বচরাচরের অধিপতি, কিন্তু নিজে থাকেন দিগম্বর হয়ে শশ্মানে ভোলানাথের মতো। মহারাজও তেমনি বালকের মতো পঞ্চাশ টাকার সম্ভাবনাকে এক কথায় যেমন বিশ্বাস করেছিলেন, তেমনি একটি মাত্র কথায় আবার বিশ্বাস করলেন তার অসম্ভাবনাকেও। একেই বলে শিশুর সাবল্য। পাকা-সংসারীর মতো কড়ায়-গণ্ডায়-হিসাবের বা পাটোয়ারী-বুদ্ধির খেলার বালাই তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না, অথচ সামান্য কথা বোঝার শক্তি যে তাঁর মধ্যে ছিল না তাই ক্যামন ক'রে বলি! পাশ্চাত্যের ধুরন্দর বিদ্বজ্জনসমাজে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল বাগ্মিতা, মনীষা, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা ও বিচক্ষণ অনুভূতির পরিচয় যেমন দিয়েছিলেন, তেমনি ভারতীয় সমাজেও তাঁর পাণ্ডিত্য ও অন্তদৃষ্টির যে নিদর্শন ছিল তা থেকে তাঁর বুদ্ধি, হৃদয়ের বিশালতা ও মনের প্রসারতার কথা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়। আর একথাই সত্য যে, জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ লাভ ক'রে আমাদের মতো মানুষ হলেও তিনি ছিলেন অসাধারণ মানুষ। তাই পার্থিব সকল দৈন্য ও কারসাজীর

৫। গভীর বেদনাভারাক্রান্ত মন নিয়ে আজ স্বীকার করি যে, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার অনুষ্ঠান স্বামী অভেদানন্দের জীবদ্দশায় নানান কারণে বেদান্ত মঠে হ'য়ে না উঠলেও সেই শুদ্ধ ও শুভ বাসনা সফল হয়েছিল তাঁর মহাসমাধির ঠিক ছ'বছর পরে ও সেই থেকে আজ-পর্যন্ত প্রতিবৎসরই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা বেদান্ত মঠে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে মহাসমারোহে।

তিনি ছিলেন অনেক উর্দ্ধে। সরল বিশ্বাস ও স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়েই তিনি দেখতেন বিশ্বের সকল মানুষকে, তাই পার্থিব হিসাব-নিকাসের মায়াজাল স্পর্শ করতে তাঁকে পারে নি কোনদিন, অথচ পরিপূর্ণ ঈশ্বর বা ব্রহ্মানুভূতি লাভ ক'রেও সচেতন ছিল তাঁর মন ও দৃষ্টি সংসারের সকল বিষয়ের প্রতি !

॥ স্মৃতি : পাঁচ ॥

(এক)

আর একদিনের এক ঘটনার কথা এখানে বলি। তার মধ্যেও ছিল স্বামী অভেদানন্দের অকপট ভালবাসা, মনের নিঃসংকোচ ভাব, অমায়িকতা ও শিশুসুলভ সারল্য !

একদিন এক আগন্তুক ভদ্রলোক স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'মহারাজ বিশ্বাস ক্যামন ক'রে হয় ?' মহারাজ বল্লেন : 'গুরু ও শাস্ত্র-বাক্যকে,সত্য ব'লে মেনে নিলে ঠিকঠিক বিশ্বাস হয়। গুরু বলেছেন ঈশ্বর আছেন, শাস্ত্র বলেছে ভগবান আছেন, সুতরাং মন সেটাকে সত্য বলে মেনে নিলে এই মেনে নেওয়ার নামই বিশ্বাস আবার এই সরল বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। গুরু কিনা ঈশ্বরকে যি'নি দেখেছেন এবং নিজের শাশ্বত স্বরূপকে ঠিক ঠিক উপলব্ধি করেছেন— তিনিই গুরু। শাস্ত্রেও তাই আছে : 'শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরু মেবাভি-গচ্ছেৎ'। শাস্ত্র বলতে দিব্যদ্রষ্টা ঋষিরা বা তত্ত্বজ্ঞানীরা অনুভূতি দিয়ে যে'সব তত্ত্ব অনুভব ক'রে সে'গুলিকে লিপিবদ্ধ করে গে'ছেন'। এ' পর্যন্ত বলেই মহারাজ নীরব থা্কলেন। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে পুনরায় বল্লেন : 'কি জানেন, ঠিক ঠিক বিশ্বাস আসে ঈশ্বর দর্শন হ'লে, তার পূর্বে-পর্যন্ত থাকে assuming belief (ধরেনেওয়া বিশ্বাস)। Assuming belief (ধরেনেওয়া বিশ্বাস) বিচারযুক্ত না হ'লে টেকে না, তার ব্যতিক্রম হয়। বিশ্বাস বিচারযুক্ত হ'লে তবেই তা থেকে নিষ্ঠা ও যথার্থ অনুরাগ আসে। অন্ধবিশ্বাসে তা হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন : 'কলিতে নারদীয়া-ভক্তি'। কলিতে নারদীয়া-ভক্তি বলতে

বিচারযুক্ত ভক্তি। আর একেই জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি বলে। জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি আর প্রেমাভক্তি এক।

তারপর এলো জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের প্রসঙ্গ। ভদ্রলোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: 'মহারাজ, জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি?' স্বামীজী মহারাজ বললেন: 'অহরহঃ যিনি ভগবানের নামে আত্মহারা, যিনি নিরভিমানী, নিরহংকার, সর্বজীবে ও বস্তুতে চৈতন্যদৃষ্টিসম্পন্ন, মায়ানির্মুক্ত ও পরোপকারী তিনিই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তই স্থিতপ্রজ্ঞ-পুরুষ।

গীতার ২।৫৪ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞ-জীবন্মুক্তের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে—

'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥'

সমাধিবান ব্রহ্মজ্ঞানীই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তকে চিনতে বা জানতে গেলে জীবন্মুক্ত বা জ্ঞানী হতে হয়। জ্ঞানহীন মায়াবদ্ধ মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানীকে চিনবে বা জানবে কি ক'রে? যোগের সমাধি, আর বেদান্তেরনিদিধ্যাসন--ছু'টো ঠিক এক নয় ভিন্ন। তবে ছু'টির সাধনস্তর কিছুটা ভিন্ন হলেও চরমফল কিন্তু এক। যোগ কাকে বলে? শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন:—'সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্সসি' (২।৫৩)। যোগ ও যোগের ফল অর্থে শ্রীধর-স্বামী বলেছেন: 'যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানম্'। মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন: 'যোগং জীবপরমাত্মৈকলক্ষণং তত্ত্বমস্যাদিবাক্য-জন্যমখণ্ডসাক্ষাৎকারং সর্বযোগফলম্ ···কৃতকৃত্যং স্থিতপ্রজ্ঞো ভবিষ্যসি'। এই স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানী হলেন তিনি—যিনি সমস্ত কামনাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ বা জয় করে পরমাত্মা ব্রহ্মচৈতন্যে একীভূত হতে পারে। এই একীভূত হওয়ার নাম অদ্বৈতব্রহ্মানুভূতি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: 'আত্মন্যেবাত্মনা

তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে' (২।৫৫)। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৪।৪।৭) আছে—

'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে॥'

ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেছেন: 'এতাদৃশো মুনি মননশীলঃ সন্ন্যাসী স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে'। ব্রহ্মমননশীল বলতে 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি',—ব্রহ্মকে সে মনন করে ও জানে—সে' ব্রহ্মস্বরূপই।

তাছাড়া গীতার সেই শ্লোকটির কথা মনে আছে তো—'তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী'? মনে মান-অপমান, বিষ্ঠা-চন্দন—সব তখন একজ্ঞান হয়। লোককল্যাণের জন্য জ্ঞানীর কেবল স্থূলশরীরটাই থাকে। সাক্ষী ও দ্রষ্টার মতো মায়িক দুঃখ-কষ্টের সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত-জ্ঞানী খেলা করেন সকল ভোগের বিষয়ে নিরাসক্ত হয়ে। এতটুকু মায়া বা আসক্তি তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারে না। যেমন লুকোচুরিখেলায় বুড়ি ছুঁলে আর চোর হওয়া যায় না। তখন সাতখুন মাপ। জীবন্মুক্ত-জ্ঞানীর অবস্থাও তাই। পার্থিব শরীর থাকতে থাকতেই জীবন্মুক্তের জীবনরহস্যের চিরসমাধান হয়। তখন মায়ার সংসারে তিনি মায়াতীত হ'য়ে বাস করেন। তাই জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী'।

আফিস-ঘরটিতে সমাগত ভক্তেরা তখন স্বামীজী মহারাজের ঐ সকল কথা একমনে শুনছিলেন। বাইরের জগতের সঙ্গে কারুরই যেন কোন রকম সম্পর্ক ছিল না, স্থির-ধীর-গম্ভীর ভাব সমগ্র ঘরটার ভিতর জমাট বেঁধে ছিল। স্বামীজী মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বল্লেন: 'যেমন ছ্যাখোনা আমরা, বুড়ি ছুঁয়েবসে আছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ শেষ হলেই আমাদের ছুটি'। কথাগুলি বলতে বলতে মহারাজ বেশ একটু আনমনা হ'য়ে পড়লেন। ঘরটিতে

তখনও জমাট নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর তিনি সকলের দিকে চেয়ে পুনরায় বলতে লাগলেন: 'কি জানো—জীবন্মুক্ত হ'লে বা ঈশ্বর লাভ করলে কি আর চারটে হাত বেরোয়—না মাথায় শিঙ্ গজায়? মানুষ যেমনটি পূর্বে ছিল, জ্ঞানলাভের পরেও তেমনটিই থাকেন। তাঁর ভিতরটাই কেবল পাল্‌টে যায়, দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিবর্তন হয়। তখন সব-কিছুকে চৈতন্যময় ব'লে তিনি উপলব্ধি করেন, এতটুকু সন্দেহ আর তাঁ'র মনের মধ্যে তখন থাকে না। বাইরের জগতের সঙ্গে জ্ঞানীর ব্যবহার পূর্বেকার মতোই থাকে—খাওয়া-পরা, কথা কওয়া, হাসি-ঠাট্টা-তামসা, লোকের সঙ্গে মেলামেশা। এ'সব কোন-কিছুরই কোন ব্যতিক্রম হয় না, তবে ব্যতিক্রম হয় সাধারণ মানুষের ব্যবহারের সঙ্গে। সাধারণ মানুষ মায়া-মমতায় আবদ্ধ হয়ে দেহটাকে ইহসর্বস্ব জ্ঞান করে, কিন্তু জীবন্মুক্ত-জ্ঞানী তা করেন না। তিনি তখন দেখেন: 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্,'—বিশ্ববৈচিত্র্য ব্রহ্মেরই রূপ ও বিকাশ। তাই ব্রহ্মের ছাড়া কিছুই তখন দেখেন না। তখন স্ফুরণ অনুভব করেন ব্রহ্মই সকলের আধার; সর্বত্র ব্রহ্মেরই বিকাশ, ব্রহ্মই সব-কিছু'।[১] আমরা অনিমেষনেত্রে তখন স্বামীজী মহারাজের তেজোব্যঞ্জক অথচ আপনভোলা-ভাব লক্ষ্য করছিলাম!

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্মানুভূতির একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "আমরা মানুষটাকে মানুষ বলিয়া, গরুটাকে গরু বলিয়া, পাহাড়টাকে পাহাড় বলিয়াই জানি। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেখিতেন মানুষটা, গরুটা, পাহাড়টা—মানুষ, গরু ও পাহাড় বটে, অধিকন্তু আবার দেখিতেন—সেই মানুষ, গরু ও পাহাড়ের ভিতর হইতে সেই জগৎকারণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ উঁকি মারিতেছেন। মানুষ, গরু ও পাহাড়রূপ আবরণে আবৃত হওয়ায় কোথাও তাঁহার অঙ্গ (প্রকাশ) অধিক দেখা যাইতেছে এবং কোথাওবা কম দেখা যাইতেছে—

(দুই)

এ' প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলি। এটি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন অভেদানন্দ মহারাজ ১১।এ, ইডেন-হস্‌পিটাললেনে (মেডিকেল- কলেজের প্রায় বিপরীত দিকে) ছিলেন। সে' সময়ে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের নাম ছিল 'রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-সোসাইটি'। 'মঠ' তখনও হয় নি। আমরা তখন কলেজের ছাত্র। ইডেন-হস্‌পিটাল-লেনস্থ-বেদান্ত সোসাইটির দোতালায় (সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বামদিকের ঘরে) নিয়মিতভাবে ক্লাস করতেন অভেদানন্দ মহারাজ। ক্লাস করতেন সপ্তাহে তিন দিন---রবিবার, বুধবার ও শুক্রবার, সন্ধ্যা ৬।০ টায় বা ৭ টায়। শ্রোতারূপে থাকতেন বেশীর ভাগই বিভিন্ন কলেজের ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা ও ছাত্ররা,

এইমাত্র প্রভেদ। সেজন্য ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি—'দেখিকি—যেন গাছপালা মানুষ, গরু, ঘাস, জল সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের খোলগুলো! বালিশের খোল যেমন হয় দেখিস্ নি?—কোনটা খেরোর, কোনটা ছিটের, কোনটা বা অন্য কাপড়ের; কোনটা চারকোণা, কোনটা গোল—সেই রকম। আর বালিশের ঐ সবরকম খোলের ভেতরে যেমন একই জিনিস তুলো ভরা থাকে—সেইরকম ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, জল, পাহাড় পর্বত সব খোলগুলোর ভেতরেই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন। ঠিক ঠিক দেখতে পাই যে মা যেন নানারকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানারকম সেজে ভেতর থেকে উঁকি মারছেন" (পৃঃ ১৬৮-৬৯।)

জীবন্মুক্ত-জ্ঞানীর অবস্থা ও দৃষ্টি ভিন্ন। তিনি দেখেন বিশ্বের সমস্তই ব্রহ্মচৈতন্যময়। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন: "উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া ঐরূপে সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি"। এ' ভুলই অজ্ঞান, ভ্রম বা ভ্রান্তি। এই ভ্রমকে আচার্য শঙ্কর বলেছেন 'মিথ্যাপ্রত্যয়' বা মিথ্যাজ্ঞান—যা সত্যজ্ঞানের বিপরীত।

আর থাকতেন বহু বিভিন্নধরনের শ্রোতা। আমরাও তাদের মধ্যে থাকতাম।

বেদান্ত-সোসাইটিতে একদিন গীতার ক্লাস (আলোচনা হচ্ছে। যতদূর মনে আছে—গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪।৫৫ শ্লোক—যেখানে স্থিতপ্রজ্ঞ কে ? তাঁর প্রকৃতি কি ? —এবং বলা হয়েছে 'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্' প্রভৃতি। স্বামীজী মহারাজ শ্লোকের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যা করছেন এবং মাঝে মাঝে মধুসূদন সরস্বতীর ভাষ্যেরও উল্লেখ করছেন। অপূর্ব আনন্দস্মৃতিপূর্ণ সেই ক্লাস। তিনি ব্যাখ্যা করছেন 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে' —'আত্মনি পরমানন্দরূপে এব আত্মনা স্ববমেব তুষ্টঃ আত্মারামঃ সন্' প্রভৃতি। 'আত্মারামঃ সন্' বলেই মহারাজ একটু থামলেন এবং স্থির-ধীরভাবে বল্লেন : 'ব্রহ্মজ্ঞানীর সকল বাসনার তখন অবসান ঘটে, আর-কিছু চাওয়ার ও পাওয়ার বস্তু থাকে না। তখন আত্মকাম,—আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট'। মুখমণ্ডল তাঁর প্রদীপ্ত ও রক্তিম। কিছুক্ষণ সে'ভাবে থাকার পর যেন তাঁর চমক ভাঙলো। তিনি পূর্বের মতোই পুনরায় ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ। ঘরটির পরিবেশ উজ্জ্বলগম্ভীর ও স্তব্ধ। ক্রমে স্বামীজী মহারাজ তাঁর ক্লাসের আলোচনা শেষ করলেন। একটি কাঠের চৌকির উপর তাঁর চেয়ার থাকতো, তিনি তার উপর বসেই ক্লাস করতেন। ক্লাস শেষ হ'লে শ্রোতারা সকলেই উঠে প্রণাম করতেন ও তিনি চেয়ারে ধীর-স্থিরভাবে বসে থাকতেন। ক্লাশের শেষে সকলের প্রণাম শেষ হ'ল। কিন্তু একজন ভদ্রলোক তখনও জোড়হাত ক'রে কিছুটা দূরে অপেক্ষা করছিলেন। গায়ের রঙ তাঁর কালো, আর গায়ে ছিল একটি সাদারঙের সার্ট। দেখতে ৭৪।৭৫ বৎসর বয়স হবে। স্বামীজী মহারাজ তাঁকে পূর্ব থেকে লক্ষ্য করছিলেন। মহারাজ চেয়ার থেকে নেমে সেই লোকটির কাছে এসে দু'হাত দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন

করলেন। আমরা ছিলাম পাশেই দাঁড়িয়ে। কোলাকুলির পর স্বামীজী মহারাজ ঘরের বাইরে গিয়ে সামনে তাঁর থাকার ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন, আর ভদ্রলোক সেই অবসরে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

আমরা কিন্তু সেই ভদ্রলোকের ব্যবহারে সে'দিন মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারিনি, বরং বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট ও কিছুটা রাগান্বিতই হয়েছিলাম। ভাবছিলাম ভদ্রলোকের ধৃষ্টতার ও অহমিতাকর কথা। স্বামীজী মহারাজ ধীরে ধীরে তাঁর সামনের ঘরে প্রবেশ করলে আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘরে প্রবেশ ক'রে ভদ্রলোকের হঠকারিতার কথা জানালাম। বল্লাম—"একি মহারাজ? লোকটার ধৃষ্টতা তো খুব! সে আপনাকে প্রণাম না ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলেন, আর আপনি কিনা তার পরিবর্তে কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন'? স্বামীজী মহারাজ একটু হাসলেন এবং পিছন ফিরে আমাদের বল্লেন: 'উনি ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ। তোমরা ওকে চিনতে পারোনি, তাই তোমাদের রাগ। উনি ঠিকই করেছেন এবং আমিও যথাযথই করেছি'। আমরা শুনে স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। তারপর তাড়াতাড়ি মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাশের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম লোকটিকে যদি পাওয়া যায়—দেখার জন্য। কিন্তু লোকটিকে আর পাওয়া গেল না। তারপর আর কোনদিন লোকটিকে মহারাজের ক্লাশে আসতে দেখিনি। স্থিতপ্রজ্ঞ জীবন্মুক্তপুরুষ-সম্বন্ধে গীতা থেকে ঠিক সে'দিনই মহারাজ আলোচনা করছিলেন। আমরা শুনে আশ্চর্য হলাম যে, ঠিক ঐ আলোচনার সময়েই প্রত্যক্ষ একজন জীবন্মুক্তের শুভাবির্ভাব ঘটেছিল সেখানে। পূর্বেই বলেছি যে, মহারাজকে ঐ লোকটি-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন: 'উনি ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ। তোমরা ওকে চিনতে পারোনি'। আশ্চর্য ও অভূতপূর্ব সে'দিনের সেই ঘটনা।

সেইদিনের ঘটনাকে স্মৃতি থেকে আজও আমরা মুছে ফেলতে পারিনি।

কিছুদিন পরে পুনরায় স্বামীজী মহারাজকে আমরা ঐ দিনের ঐ ঘটনার ও আশ্চর্য মানুষটির কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে'দিনও মহারাজ একটু হাসিমুখে আমাদের পূর্বের মতো বলেছিলেন : 'শ্রীশ্রীঠাকুরের বলা সেই সমাধিবান জীবন্মুক্তের কথা তোমাদের মনে আছে তো ? শ্রীশ্রীঠাকুর গল্পচ্ছলে প্রথমে একদল চোরের, তারপর কয়েকজন মাতালের ও পরিশেষে একজন জীবন্মুক্তের সেই একই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। চোরেরা বলেছিল—'কি বাবা, চুরি ক'রে পালাচ্ছিলে, ধরা পড়ে বেদম মার খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছ ?' মাতালেরা বলেছিল—'খুব মদ খেয়েছিলে, তাই চৈতন্য হারিয়ে এখন অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে আছ ?' কিন্তু জীবন্মুক্তপুরুষ ঐ জ্ঞানী লোকটিকে দেখে কোলে তুলে নিয়ে নিরাপদস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পতিত বেহুঁশ লোকটি ছিলেন সমাধিবান একজন মহাপুরুষ। তাই জীবন্মুক্ত মানুষ বেহুঁশ লোকটিকে দেখে জীবন্মুক্ত-জ্ঞানী বলে বুঝতে পেরেছিলেন ও কোলে তুলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। জ্ঞানীই জ্ঞানীকে চেনে, অজ্ঞানী জ্ঞানীকে চিনবে ক্যামন ক'রে ? তোমাদেরও তাই হয়েছে। তোমরা তো সেই আত্মজ্ঞানের অনুভূতি পাওনি, তাই আত্মজ্ঞানীকে চিনতে পারোনি। তোমাদের দোষ নাই। আমি কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁকে চিনতে পেরেছিলাম"।

আর একদিনের আর-এক ঘটনার কথা বলি। আমাদেরই একজনের সঙ্গে নিরামিষ-খাওয়া নিয়ে প্রসঙ্গ উঠলো। প্রথমে হ'ল নরম আলোচনা, তারপর তা' গরমে হ'তে-হ'তে চরমে উঠলো। আলোচনা যাঁর সঙ্গে হ'চ্ছিল তিনি ছিলেন নিরামিষ-খাওয়ার একান্ত

অনুরাগী এবং সেই অনুরাগের একান্ত নিষ্ঠা পরিশেষে তাঁর মধ্যে গোঁড়ামীর ভাবকেই পরিপুষ্ট করেছিল। বিতর্কের অছিলায়ই আমরা তাঁকে বলেছিলাম: 'কিছু খাওয়া, না-খাওয়া বা আমিষ-নিরামিষ-খাওয়া যে যার রুচির উপর নির্ভর করে, কিন্তু তাই ব'লে গোঁড়ামীর আশ্রয় নেওয়া ভাল নয়। আচার-বিচার দিয়ে ঈশ্বর লাভ হয় না। ঈশ্বর পার্থিব সকল-কিছুর বাইরে। ভগবান মানুষের মন দেখে, তিনি বিচার-আচার দেখেন না' ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের সেইসব কথা তখন শোনে কে? বরং বন্ধুটি গেলেন সপ্তমে চড়ে। শাস্ত্রের প্রমাণ তুলে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লেন: 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ,'—খাওয়া-দাওয়ায় শুদ্ধতা বা সাত্ত্বিকভাব এলে তবেই মন শুদ্ধ হয়। আমিষ খেলে মন চঞ্চল হয়, মনকে স্থির ও শুদ্ধ করতে হলে তাই নিরামিষ-খাওয়া দরকার'।

বন্ধুবর গীতার ১৪শ অধ্যায় থেকে তখন সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ তিন গুণের মহিমাও কীর্তন করতে লাগলেন। বল্লেন—

'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনামযম্।

*   *   *

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্'। প্রভৃতি

তমোগুণে আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। সুতরাং যুক্তাহার, শুদ্ধাহার, পরিমিত আহার প্রভৃতি ধর্মের ও যোগসাধনার পক্ষে কল্যাণকর—'যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু...' প্রভৃতি। বন্ধুবর আরও অনেক শাস্ত্রপ্রমাণ অপরাপর গ্রন্থ থেকে যখন দিতে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা বল্লাম—'থাক্, এখন যুক্তির দিকে আসা যাক্, কেননা শাস্ত্রে বিধি-নিষেধের কথা থাকলেও যুক্তিবিচার দিয়ে তাদের নিষ্পত্তি করা উচিত। যেমন ধরুন,—আহার বল্লেই কোন খাদ্য-খাওয়া বোঝায় না। শঙ্করাচার্য আহার বলতে ইন্দ্রিয়সংযম অর্থ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—শূকর মাংস খেয়েও যদি

ভগবানে নিষ্ঠা হয়, তবে তাই শুদ্ধ-আহার, আর নিরামিষ-আহার ক'রে যদি ঈশ্বরে মতি না আসে, তবে তাকে অশুদ্ধ-আহারই বলতে হবে। শ্রীমা (শ্রীশ্রীসারদাদেবী) তো তাঁর ছেলেদের (ভক্ত-শিষ্যদের) ঢালা হুকুম দিয়েছেন : 'বাঙলাদেশে মাছের ঝোল [illegible]র ভাত খেয়ে সাধনভজন করবে, তাতে যদি কোন পাপ হয় তো আমার'। মা করুণাময়ী, বাঙলাদেশের পরিবেশ তিনি বুঝতেন, তাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাও ক'রে গেছেন। স্বামীজীরাও যে-যার রুচির ওপরই জোর দিয়েছেন, জোর-জবরদস্তি ক'রে কিছু খাওয়া বা না-খাওয়ার কথা বলেন নি। তাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর স্পষ্টই বলেছেন : 'যার পেটে যা সয়'। সুতরাং আমিষই বলুন, আর নিরামিষই বলুন, যে-রকম আহার করলে সহজে হজম হয়, শরীর সুস্থ থাকে, সে' রকম আহরই ভাল ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক ও গোঁড়ামীর কোন প্রশ্নই এখানে উঠতে পারে না'। কিন্তু বন্ধুবর আমাদের ঐ সকল কথায় মোটেই সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি।

তারপর সোজাসুজি পুনরায় প্রসঙ্গ উঠলো গোঁড়ামীর কথা নিয়েই। আমরা বন্ধুকে বল্লাম : 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কী উদার ভাব ছিল! খাদ্যাখাদ্যের বিচার নিয়েই যদি সারা জীবনটা কেটে যায় তবে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা আর করবে কখন্ মানুষ! শ্রীশ্রীঠাকুরও তো বলেছেন : 'বাগানে ঢুকে জো-সো ক'রে আম-খাওয়াই দরকার, পাতাগুণে সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি। স্বামীজী মহারাজ ও (স্বামী অভেদানন্দ) তো গোড়াকার দিকে আমেরিকায় নিরামিষ-আহারই করতেন—'হোয়াই এ' হিন্দু ইজ্ এ ভেজিটেরিয়ান্'[৫] গ্রন্থই তার

৫। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ নিউ-ইয়র্কের 'ভেজিটেরিয়ান্ সোসাইটী'-তে স্বামী অভেদানন্দ এই বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন।

প্রমাণ। আমেরিকার লেখক ওয়েনডেল টমাস 'হিন্দুইজম্ ইন্‌ভেড অ্যামেরিকা'-গ্রন্থে (পৃঃ ১১১) তঁ'র (স্বামী অভেদানন্দের) শতমুখে প্রশংসা ক'রে লিখেছেন : 'His case of vegetarianism, for example, makes a strong appeal on its own merits'। কিন্তু সে'রকম নিরামিষ-আহারে তাঁর শরীর যখন ক্রমেই অসুস্থ হ'তে থাকলো তখন তিনি আবার আমিষ-আহার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেখেছেন তো—'লিভ্‌স ফ্রম্ মাই ডায়েরী'-তে (পৃঃ ৩৯) মহারাজ নিজেই সে' সম্বন্ধে কি লিখেছেন ? তিনি লিখেছেন : 'Here I was a strict vegetarian, living on boiled potatoes and beans, white bread and butter. After a few days I suffered from indigestion and Dyspepsia. Dr. Janes came to see me and when I told that I did not eat any kind of meat, fish or egg, the good doctor replied : 'That would not do for you here. When you go to Rome, do as the Romans do. You have a mission in your life, you must take proper nourishing food, otherwise you will fall sick.' —অর্থাৎ 'আমেরিকায় থাকাকালে প্রথম প্রথম আমি পুরোদস্তুর নিরামিষভোজী ছিলাম। আলুসিদ্ধ, শিম, সাদারুটি ও কিছু মাখন খেতাম মাত্র। কিছুদিন পরে আমার বদহজম হ'তে লাগলো ও তা থেকে পেটের অসুখ হ'ল। ডক্টর জেনস্ আমায় দেখতে এলেন। আমি মাছ, মাংস, ডিম—এ'সব কোন জিনিসই খেতাম না—এ'কথা বল্লাম। নেহাৎ ভালমানুষ ডাক্তার আমার কথা শুনে বল্লেন—ও'সব এদেশে চল্‌বে না। আপনি যখন রোমনগরীতে যাবেন তখন আপনার রোমবাসীদের মতোই থাকা-খাওয়া উচিত নয় কি ? আপনার জীবনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে। কাজেই পুষ্টিকর খাদ্য

খাওয়া আপনার দরকার, তা না হ'লে আপনি ভীষণ অসুখে পড়ে যাবেন'।[৬]

এ'পর্যন্ত বলেই যে আমরা নিরস্ত হলাম তা নয়, বন্ধুকে আরো বল্লাম : 'দেখেছেন তো, স্বামীজী মহারাজ নিজেই স্বীকার করেছেন : 'This friendly advice of Dr. Janes made a great impression on my mind,'—অর্থাৎ 'ডক্টর জেন্‌সের কথা সত্যই আমার মনের উপর একটি গভীর রেখাপাত করেছিল'। এ'টি হ'ল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই আগষ্টের ঘটনা। তারপর অভেদানন্দ মহারাজ আমিষ-আহার করার জন্য কলকাতা বাগবাজার-মঠ থেকে শ্রীমার (শ্রীসারদাদেবীর) আদেশ পাওয়ার পর থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরামিষ-আহার ত্যাগ করেছিলেন ও শেষ-পর্যন্ত সেই আমিষ-আহারই করতেন বরাবর। গোড়ামীর বশে তিনি তো কই নিরামিষ-খাওয়াকেই ইহসর্বস্ব বলে ধ'রে থাকেন নি ?'

৬। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকায় গোড়ার দিকে যে নিরামিষ-আহার করতেন তাও স্বামী সারদানন্দের অনুপ্রেরণায়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৭।২৮ সেপ্টেম্বরের ডায়েরীতে তিনি উল্লেখ করেছেন : 'At time I was a strict vegetarian living on boiled vegetables, bread and milk. Swami Saradananda told me that he was a strict vegetarian and that I should also set an example of the same, if I wanted to have success in my mission and works. I respected his advice and lived up to the ideas of a strict vegetarian and a teetotaller'; —অর্থাৎ 'সেই সময়ে আমি একেবারে খাঁটি একজন নিরামিষভোজী ছিলাম। খেতাম মাত্র শাক্‌সবজী, রুটি আর দুধ। স্বামী সারদানন্দ নিজেও একজন নৈষ্ঠিক নিরামিষাশী ছিলেন। তিনি আমায় বল্লেন : 'তুমি এদেশে যদি তোমার উদ্দেশ্যে ও কাজে কৃতকার্য হ'তে চাও তবে তোমার উচিত হবে নিরামিষ খাওয়া। এতে তোমার কাজের প্রসার হবে'। আমি তাঁর উপদেশ মেনে নিয়েছিলাম ও সম্পূর্ণরূপে নিরামিষ আহারই করতাম। চা-প্রভৃতিও আমি একেবারে ত্যাগ করেছিলাম'।

কিন্তু আমাদের কথা তখন শোনে কে? বন্ধুবর নিরুপায়! পরিশেষে ক্রুদ্ধ হয়ে সোজাসুজি স্বামীজী মহারাজের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। মহারাজ তখন তাঁর অফিস-ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে বন্ধু কি ব'লে নালিশ ক'রছিলেন জানি না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে একজন ভগ্নদূত এসে আমাদের সংবাদ দিলে 'স্বামীজী মহারাজ আপনাদের ডাকছেন। ডাকার নিগূঢ়তত্ত্ব বোঝার তখন আর আমাদের বাকী ছিল না। একান্ত অপরাধীর মতো স্বামীজী মহারাজের কাছে গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালাম তাঁর সামনের টেবিলটির ধারে। দেখলাম সেই বন্ধুও মহারাজের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আসামী আমাদের বিরুদ্ধে বিচারের রায় পাওয়ার জন্য। স্বামীজী মহারাজের হাত থেকে বাঁচার সকল কৌশলই অবশ্য জানা ছিল আমাদের পূর্বেকার অনেকগুলি ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে। আমরা ভালভাবেই জানতাম যে, স্বামীজী মহারাজ সাক্ষাৎ ভোলানাথ, সত্য যা—সঠিকভাবে তা' বুঝিয়ে দিতে পারলে সকল গোলমালের চির-অবসান ঘটবে। শিবের মাথায় একটু গঙ্গাজল ও একটি বিল্বপত্র নিষ্ঠার সঙ্গে দিতে পারলেই হ'লে, আশুতোষ ঐ সামান্যতেই তুষ্ট হন।

স্বামীজী মহারাজ আমাদের দেখে বেশ একটু রাগান্বিত-স্বরে বল্লেন: 'কিগো, তর্ক-বিতর্কের পালা পরিশেষে হাতাহাতিতে দাঁড়াবার উপক্রম হ'ল? ব্যাপারটা কি বলো দেখিনি? জোর ক'রে কারুর ভাব নষ্ট করতে নেই। তোমরা নাকি নিরপরাধী আমাকেও তোমাদের বাগ্‌যুদ্ধের ভিতর টেনে আনতে ছাড়োনি?'

আমরা শুনে তো অবাক্। বল্লাম: 'সে কি মহারাজ, আপনারে সম্বন্ধে আমরা কি বলেছি?' স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'তোমরা নাকি বলেছ যে, আমি "হোয়াই এ হিন্দু ইজ এ' ভেজিটেরিয়ান্'

বইখানি লিখে ভাল কাজ করিনি, কেননা কাজে ও কথার আমার মিল নাই ?' আমরা সমস্ত কথা শুনে তখন একদিকে যেমন বন্ধুর তারিফ না ক'রে থাকতে পারিনি, অপর দিকে তেমনি হাসি চেপে রাখাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। আমাদের মুখে চাপাহাসি দেখে স্বামীজী মহারাজ আরো একটু গেলেন চটে। তিনি বল্লেন : 'কি, হাসছো যে ? বই-লেখায় আমার কি অপরাধ হয়েছে বলোদেখিনি ?' আমরা বল্লাম : 'মহারাজ, ঘটনা কিন্তু মোটেই তা' নয়, কথাগুলি ঘুরিয়ে একেবারে অতিরঞ্জিতই করা হয়েছে। আসলে আমরা যা বলছি তা' শুনুন'। স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'বলো'। আমরা বল্লাম : 'আমিষ-নিরামিষ-খাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়েই কথাগুলি অবশ্য উঠেছে। আমরা গোঁড়ামির নিন্দা ক'রে আগাগোড়া সকল কথাই বলেছি। বন্ধু নিরামিষ-খাওয়ার একান্ত পক্ষপাতী। নিরামিষ না খেলে নাকি চিত্তশুদ্ধ ও ধর্মলাভ হয় না—এ'কথাই চেঁচামেচি ক'রে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা শ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও আপনাদের উদার ভাবের উদাহরণ দিয়ে বলেছি যে, ধর্মসাধনায় গোঁড়ামির ভাব থাকা ভাল নয়। তা' ছাড়া কেবল আমিষ-নিরামিষ খাওয়ার বাচবিচার নিয়ে থাকলে ঈশ্বর লাভ হয় না। এই দেখুন না, আমাদের স্বামীজী মহারাজই তো গোড়ার দিকে নিরামিষভোজী ছিলেন, আমেরিকায় 'হোয়াই এ' হিন্দু ইজ্ এ ভেজিটেরিয়ান্' গ্রন্থও লিখলেন, তারপর শ্রীমা অনুমতি দিতে অতদিনের অভ্যাস ও সংস্কার তিনি এক মুহূর্তের মধ্যেই ছেড়ে দিলেন, আবার আমিষ-আহারই করতে লাগলেন। কই, কিছুমাত্র গোঁড়ামী কি তাঁকে স্পর্শ করেছিল ? এই উদার আদর্শই তো আমাদের অনুসরণ করা উচিত—,না নিজের মনগড়া অন্ধ-সংস্কারকে নিয়ে আমরা পড়ে থাকবো ?'

স্বামীজী মহারাজ আমাদের কথা শুনে ছোট্ট-শিশুর মতো

উচ্চহাস্য করতে লাগলেন ও বল্লেন: 'আরে ঠিকই তো। তোরা বা ঠিকই বলেছ—গোঁড়ামী করবে কেন? গোঁড়ামী তো সংকীর্ণতা'র নামান্তর। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকল গোঁড়ামীর পারে যেতে বলতেন। আমিষ ও নিরামিষ নিয়ে ঝগড়া ক'রে লাভ কি বলো? ভক্তি, নিষ্ঠা, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই আসল। সেই সব যা'তে হয় তাই সকলে করবে, আর তাই হবে তোমাদের জীবনের সাধনা। ভগবান খাওয়া-খাওয়ি-বিচারের বাইরে। তিনি চান তোমাদের মন ও তোমাদের ঐকান্তিক ভক্তি, নিষ্ঠা ও ত্যাগ। এটা খাওয়া উচিত, ওটা উচিত নয়—এই বাচবিচার তো যুগ-যুগান্তর ধ'রে চ'লে আসছে। আমাদের সমাজ ওই ক'রে একেবারে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। দ্যাখোদেখিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ কত উদার ছিলেন! তিনি বলতেন: 'খাওয়া-খাওয়ির ভিতর ভগবান নেই। মন-মুখ এক ক'রে ঈশ্বরের ভজনা করো, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে (ঈশ্বরকে) ডাকো, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপা করবেনই'![৭]

তারপর মহারাজ হাসতে হাসতে আমাদের বন্ধুর দিকে চেয়ে বলেন: 'কি রে? তুই ভুল বুঝেছিস। ওরা তো ঠিক কথাই ব'লেছে।

৭। শ্রীমার পত্র:

"৮।১, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
মার্চ, ১৮৯৯

"কল্যাণবরেষু,

"গতকল্য তোমার এক কুশলসহ পত্র পাইয়া * * আহারাদি সম্বন্ধে তাদৃশ কঠোরাদি করিবে না। তুমি সেখানে একদম নিরামিষ ভোজন না করিয়া উত্তম মৎস্যাদি আহার করিবে। তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না। আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি—তুমি স্বচ্ছন্দে উহা খাইবে। সর্বদা শরীরের দিকে নজর রাখিবে। * * *। ইতি—

তোমাদের মা।"

সমগ্র পত্রটি 'পত্র-সংকলন', পৃঃ ১-২ দ্রষ্টব্য।

গোঁড়ামী করবি কেন? এই গোঁড়ামী, সংকীর্ণ সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করতেই তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবার এসেছিলেন। তিনি ছিলেন উদারতার ও সমন্বয়ের অবতার! এতটুকু সাম্প্রদায়িকী গোঁড়ামির ভাব তাঁর ভিতর ছিল না। সেজন্যই তো আমি লিখেছি: 'সম্প্রদায়বিহীনো যঃ সম্প্রদায়ং ন নিন্দতি'। তার সম্প্রদায়কে তাই বলতে পারি 'অসম্প্রদায়িক-সম্প্রদায়?'—অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়বিহীন তাঁর ধর্ম! এত বড় অসম্প্রদায়িক সমন্বয়কারী অবতার আর কোন যুগে এসেছিল ব'লে জানা নেই। তোর মন অতো ছোট কেন? মাছ খাবি বা খাবি না—এই নিয়ে কি দুর্লভ মনুষ্যজন্মটা কাটাবি? যা, ও'সকলের পারে চলে যা! ও'সব কুসংস্কার। ও'সবই মায়া। মায়া কি আর গাছে ফলে—না বই-কেতাবে লুকিয়ে থাকে? কুসংস্কারই মায়া জানবি। তোরা শ্রীঠাকুরের পায়ে আশ্রয় নিয়েছিস, ওই সব কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দিবি কেন? তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কাছে প্রার্থনা করবি তিনি যেন সমস্ত সংস্কার দূর ক'রে দেন। কি বলিস্?'

বন্ধু লজ্জায় মুখটি হেট ক'রে 'হ্যাঁ' সম্মতি জানালেন। যুদ্ধজয়ী আমরা আশ্বস্ত হলাম ও প্রফুল্ল মনে স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম ক'রে নীচে এলাম। এ'রকম পাগলামীর অভিনয়ের তখন অন্ত ছিল না। সহজ সরল আত্মভোলা স্বামীজী মহারাজকে নিয়ে এই ধরনের দৌরাত্ম্যের খেলা অনেকদিন অনেক রকমভাবেই হয়েছে। আজ সেই সব কথাই কেবল মনে পড়ে, আর ভেসে ওঠে স্নিগ্ধোজ্জ্বল অতীত স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের সরলতাপূর্ণ অথচ ভাবগাম্ভীর্যময় প্রসন্ন সেই মূর্তি। আজিকার দিনে ধ্যানের মতো সেই বিস্মৃত স্মৃতির ঘটনাগুলিকে বুকে নিয়ে সত্যই মনে সান্ত্বনা পাই!

॥ স্মৃতি ঃ ছয় ॥

কথায় কথায় ধ্যানের কথা উঠলো। স্বামীজী মহারাজ সকল সময়ে অযথা বসে না থেকে কাজ করার কথা বল্লে তিনি বলতেন : 'কাজ করবে, আবার ধ্যান-ধারণাও করবে। ধ্যান-ধারণা না করলে মনে শুদ্ধবিচারের উদয় হয় না। তোমরা কাজ করবে—শুধু ভাববে না, আবার বিচার করবে কাজ কিভাবে করবে সংসারে। কাজ করবে ঈশ্বরের পূজাকরছো—এই মনে ক'রে। Work is worship. 'নগর ফের, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা-মায়ে'। তাই সকল কাজই করবে শ্যামা-মার উদ্দেশ্যে, এতটুকুও নিজের জন্য নয়। নিজের জন্য নয় ভাবলে স্বার্থপরতার ভাব আর মনে আসবে না'।

'কাজ যে ঈশ্বরের পূজারূপ কর্ম—সেজন্যও ধ্যান-ভজন করতে হয়। ধ্যান-ভজন না করলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না, আর চিত্ত শুদ্ধ না হ'লে অহংকার বা 'আমি করছি' বা 'আমার জন্য (কাজ) করছি' —এই অভিমান যায় না। গীতার ৩।২৭ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ'কথাই বলেছেন : 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্মানি সর্বশঃ, অহংকার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'। 'আমি' বা 'আমার'-অভিমান (অহং-অস্মিতা) না গেলে তুমি বা তোমার (নিজের) জন্য নয়—ঈশ্বরের কাজ করছো, বা পরকল্যাণের জন্য কর্ম করছো—এ'কথা এবং এই বিচার মনে জাগে না। তাই শুদ্ধ ও যথার্থবিচার (তত্ত্ববিচার) মনে জাগার জন্য একান্তভাবে সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা করতে হয়।

প্রথমে ধার... ও তারপর ধ্যান। ধ্যানের পূর্বে ধারণার সময়েও ঈশ্বরে... মনের বা চিত্তের ... ...ম জপ করতে হয়। তারপর ধ্যানে মন বা চিত্ত... মনের নাশ বলতে স্থির মন বা চি...ত পরিশুদ্ধ হয় বলতে মন বা

চিত্ত চৈতন্যময় ইষ্টদেবতারূপ কেন্দ্রে স্থির হয়। তখন মন রূপায়িত হয় চৈতন্যে। তখনই সত্যকারের শান্তি ও আনন্দ'।

'ধ্যান করবে কখন? ধ্যান করার নির্দিষ্ট সময় বিশেষ ক'রে দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে। সন্ধিক্ষণ বলতে রাত্রির অবসানে যখন দিন (রাত্রি প্রভাত) হয় এবং দিনের অবসানে রাত্রি আরম্ভ হয়—তখন। সন্ধিক্ষণ বলতে দু'য়ের meeting place (মিলনস্থান)। যেমন দুর্গাপূজার সময়ে হয় সন্ধিপূজা। সন্ধিপূজা হয় অষ্টমীতিথির অবসানে ও নবমীতিথির প্রারম্ভে (সূচনায়)। ঐ সময়ে প্রকৃতির ভাব স্থির-ধীর ও শান্ত থাকে ও বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আন্তরপ্রকৃতি বলতে মনের ভাব প্রসন্ন ও স্থির হয়। তাই ঐ দু'টি তিথির মিলনক্ষণকে (সঙ্গমকে) 'সন্ধি' বলে। সকলের বিশ্বাস যে, সন্ধিপূজার সময়ে দেবীর প্রত্যক্ষ-আবির্ভাব হয়। দেবী দুর্গা শান্তিময়ী ও আনন্দরূপিণী, তাই ঐ সন্ধিক্ষণে সকলের মনে শান্তি ও আনন্দ সৃষ্টি হয়। দিনের সন্ধিক্ষণে তাই ধ্যান-ধারণা ও জপ করতে হয়, কেননা মন তখন শান্ত থাকে ও দেবতায় বা ইষ্টমূর্তিতে মন সহজে স্থির ও একীভূত হয়। অন্য সময়ে প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। মন চঞ্চল বা অস্থির হ'লে ধ্যান হয় না। তাই ধারণা[১] অভ্যাস করতে হয়। ধারণা বলতে চঞ্চল অর্থাৎ এদিকে-সেদিকে ছুটেবেড়ানো মনকে একটি বিষয়ে বা কেন্দ্রে ধরে রাখা (ধারণা)। এই ধরে রাখার বা ধারণার অভ্যাস থেকে ধ্যান সার্থক ও সিদ্ধ হয়। ধ্যানের পর সমাধি। সমাধি এলে তবেই সিদ্ধি বা দিব্যজ্ঞান। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি তাই অন্তরঙ্গসাধনা। আর যম, নিয়ম, প্রাণায়ামাদি যোগের বাহ্য বা বহিরঙ্গসাধনা।

১। কাশ্মীরীয়-শৈবাগমে 'বিজ্ঞানভৈরব' '
রকমভাবে বলা হয়েছে।

'অনেকে ধ্যান করেন কোন দেব-দেবীর মূর্তিকে মানসচক্ষে ধ'রে রাখার জন্য। মনকে কোন একটা মূর্তিতে, কেন্দ্রে বা বিষয়ে স্থিরভাবে ধরে রাখাকেই তাঁরা ধ্যান বলেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়, কেননা ধরে রাখার অর্থাৎ ধারণার অভ্যাস হ'লে ক্রমশ ধ্যানের শান্তভাব আসে। কথা এই যে, বারবার ধারণা বা এদিকে-ওদিকে ছুটে-যাওয়া মনকে একটি কেন্দ্রে স্থির রাখতে হয়—তা সে দেবদেবীতেই হোক বা কোন পবিত্র প্রতীকেই হোক। অধিকক্ষণ ধরে রাখার অভ্যাস থেকে ধীরে ধীরে (পরিশেষে) ধ্যানের অবস্থা আসে, আর ধ্যান দৃঢ় হ'লে সমাধির ভাব আসে।

'ধারণার অভ্যাসের সময়ে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে—মনকে একটি বিষয়ে বা কেন্দ্রে ধরে রেখে স্থির বা শান্ত করা। এই অভ্যাসের ও স্থির রাখার দিকে মনকে সজাগ রাখতে হয়, কেননা মনের দিকে লক্ষ্য রাখলে মনের এদিকে-ওদিকে চলে বা সরে-যাওয়ার অভ্যাস নষ্ট হয়ে তার স্থানে স্থির-হওয়ার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। মনের স্থির-হওয়ার অভ্যাস মনকে ধ্যানমুখী হতে সাহায্য করে। সেজন্য ধ্যান বলতে প্রথমে ধারণার (মনকে একটি বিষয়ে বা কেন্দ্রে ধরে রাখার) অভ্যাস। ধ্যান প্রথমে হয় না। ধারণার পর ধ্যান এবং ধ্যানের পর সবিকল্পসমাধি ও পরিশেষে নির্বিকল্পসমাধি। এইসব পরপর হয়, একেবারে নয়'।

আমরা প্রশ্ন করলাম: 'তাহলে সত্যকারে ধ্যান কাকে বলে?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'এর উত্তর আমি পূর্বেই দিয়েছি। ধ্যান বলতে বোঝায় সংকল্প-বিকল্পরূপ দু'টি বৃত্তিহীন স্থির মন। স্থিরমন চৈতন্যের অভিন্ন রূপ। চঞ্চল অবস্থার (বৃত্তির) জন্যই মন—যেমন বিক্ষুব্ধহীন বিশাল জলরাশির নাম সমুদ্র। মনের বা চিত্তের বৃত্তিকে দূর (নষ্ট) করার নাম মনোনাশ। তাই মনের নাশ বলতে স্থির মন বা চৈতন্য। ধারণার অভ্যাসে বৃত্তি-

বিক্ষুব্ধ চঞ্চল মনকে একমুখী ও স্থির ক'রে একটি বস্তুতে বা কেন্দ্রে স্থির করতে হয়। মন স্থির হয়ে একমুখী বা কেন্দ্রগত হ'লে ধ্যান হয়। তারপর মন একেবারে স্থির হয়ে ব্রহ্মসমুদ্রে মিশে গেলে হয় সমাধি। তখন চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্যের মিলন। দুইয়ে একাকার'।

'সমাধি আবার দু'রকম: সবিকল্প, সবিতর্ক বা সবীজ, আর নির্বিকল্প, নির্বিতর্ক বা নির্বীজ। সবিকল্পকে সম্প্রজ্ঞাত ও নির্বিকল্পকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলে। অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ-সমাধিতে কোন সংকল্পের বীজ থাকে না, কিন্তু সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ-সমাধিতে 'অহং'-অভিমানরূপ বৃত্তি বা বৃত্তিলেশ থাকে। তাই নির্বীজসমাধিতে নির্বিকল্প ব্রহ্মের অনুভূতি হয়'।

আমরা প্রশ্ন করলাম: 'ব্রহ্মের অনুভূতি বলতে কি বুঝবো?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'হ্যাঁ, ভালকথা জিজ্ঞাসা করেছ। অনুভূতি বলতে ব্রহ্ম একটি ভিন্ন বস্তু, আর আমরা তার ব্রহ্মানুঅনুভূতি বা জ্ঞান লাভ করি—অনেকে একথাই বোঝে, কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি অনুভব করেন—সেই অনুভবকর্তা থেকে ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুরূপে থাকেন না। ব্রহ্মবিজ্ঞান যিনি বোধে বোধ বলে অনুভব করেন তিনি ব্রহ্ম বা ব্রহ্মচৈতন্য থেকে পৃথক থাকেন না—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।

'ব্রহ্ম বলতে ব্যাপকচৈতন্য বা সর্বানুস্যূতচৈতন্য। এ'সম্বন্ধে তোমরা ঈশোপনিষদের প্রথম 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'—মন্ত্রটি স্মরণ করতে পার। ব্রহ্ম একজন মহান্ ব্যক্তি বা মূর্তিবিশিষ্ট দেবতা নন, তিনি বিশ্বব্যাপক বা সর্বব্যাপক-চৈতন্য। চিৎ, চৈতন্য ও চিতিশক্তি এককথা। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ—যেমন সূর্যের কিরণ ও সূর্য, জল ও জলের তরঙ্গ এক ও অভিন্ন। অনেকে এই মতকে (মতবাদকে) কাশ্মীরশৈবতন্ত্রের অনুযায়ী শিবাদ্বৈতবাদ বলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দু'টিকে অভেদবস্তু

বা অভেদবিজ্ঞান বলেছেন। এই অভেদভাব অদ্বৈতভাবের পরিচায়ক। এ'সম্বন্ধে বিচার দীর্ঘ'।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'মহারাজ, ব্রহ্মবিজ্ঞানের অনুভূতির জন্য মহাবাক্যের বিচার করা দরকার, আর তাহলেই জীব ও ব্রহ্ম যে এক ও অভিন্ন—তা যথার্থভাবে বোঝা যায়। একথা কি সত্য?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'হ্যাঁ, বেদান্তে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যবিচারের কথা আছে। যেমন মনে করো—'তত্ত্বমসি'-মহাবাক্য, অর্থাৎ তৎ বা ব্রহ্মচৈতন্য ও 'ত্বম্' বা জীব (এমন কি জগৎ) উভয়ে বা সমস্তই এক বলতে অভিন্নসত্তাবিশিষ্ট। এখানে 'সত্তা'-বিশিষ্ট বলাও ঠিক নয়, কেননা 'বিশিষ্ট'-শব্দটি বিশেষণের পরিচায়ক, সুতরাং 'সত্তা'-রূপ বিশেষ্য 'বিশিষ্ট'-রূপ বিশেষণের দ্বারা সীমিত হয়। আসলে তা নয়।

আমরা চিত্তার্পিতের মতো শুনছিলাম বিস্ময়ে। বিস্মিত হবারই কথা। গীতায় 'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং, আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ, আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ' (২।২৯),—আশ্চর্য হবার এই লক্ষণগুলি গীতায় বলা হয়েছে। শ্রীধর-স্বামী তাঁর টীকায় বলেছেন: 'অতঃ দুর্বিজ্ঞেয়ঃ এব আত্মা'। তাই অজ্ঞানবিলাসী মানুষ এই দুর্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব সহজে বুঝবে কী করে? আর বোঝেনা বলেই সে বলে ঐসব কথা ঠিক নয়, শাস্ত্রে লেখা আছে মাত্র। কিন্তু চিন্তা করতে হবে যে, শাস্ত্রে বা গ্রন্থে লেখা আছে চিন্তারই বিষয়রূপে ও পরিণতিরূপে। ধ্যানমুখী ও সত্যাসন্ধিৎসু ঋষিরা উপনিষদে সত্যানুভূতির কথা লিখে গেছেন —যেহেতু তাঁরা নিজেদের জীবনে সে'গুলিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই কেবলই উপন্যাস ও গল্পের মতো তাঁরা কথা সৃষ্টি করেন নি, সত্যকে উপলব্ধি করেছেন বলতে সত্যকে দর্শন করেছেন তাঁরা। তাই ঔপনিষদিক তত্ত্বের ও দর্শনের কথা তাঁরা রেকর্ড ক'রে গেছেন। এই রেকর্ডের মৌলিকতা ও সত্যতাই সব'।

'কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পুনরায় মহারাজ বললেন : 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যকে মহাবাক্য বলে কেন—তার কারণ আর কিছুই নয়, যে বাক্যের সাহায্যে মানুষের মিথ্যাজ্ঞান সংশোধিত হয়ে সত্যজ্ঞানের উদয় হয় এবং বহুজন্মসঞ্চিত ভুলধারণা দূর হ'য়ে যথার্থজ্ঞানের প্রকাশ হয় তাকেই মহাবাক্য বা পরমবাক্য বলে। তৎ—ব্রহ্ম ও ত্বম্—জীব, অর্থাৎ একটি মায়ারহিত বা মায়ালেশশূন্য চরম ও অপার্থিব তুরীয়সত্তা, আর অন্যটি মায়াযুক্ত পার্থিব বা phenomenal বা আপেক্ষিক সত্তা। দু'টি সত্তাকে সাধারণদৃষ্টিতে চৈতন্য ও জড় ব'লে প্রতীয়মান হলেও স্বরূপে তারা একটি টাকারই এ'পীঠ ও ও'পীঠ। এই পরিশুদ্ধ যথার্থজ্ঞানের নাম সত্যোপলব্ধি বা ব্রহ্মোপলব্ধি। তৎ এবং ত্বম্-দু'টি বস্তুর পরিশুদ্ধিব অর্থই তাই যে, জন্মজন্মার্জিত বা বহুজন্ম-সঞ্চিত অনির্ধারিত ভুলজ্ঞান বিচারে অন্তর্হিত হয় ও ঐ ভুলজ্ঞান সত্যজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শুক্তিতে রজত বা রূপার জ্ঞান হয় উভয়ের মধ্যে চাক্‌চিক্যের সাদৃশ্য থাকার জন্য, কিন্তু যখন বিচরের সাহায্যে অর্থাৎ সত্যনির্ধারণরূপ বিচারে ঠিক হয় যে, চাক্‌চিক্যরূপ গুণ উভয়ের মধ্যে থাকলেও একই প্রযোজন সিদ্ধ ঐ দু'টি বস্তু দিয়ে হয় না, কেননা তাতে একটি সত্য বা যথার্থ বস্তুর উপর আর একটি মিথ্যা বা অযথার্থ বস্তুর অধ্যাস বা মিথ্যারোপ হয়, আর ঐ মিথ্যারোপের রহস্য আমরা বুঝতে পারি না বলেই উভয়কে এক বস্তু বলে চিন্তা করি, অথচ সেই চিন্তা মোটেই ঠিক নয়—মিথ্যা ও কল্পিত। সুতরাং যখন যুক্তি বা বিচারের সাহায্যে ঠিক হয় যে, মিথ্যা ও কল্পিত সত্তাকে আমরা সত্য ও যথার্থ ব'লে মনে করি বলতে ভুল করি, কিংবা ভ্রান্তি বা ভুলজ্ঞান যখন সত্যবিচারের সাহায্যে দূর হয়, তখন সেই অপসারণকে আমরা পরিশুদ্ধি বলি। তত্ত্বম্'-এর তৎ (ব্রহ্মচৈতন্য) ও ত্বম্ (জীব বা

জড়বস্তু) পরস্পর-বিরুদ্ধস্বভাব, কিন্তু ভুলের জন্য দুটিকে এক বা অভেদ বলি। আসলে স্বরূপে তারা এক ও অভিন্ন হলেও দৃশ্যত ভুলজ্ঞানের জন্য তাদেরকে দুই বা ভিন্ন বলি। এই সত্য নির্ধারিত হওয়ার নাম 'তত্ত্বম্-পরিশোধন'। তত্ত্বম্-এর পরিশোধনে মানুষের মধ্যে সংস্কারের আকারে যে ভুলজ্ঞান থাকে– তার পরিশুদ্ধি হয়। ইংরাজীতে একে বলে correction of error—ভুলের সংশোধন। এই ভুল মানুষের মধ্যে সর্বদাই থাকে, আর ঐ ভুলজ্ঞানের সংশোধন (correction) না হ'লে চিরদিন ভুলজ্ঞান বা ভ্রান্তি থেকেই যায়। তবে যথাযথ ও বারবার বিচার ক'রে ভুলজ্ঞানের সংস্কার যখন সত্যজ্ঞানের সংস্কারের সাহায্যে দূর বলতে সংশোধিত হয় তখনই অদ্বৈতজ্ঞানের উপলব্ধি হয়।

দ্বৈতজ্ঞানের জগতেই 'লীলা', আর অদ্বৈতজ্ঞানে ও সত্যজ্ঞানে 'নিত্য'। নিত্যে যথার্থজ্ঞানের প্রকাশ থাকে। জড় ও চৈতন্য যে পরস্পরে পৃথক—এটি মনে হয় জন্মজন্মসঞ্চিত মনের ভ্রান্তসংস্কারের জন্য। ভুলধারণার সংস্কারই ভ্রান্তি ও বন্ধন। এই ভ্রান্তির বা বন্ধনাবস্থায় বিবেকের আঘাত এলে সদসদ্‌বিচার মনে জাগে, আর এই বিচার জাগ্রত হ'লে জড়বস্তু যে চরমে ও স্বরূপে চৈতন্য– একথাই মনে হয়। তারপর অচেতন পদার্থ যে চেতন বা চৈতন্য এই যথার্থজ্ঞানের প্রকাশ সাধারণভাবে হয় না, অথচ এই জ্ঞান মানুষের মধ্যে স্বভাবত, সর্বদা ও সর্বকালেই আছে, কেবল অনুশীলনের অভাবে অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত থাকে। 'তত্ত্বম্'-পদার্থের পরিশোধনে (নির্ধারণে) ঐ যথার্থজ্ঞানের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়, তাই জ্ঞান ছিল না, পরে জ্ঞানের উন্মেষ বা প্রকাশ হ'ল—এ'কথা ঠিক নয়'।

'তবে কি জানো, প্রকাশস্বরূপ এই জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হ'লে যা সাধারণ ও ব্যবহারিকজ্ঞান সেটাই অসাধারণ ও

পারমার্থিক জ্ঞানরূপে উপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধিকে[২] বলে 'প্রকাশ'। জ্ঞানসম্বন্ধে ব্যবহারিক ও সাধারণ এবং পারমার্থিক ও অসাধারণ শব্দগুলি তাই দৃষ্টিভেদে ও অনুভবভেদে ব্যবহার করা হয়। এজন্য ভেদ বা ভ্রমের সংশোধন (correction of error) দরকার'।

এরপর স্বামীজী মহারাজকে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : 'মহারাজ, আচার্য শঙ্কর বেদান্তদর্শনের (জিজ্ঞাসাধিকরণে) অধ্যাসভাষ্যে বলেছেন যে, ধর্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান দু'টি এক জিনিস নয়, কেননা একটি অভ্যুদয়ফল, আর অপরটি নিঃশ্রেয়সফল : 'অভ্যুদয়ফলং ধর্মজ্ঞানং, তচ্চ অনুষ্ঠানাপেক্ষম্। নিঃশ্রেয়সফলং তু ব্রহ্মবিজ্ঞানং, ন চ অনুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্। ভব্যশ্চ ধর্মঃ জিজ্ঞাস্যঃ ন জ্ঞানকালে অস্তি, পুরুষব্যাপারতন্ত্রত্বাৎ। ইহ তু ভূতং ব্রহ্মজিজ্ঞাস্যং, নিত্যত্বাৎ, ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রম্'।

'ভব্যং' বলতে সাধ্য, আর 'ভূতং' বলতে যা চিরদিন থাকে সেই নিত্যবস্তু। তাছাড়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতির বিষয় বা বস্তু : 'অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ চ ব্রহ্মজ্ঞানস্য'। ব্রহ্মসূত্রের জন্মাদি-অধিকরণে আচার্য শঙ্কর পুনরায় বলেছেন : 'বস্তুতন্ত্রমেব তৎ। * * ভূতবস্তু বিষয়ানাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্। অত্র এবংসতি ব্রহ্মজ্ঞানং অপি বস্তুতন্ত্রমেব, ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ'।

এরপর ব্রহ্মবস্তু কি সে'কথা জিজ্ঞাসা করলে শঙ্করের ভাষায়ই তিনি বল্লেন : 'ব্রহ্ম—'নিত্যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বগতঃ নিত্যতৃপ্তঃ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত-স্বভাবঃ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইতি'। এই শাশ্বত ও নিত্য ব্রহ্মবস্তুর বা ব্রহ্মচৈতন্যের উপলব্ধির নাম মোক্ষ বা মুক্তি। মোক্ষে বা মুক্তিতে মিথ্যাজ্ঞান অজ্ঞান দূর (বিনষ্ট) হয় এবং জীব ও ব্রহ্মের একাত্মজ্ঞানের

২। তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকাশ ও বিমর্শ দু'টি বস্তু আছে। 'প্রকাশ' বলতে সৎ, সত্য, জ্ঞান বা ব্রহ্ম, আর 'বিমর্শ' বলতে অসত্য ও অজ্ঞান।

অনুভব হয়—'মিথ্যাজ্ঞানাপায়স্তু ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ ভবতি'। সে'জন্য 'তত্তু-সমন্বয়াৎ' এই চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর পুনরায় বলেছেন : 'তস্মাৎ ন সম্পদাদিরূপং ব্রহ্মাত্মৈত্ববিজ্ঞানম্। অতঃ ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা। কিং তর্হি? প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়বস্তু জ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্রা'। শঙ্কর পুনরায় বলেছেন : 'ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং তথাপি পুরুষেণ কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম অন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং, পুরুষতন্ত্রত্বাৎ। জ্ঞানং তু প্রমাণজন্যম্। প্রমাণং তু যথাভূতবস্তুবিষয়ম্, অতঃ জ্ঞানং কর্ত্তুং অকর্ত্তুং অন্যথাকর্ত্তুং অশক্যং, কেবলং বস্তুতন্ত্রম্ এব তৎ, ন চোদনাতন্ত্রম্, নাপি পুরুষতন্ত্রম্'। তাই ধ্যান ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ধ্যান মানসব্যাপার বা মনের ক্রিয়া, আর জ্ঞান বিচার-সাধ্য। বিচার বলতে নিত্য কোন্‌টা ও অনিত্য কোন্‌টা—এটি বিচারে স্থির হ'লে নিত্যব্রহ্মবস্তুসম্বন্ধে যথার্থজ্ঞানের প্রকাশ হয়। 'তত্ত্বম্'-মহাবাক্যবিচারের উপকারিতা বা সার্থকতাই তাই যে, এই বিচার মিথ্যাজ্ঞানরূপ অজ্ঞানকে দূর ক'রে সত্যজ্ঞানরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি দান-করে এবং তখনই জীবনে যথার্থ শান্তি ও শাশ্বত আনন্দের উপলব্ধি হয়'।

স্বামীজী মহারাজ ঐ প্রসঙ্গে পুনরায় বললেন : 'আচার্য শঙ্কর ঠিক কথাই বলেছেন। ধ্যান মনের ক্রিয়া, আর জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান নিত্যানিত্যবিচারের পরিণতি না হলেও যথার্থ-উপলব্ধির ফল। ফল বলতে বিচারে ভুলজ্ঞানরূপ অজ্ঞানের আবরণ দূর হয় এবং ব্রহ্মচৈতন্যের জ্ঞান নিজে নিজেই (স্বতঃ) প্রকাশিত হয়। তখন সর্বব্যাপক ও সর্বাত্মক-মহাপ্রাণচৈতন্যরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, তখন ব্রহ্মসত্তা এক ও অভিন্নভাবে সাধকের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। এই আত্মপ্রকাশকেই ব্রহ্মানুভূতি বলে। কিন্তু এই রহস্যময় ও রহস্যাতীত তত্ত্ব স্বয়ংপ্রকাশরূপে পরিচিত হলেও বিশেষ অনুশীলন-সাপেক্ষ ও একান্ত যত্নের ও সাধনার বিষয়'।

তারপর মহারাজ বল্লেন : 'কিন্তু এখানেও একটি প্রশ্ন আসে যে, ব্রহ্মজ্ঞান যদি সকল চেষ্টা ও কর্ম-নিরপেক্ষ বস্তুতন্ত্র অর্থে স্বতঃপ্রকাশিত হয় ও সেজন্য 'তত্ত্বম্'-মহাবাক্যের পরিশুদ্ধি সেই জ্ঞানের নির্ধারণের বা প্রকাশের সহায়ক হয়, তাহলে অদ্বৈতবেদান্তনির্দিষ্ট শ্রবণ-মনন-নিধিধ্যাসন বা পতঞ্জলিনির্দিষ্ট ধারণা-ধ্যান-সমাধির সে' ক্ষেত্রে কোন উপযোগিতা থাকে কি-না? এর উত্তর যে, উপযোগিতা আছে। চিত্তপরিশুদ্ধি ও মনের একমুখীবৃত্তিই ব্রহ্মাবধারণশক্তি সৃষ্টি করে। শ্রবণ-মনন-নিধিধ্যাসন বা ধারণা-ধ্যান-সমাধিতে মন একান্তভাবে ব্রহ্মাবগাহী হয়। এই ব্রহ্মাবগাহী চিত্ত বা জ্ঞানপ্রবাহকে (জ্ঞানধারাকে) 'বৃত্তি' বলা যেতে পারে। তবে এই জ্ঞানপ্রবাহরূপ বৃত্তি একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপকেই উপলব্ধি করায়, আর অন্য কোন বস্তুর দিকে ধাবিত হয না, বা অন্য কোন বস্তুকে নির্ধাবণ করে না। 'ক্ষুবস্য ধারা নিশিত-দূরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ' —এই ব্রহ্মসত্তানির্ধারণের পথ দুর্গম। তাই নিদিধ্যাসনে বা সমাধিতে মনের সকল বৃত্তির অবসান ঘটলে তখন একমাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্রহ্মসত্তানির্ধারণী বৃত্তিই (জ্ঞানমাত্র) অবশিষ্ট থাকে। আসল কথা এই যে, নিদিধ্যাসনের এবং সবিকল্পসমাধিব পর নির্বিকল্পসমাধিতে ব্রহ্মনির্ধারিণী বৃত্তির (মনোবৃত্তির) নাম জ্ঞান, কেননা সর্ববৃত্তিবিহীন মন তখন জ্ঞানে বা চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। সেই নির্ধারণশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানপ্রবাহ এমনই তীক্ষ্ণ ও প্রখব যে, তা ব্রহ্মের যথার্থরূপ, তত্ত্ব বা সত্তা নিরূপণ করতে সক্ষম হয়। এই সক্ষমতারূপ পরিণতির প্রয়োজন হয় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য। তাই 'তত্ত্বম্'-মহাবাক্যের পরিশোধনের বা নির্ধারণরূপ সত্যাবধারণের জন্য বেদান্তের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের, অথবা যোগের ধারণা-ধ্যান-সমাধির প্রয়োজন।

বিজাতীয় বা ভিন্ন বৃত্তিকে নষ্ট ক'রে সজাতীয় বা অভিন্ন

বৃত্তিপ্রবাহকে নিদিধ্যাসন বলে—'নিদিধ্যাসনাত্মিকা বিজাতীয় প্রত্যয়ানন্তরিত সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহরূপা'। মোটকথা একমনে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে ভগবচ্চিন্তা—যার মধ্যে ক্ষণেকের জন্যও অন্য কোন চিন্তা আসে না—তাকেই নিদিধ্যাসনাত্মিকা ভাবনা বলে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, 'তত্ত্বমসি'-মহাবাক্যের পরিশোধনের বা সঠিক নির্ধারণের ফলশ্রুতিরূপে (যদিও তা সত্যকারভাবে ফলশ্রুতি বা ফল নয়, তথাপিও) শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন কিংবা ধারণা-ধ্যান-সমাধির উপযোগিতা আছে ব্রহ্মজ্ঞানাবগতির জন্য। এই উপযোগিতা ব্রহ্মজ্ঞানাবগতির সহায়ক বা আঙ্গিকমাত্র—যেমন আবরণভঙ্গরূপ অজ্ঞানাপসারণের প্রয়োজন হয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির জন্য। আবরণভঙ্গের প্রকৃত অর্থ অন্ধকারের (জ্ঞানালোকের অভাবের) জন্য যেমন কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অন্ধকারের অপসারণের পর আলোকে সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি জন্মজন্মসঞ্চিত অজ্ঞান-সংস্কারের ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান যখন বিচারে ও জ্ঞানালোকে অপসারিত হয় তখনই সেই অপসারণে (আবরণভঙ্গে) ব্রহ্মবস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। ব্রহ্মের এই প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষজ্ঞান সেজন্য স্বতঃপ্রকাশিত ও বস্তুতন্ত্র, কোন যত্নসাপেক্ষ বা সাধনসাপেক্ষ পরতন্ত্র নয়'।

এরপর মহারাজ দীপ্তকণ্ঠে পুনরায় বললেন: 'এজন্য ব্রহ্ম-জ্ঞানাবগতির সহকারী বা সহায়করূপে নিত্যানিত্যবস্তুবিচারের প্রয়োজন। 'তত্ত্বম্'-বস্তুবিচারের প্রয়োজন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বাবধারণে সক্ষম মনোবৃত্তির বা বুদ্ধিবৃত্তির সৃষ্টির জন্য—যদিও সেই মনোবৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি পরিশেষে জ্ঞানে বা চৈতন্যেই রূপান্তরিত হয়'।

এ' কথার পর আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'মহারাজ, এই তত্ত্ব একান্তভাবে কঠিন, মোটেই সহজবোধ্য নয়'।

স্বামীজী মহারাজ হেসে বললেন: 'এজন্যই তো উপনিষদে (কঠোপনিষদে) বলা হয়েছে: 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিত-দুরত্যয়া, দুর্গম্-

পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। দুরধিগম্য বা দুর্গম এই ব্রহ্মতত্ত্ব, সাধারণ মনের ও বুদ্ধির বিচার দিয়ে তা ধরা বা বোঝা যায় না। মনকে তাই সুদৃঢ় ও একমুখী করতে হয়, কেননা একমুখী বা একটিমাত্র পথে পরিচালিত না হ'লে মন তীক্ষ্ণ ও প্রখর হয় না এবং তীক্ষ্ণ বা প্রখর না হলে দুরধিগম্য তত্ত্বের অবধারণে বুদ্ধি সক্ষম হয় না। তাই শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে বা ধারণা-ধ্যান-সমাধিতে স্থূলমনকে প্রথমে সূক্ষ্মে ও তারপর কারণাবস্থায় পরিণত বলতে রূপান্তরিত করতে হয়। মনেব বা বুদ্ধির পরিণতি তখন সত্যাবধারণক্ষম জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। এই সক্ষমজ্ঞানই সমজাতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে মিশে এক হয়— নদীর জল যেমন সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়। এই অবস্থায়ই আসে ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি'।

স্বামীজী মহাবাজ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসে পুনরায় আমাদের লক্ষ্য করে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন: 'এজন্যই জীব কি ও জীবের স্বরূপ কি এবং ব্রহ্ম কি ও ব্রহ্মের স্বরূপ কি— এ'সব তত্ত্ব বারবার বিচার করতে হয়, আর বারবার বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবস্তুর অনুধ্যান বা গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়। তাহলেই সত্যসংস্কারের সৃষ্টি হয় মনে, আর ঐ সত্যসংস্কারই মিথ্যাসংস্কারকে (অজ্ঞানকে) নষ্ট বা দূর করে। আসলে এ'সব কথার সত্যকারের অর্থ কি জানো? এতদিন যাদের মনের ভুলে জড় বলে, অচেতন বলে, অনিত্য বলে ভাবছিলে—সেই ভুলভাবনার তখন অবসান ঘটে। যে দড়িকে ভুলে সাপ ব'লে দেখছিলে, দড়ির জ্ঞান হ'লে সেই মিথ্যাসাপের সংস্কারের তিরোধান (বিলোপ) ঘটে। ব্রহ্মে জীবভ্রম বা জগদ্‌ভ্রমও তাই। ভ্রম বা ভ্রান্তি ভুল কল্পনা বা ভ্রান্তধারণা। ভুলকল্পনা বা ভ্রান্তধারণা দূর হয় সত্যবস্তুর (অধিষ্ঠানের) প্রত্যক্ষ হ'লে। তাই ব্রহ্মের সংশয়বিহীন প্রত্যক্ষজ্ঞান হ'লে মিথ্যাজ্ঞান আর থাকে না, মিথ্যাজ্ঞান তখন সত্যজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। অথবা বলা যায় যে,

ব্যবহারিকজ্ঞান তখন পারমার্থিকজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। এইকথা বা এই তত্ত্ব সার্থক ও সিদ্ধ হয় ব্রহ্মস্বরূপের সম্যক্‌-উপলব্ধি হলে। অনুমান বা কল্পনার কাজ চলতে থাকে ভ্রমের জগতে বাস করলে।

'এখন জিজ্ঞাসা করতে পারো যে, তাহলে ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ কি ? ব্রহ্মজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপক জ্ঞান।[৩] সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপক জ্ঞানে বিশ্বচরাচরের সকল প্রাণী ও পদার্থ, সকল চেতন ও অচেতন বস্তু ব্রহ্মচৈতন্যরূপ মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়ে এক ও অভিন্ন বলে উপলব্ধি হয়। এরই নাম ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞান। জ্ঞান ও বিজ্ঞান এখানে এককথা, পৃথক নয়। এই সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপক জ্ঞান যিনি 'বোধে বোধ'-রূপে উপলব্ধি করেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মবিজ্ঞানী, অন্য কেউ নন। ব্রহ্মকে বা ব্রহ্মজ্ঞানকে জেনে তবেই জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন। এই প্রাপ্তি বা লাভ কোন নূতন বা আগন্তুক বস্তু নয়। এই প্রাপ্তি ও আত্মস্বরূপের উপলব্ধি এক ও অভিন্ন কথা। এই উপলব্ধি হলে তবেই ভেসে ওঠে ব্যষ্টিমনে ও সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিমনরূপ বিশ্বচরাচরে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌'-জ্ঞান। তখনই বিশ্বচরাচরের সকল জনকে বা প্রাণীকে ও সকল-কিছুকে আত্মার আত্মা ও প্রাণের প্রাণ ব'লে প্রতীতি হয়'।[৪]

৩। জ্ঞান বা চৈতন্য। এই চৈতন্যকে মহাচৈতন্য নামে অভিহিত করা যায়। মহাচৈতন্য সিন্ধুচৈতন্য এবং বিন্দুচৈতন্য জীব বা প্রাণী, কিন্তু স্বরূপে বিন্দুচৈতন্য সিন্ধু বা মহাচৈতন্য থেকে পৃথক নয়, এক ও অভিন্ন

তারপর স্বামীজী পুনরায় বল্লেন : 'প্রতীতি হয় তখনই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ববাসীই (মনুষ্য, পশুপক্ষী, পিপীলিকা, তরুলতা

'The inward search for the reality in man, and the inner realization are, therefore, logically incomplete without the outward search, and realization that the same Brahman is the Atman, the Reality **underlying the inner and the outer.** From the earliest times, therefore, we find in the Upanishads the patient causal enquiry into the immutably ground of all changing outer phenomena, and the ultimate discovery of the abiding reality (**sat**) persisting through all changes. The result is summed up by the great dictum : All this is Brahman. The Upanishads prescribe series of meditations on different natural objects as the manifestations of Brahman. For a complete spiritual education of Arjuna, the Gita makes him see God manifested in the different orders of existence in the universe. It says, 'One who has contacted the self through yoga sees, with an equal eye, the self in all beings and all beings in the self.' 'He who sees me (God) everywhere, and sees everything in me, never misees me.' Badarayana in his *Brahmasutra*, Sankara's in his various works and all the major exponents of Sankara's Advaita system carry forward the early tradition, stressing the necessity of realizing Brahman within and without.

'One who has realized the Advaita truth in its fulness experiences can ecstatic expansion of his self, as reported in the Upanishads and later Advaita works : 'One who knows 'I am Brahman', he becomes it all'. 'Knowing this, the sage Vamadeva felt, 'I have become Manu, and also the Sun'. Sankara echoes this utterance of the **Brihadaranyaka** in his **Upadesasahasri**,

প্রভৃতি) আমার কুটুম্ব বা আপনার জন ব'লে। এই অনুভূতির নাম সর্বানুভূতিরূপ ব্রহ্মানুভূতি।[৫] এই সর্বাত্মানুভূতি লাভ করেছিলেন বলেই যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন: 'Love thy neighbour as thyself' –'তোমার সকল প্রতিবেশীকে আপনজন ব'লে ভালবাস'। প্রতিবেশী বলতে বিশ্বপ্রতিবেশী বা বিশ্বচরাচরের সকল জন—সকল প্রাণী'।

পরে স্বামীজী মহারাজকে আমরা আবার প্রশ্ন করলাম: 'মহারাজ, শোনা যায় যে, যে মহান্ ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরানুভূতি লাভ ক'রে আপ্তকাম ও আত্মতৃপ্ত, তিনি আবার অপর সকলকে ভালবাসবেন কেন? তাঁর তো আর-কিছুই কর্তব্য ও অকর্তব্য

in which the enlightened soul exclaims, 'I am all-pervasive (**sarvagata**).' His great follower, Vidyaranya, describes in his famous book of Advaita realization, how the world of objects (**visaya**) reflects. to a person who has realized Brahman, the infinite joy (*ananda*) that Brahman is.

'It should be clear, therefore, that the complete and integral Advaita discipline must be both inwards and outwards. But if we remember that the inner and outer are only physical images applicable literally only to the world of distinctions, we must also say that ultimately this discipline culminates in a 'unitary experience which 'knows neither the outer, nor the inner'. So it can be said that those who think of Advaita as an inward withdrwal do not get at even half the truth.'

৫। এই সর্বানুভূতিরূপ ব্রহ্মানুভূতির অন্য নাম বিশ্বরূপদর্শন—যে দর্শন লাভ করেছিলেন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পাণ্ডববীর অর্জুন।

(করার ও না-করার কোন বস্তুই) থাকে না, সেজন্য নিজের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ লাভ ক'রে তিনি নিজে ভরপুর ও আপ্তকাম থাকেন, জগতে আর অন্য-কিছুই তাঁর করার (কারুর জন্য কিছু করার) থাকে না, আর সেজন্য তিনি বাইরের সকল কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত থাকেন ?'

স্বামীজী মহারাজ একটু হেসে বললেন : 'বেশ কথা বলেছ। তাহলে বলতে চাও যে, আপ্তকাম জীবন্মুক্তপুরুষ কর্মের ও কর্তব্যের সংসারে থেকে প্রাণহীন পাথরের মতো নিশ্চেষ্ট থাকেন ? এ'সব তো নিছক অলস ও ফাঁকীবাজীদের কথা।

'তাই জেনে রাখো যে, যিনি নিজের মধ্যে পরমবস্তুর সন্ধান পান, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে সর্বত্রই পরমবস্তুর প্রকাশ দেখেন।[৬] তিনি দেখেন 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'। কিংবা 'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি····সর্বত্র সমদর্শনঃ'। তখন সকলকে তিনি 'অভেদেনে পশ্যতি'। তিনি নিজের মধ্যে পরমজ্ঞান পান, আর কোথাও পান না—একথা উপলব্ধির কথা নয়, ববং যাঁরা নিজের মধ্যে পরমবস্তুর সন্ধান পেয়ে তার আস্বাদন সকলকে দান করেন, দিতে কার্পণ্য করেন না, তাঁরাই যথার্থ জীবন্মুক্ত জ্ঞানীপুরুষ। জানবে যে, যিনি নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে পেয়েছেন—তিনি বিশ্বের সকল-কিছুর মধ্যেও ঈশ্বরকে পেয়েছেন। তাঁর জীবন হয় তখন 'পরহিতায় পরকল্যাণায় চ' উৎসর্গীকৃত জীবন —যাকে বলে dedicated life. তাছাড়া তিনি তখন dynamic activity-র (জ্বলন্ত কর্মশীলতার) প্রতিমূর্তি ! তাঁর জীবনের আচরণ ও আচরিত সকল কর্মই হয় তখন বিশ্বের প্রতিটি মানুষের ও প্রাণীর কল্যাণের জন্য। তাঁর জীবন হয় তখন বিশ্বে উদাহরণ-স্বরূপ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এজন্যই বলেছেন যে, শ্রেষ্ঠ ও মহান্ ব্যক্তিদের জীবনাচরণ বা জীবনকর্ম সর্বসাধারণের অনুসরণযোগ্য।

৬। ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত এ'প্রসঙ্গে লিখেছেন :

তারপর স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'মোটকথা আপ্তকাম জীবন্মুক্তের নিজের জন্য কিছু করার ও পাওয়ার জিনিস না থাকলেও সকলের ও সর্বজীব-নারায়ণের সেবার জন্য তিনি কাজ করেন—

'Sankaracharya systematized logically the earlier monistic ideas, and founded the regular Advaita school. Though he distinguished the world of finite, transitory and relative objects from the immutable, infinite and absolute reality, called Brahman, he distinguished the former also from the subjective world of dreams and hallucinations, and also, of course, from the bitterly unreal objects like the son of a barren woman. The world was, for him, a manifestation of Brahman, and grounded in Brahman. Taken in this philosophical perspective, the world points to its ground **(adhisthana)**; its values can be, and should be, utilized and re-organized for the attainment of Brahman, the absolute value **(paramartha)**. The instrumental values alone can lead to the ultimate value. It is through the world that Brahman can be attained. Sankara's life and teachings reflect, therefore, the interal outlook in which the transitory and the immutable, the infinite, the means and the end are logically integrated in a system of ascending grades of reality and value, in which social organization **(loka-sangraha)** also had an important place. This outlook is aptly named by K. C. Bhattacharya as 'spiritual realism'.........

'It is found thus that, except for some occasional mispresentations during periods of decadence, Advaita Vedanta tries to give due importance to the outer life in the world, as to the inner life; it is not a philosophy of one-sided withdrawal alone. As Ramana Maharshi, the great Advaita saint of recent times,- whose sole teaching was "Know thyself used to say, 'Absolute is the self of the cosmos and of every being. Therefore by seeking his self, by the constant investigation, who am I ?,

যেমন করেছিলেন গৌতম-বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং এ' যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবন্মুক্ত ও আপ্তকাম মহাপুরুষদের জীবন সকলের জন্যই উৎসর্গীকৃত বা dedicated জীবন'।

স্বামীজী মহারাজ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২২-২৩ শ্লোকটি আবৃত্তি ক'রে পুনরায় বললেন—

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যম বর্ত্ত এব চ কর্মনি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মন্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্তানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥'

'শ্রীকৃষ্ণ বলেছন, ত্রিভুবনে আমার আর কিছুমাত্র কর্তব্যকর্ম নাই। আমার অপ্রাপ্ত বস্তু ও প্রাপ্তব্য বস্তুও কিছু নাই। তবুও আমি কর্মে প্রবৃত্ত হই ও হ'য়ে আছি। তাছাড়া আমি যদি নিশ্চেষ্ট ও আলস্যযুক্ত হয়ে কখনও কোন কর্মের অনুষ্ঠান না করি তবে নিশ্চয়ই মানুষ সর্বদা আমরই নিষ্কর্মতার ও আলস্যের পথকে অনুসরণ করবে, এবং কর্মের সংসারে কর্ম না করে সকল কর্ম থেকে বিরত থাকবে— যা অন্যায় ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ'।

এইকথার পরও স্বামীজী মহারাজ পুনরায় বল্লেন : 'শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিশ্চেষ্ট অর্জুনকে যুদ্ধকর্ম থেকে বিরত দেখেই এ'কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন (৩।২১ শ্লোকে) : "যদ্‌যদাচরতি

---

it is possible for a man to realize his identity with the Universal Being'. "Since we saw that Being is one, we ascribe full reality to the world, and what is more, we ascribe full reality to God; but by saying that three are three (i. e., individual, world and God) you give only one-third reality to the world, and you give only one-third to God.'

শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ' প্রভৃতি। গীতাভাষ্যে আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর বক্তব্যও তাই। তাঁর ভাষ্যের তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : "আমি ভগবান—এই আমার কথাই ভেবে দেখ। আমি নিষ্কাম ও কর্মাতীত, আমার কোন-কিছুই পাওয়ার ও দেওয়ার বস্তু জীবনে নাই। ত্রিভুবনে সকল-কিছুকেই আমি সৃষ্টি করেছি, সকল-কিছুই আমার করতলগত, কিন্তু তথাপিও বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য আমি কর্ম করি, আমি নিশ্চেষ্ট ও কর্মবিহীন নই। আমি যদি কর্ম না করি, তবে আমার নিশ্চেষ্টতার অনুসরণ ক'রে পৃথিবীর আর কোন মানুষই কর্ম করবে না। সুতরাং মানব-কল্যাণের জন্য কর্ম করাতে অবহেলার জন্য মানুষ অকর্তব্যরূপ পাপভাগী হবে—যা আমার পক্ষে লক্ষ্য করা অসহনীয়। 'মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ'—পৃথিবীর সকল লোক মহান্ ব্যক্তির কর্ম, কর্তব্য ও পরহিতায় ও সর্বহিতায় চরিত্রকেই অনুসরণ করে'।

'তাই দেখা যায় যে, যাঁরা যথার্থজ্ঞানী, আপ্তকাম ও আপনাতে আপনি চিরসন্তুষ্ট—তাঁরা কখনও কোনদিন জীবনে নিশ্চেষ্ট ও কর্মহীন থাকেন না। তাঁদের জীবন পূর্বাপেক্ষা বরং আরও কর্মচঞ্চল হয়। সকল মানুষের বা সকল প্রাণীর জন্য তাঁদের করুণার দৃষ্টি সর্বদাই প্রসারিত থাকে। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য—কি ধনী ও কি নির্ধন—সকলের উপরই তাঁদের করুণা ও সহানুভূতি সর্বদাই বর্ষিত হয়। সুতরাং তোমরা যে বলছো—যে মানুষ নিজের মধ্যে সেই পরমবস্তুর সন্ধান পান—তিনি সংসারের সকল কাজ ও কর্তব্য থেকে বিরত থাকেন—এ'কথা ঠিক নয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে ভিতর ও বাহির দুইই সমান। তিনি সর্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করেন।

'তাই শুধু সকল মানুষই নয়, সকল প্রাণী ও বস্তু—চেতন ও অচেতন এবং সকলের দিকেই তোমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হোক। সকলকে

আপনার থেকে আপনার ব'লে তোমরা ভালবাসো। তাই পূর্বেই বলেছি এবং এখনও বলি যে, বিশ্বব্যাপক অর্থাৎ সর্বব্যাপক ও সর্বাত্মক এক ও অখণ্ড জ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের অনুভূতির নাম ব্রহ্মানুভূতি। এই জ্ঞান ও জ্ঞানের অনুভূতি ভিন্ন নয়—এক ও অভিন্ন – 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। 'ভবতি'-ক্রিয়াপদ এখানে অর্থবাদ, অর্থশূন্য, কেননা জ্ঞান ও জ্ঞানের অনুভাবক উপলব্ধির পর নিজেকে ব্রহ্ম থেকে এক ও অভিন্ন মনে করে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

এরপর স্বামীজী মহারাজ সস্নেহে বললেন: 'এবার ধ্যান করো এই পরমতত্ত্বটি। গহন-গভীর এই তত্ত্ব, কিন্তু একান্ত অনুশীলনে এই তত্ত্বের দ্বারও উন্মুক্ত হয়, আর উন্মুক্ত হয় বলেই একান্তে নিভৃতে যোগীরা ও জ্ঞানীরা ব্রহ্মতত্ত্বকে জানার চেষ্টা করেন—'তাই যোগী ধ্যান করে, হয়ে গিরিগুহাবাসী'। স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) সেজন্য সেই এক অরূপ বা রূপাতীত তত্ত্বের প্রসঙ্গে বলেছেন—

'এক, রূপ-অরূপ, নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কালহীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি, বিরাম যথায়'। প্রভৃতি

'সেখানে সকল-কিছুরই শেষ বা বিরাম, আছে একটি মাত্র তত্ত্ব, একটিমাত্র জ্ঞান,—'অবাঙমনসগোচরম্'— বোঝে প্রাণ বোঝে যার'।

অভেদানন্দ মহারাজ তারপর আবেগের সঙ্গে বল্লেন: 'আরও পরিষ্কার ক'রে বোঝার জন্য বলি—ব্রহ্ম বৃহৎ বলতে সর্বানুস্যূত ও সর্বব্যাপী চিৎ, চৈতন্য বা চৈতন্যসমুদ্র—যার কূলকিনারা নাই। সকল বস্তু—চেতন ও অচেতন – তাঁর মধ্যে রয়েছে বা ভাসছে। সবারই ভিতরে ও বাইরে—internally and outwordly—চৈতন্য বা চিৎসমুদ্র—'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ'—আকাশ, বায়ু বা ইথার যেমন সকল-কিছুর ভিতরে ও বাইরে থাকে—তেমনি

সকল-কিছুর ভিতরেও বাইরে আছে চৈতন্যসমুদ্র। সীমাহীন অনন্ত ও বিশাল সমুদ্রের জল শত-সহস্র কলসীতে বা পাত্রে থাকলেও সকল কলসীর বা পাত্রের জল যেমন এক সমুদ্রেরই জল—তেমনি সকল জীবে ও বস্তুতে অর্থাৎ বিশ্বচরাচরে যে চৈতন্য প্রাণ বা মহাপ্রাণরূপে আছে তা এক ও অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যই। কলসী বা পাত্র আধার—নাম ও রূপ দিয়ে তৈরী, কিন্তু নাম ও রূপ ভেঙে দিলে আধারের আধারত্ব আর থাকে না, তখন কেবল শূন্য। এই শূন্য বা মহাশূন্য কিন্তু চৈতন্যে পরিপূর্ণ। এই সর্বব্যাপী ও সর্বাধার, ব্যাপক চৈতন্যই ব্রহ্ম। এর বৃহৎব্যাপকতা আছে বলেই ব্রহ্ম'।

'এক একটি প্রাণী ও পদার্থ ব্যষ্টি, আর সকল প্রাণী ও পদার্থকে নিয়ে সমষ্টি। যেমন এক একজন মানুষের মধ্যে এক একটি মন —ব্যষ্টিমন, আর সকল মানুষের মনকে নিয়ে—সমষ্টিমন। সমষ্টি-মনের নাম অব্যক্ত বা অব্যাকৃত-প্রকৃতি। অব্যক্ত-প্রকৃতিতেই সৃষ্টির বীজ থাকে, আর সৃষ্টির বীজকে নিয়েই বীজময়ী প্রকৃতি সার্থক। বীজময়ী প্রকৃতিকে মহামায়া বলতে পার, কারণ এই মহাপ্রকৃতি অব্যাকৃতি থেকেই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি, আবার প্রলয়ে বিশ্বচরাচর ঐ মহাপ্রকৃতি অব্যাকৃতিতেই লয় হয়। লয় হয় অর্থে বীজাকারে অব্যক্ত থাকে। সাংখ্যকার কপিল বলেছেন কার্য ও কারণ, আর কার্যের নাশ বলতে কার্যের কারণরূপে থাকা। সর্বানুস্যূত ব্রহ্ম বা ব্রহ্মচৈতন্য মহাপ্রকৃতিরও আধার বা অধিষ্ঠান। ব্রহ্মচৈতন্যে কিন্তু সৃষ্টি নাই, স্থিতি নাই—প্রলয় নাই। ব্রহ্মচৈতন্য সকল-কিছু কার্য ও কারণের অতীত। গীতার নবম অধ্যায়ে ৬—৯ শ্লোকে এর আভাস দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ—

> যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
> তথা সর্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।

*　　　*　　　*

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥
ন চ মাং তানি কর্মানি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং হেতু কর্মসু॥

শ্রীধরস্বামী টীকায় সৃষ্টি ও লয়-সম্বন্ধে বলেছেন: 'ত্রিগুণাত্মিকাং মায়ায়াং লীয়ন্তে, পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে অহং তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি। ....সা চ আপ্তকামত্বাৎ মম নাস্তি'। সর্বক্রিয়ার ও বিকারের অতীত ব্রহ্মে সৃষ্টি-প্রলয়াদি কার্য নাই। ব্রহ্ম অসঙ্গ ও উদাসীন। এখন চিন্তা করো—সেই সর্বাতীত অথচ সর্বানুস্যূত ব্রহ্ম-সম্বন্ধে ধারণা করা কত কঠিন।

ব্রহ্ম-সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য তাই বলি যে, মনে করো বিশাল জলাশয়ে আমরা সকলেই যেন এক একটি ঘট। ঘটের ভিতরে জল, আবার বাইরেও জল। মোটকথা জলে জল সর্বত্রই। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'।

তাছাড়া আর একটা উদাহরণ দি। মনে করো আমরা সকলেই মীণ বা মৎস্য, আর মীণ বা মৎস্যরূপে সকলেই সেই বিশ্বচৈতন্যরূপ মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছি। ঐ মহাসমুদ্রেই আমাদের জীবন ও মৃত্যু—স্থিতি ও নাশ। মীণ বা মৎস্যরূপ আমাদের শরীর মহাসমুদ্রে সীমা সৃষ্টি করে, আবার শরীর ভেঙে গেলে বা নষ্ট হলে শরীরহীন বলতে সীমাহীন বা উপাধিহীন হয়। তখন কেবলই সমুদ্র জলে একাকার। এই সমুদ্র বা চৈতন্যের সমুদ্রকে জানার নামই জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। এটি উপলব্ধির বস্তু! বোধি বা জ্ঞান দিয়ে জানতে হয়। মন ও বুদ্ধি এখানে অক্ষম ও পঙ্গু, কেননা মন এবং বুদ্ধিও সীমাযুক্ত ও অপূর্ণ। ব্রহ্মই একমাত্র পূর্ণ বা পরিপূর্ণ চৈতন্য—যার

আদি নাই, অন্ত নাই, কেবলই অসীমচৈতন্য। ধারণা করো এই চৈতন্য বা মহাচৈতন্যকে। চৈতন্য-বিন্দু, আবার চৈতন্য-সিন্ধু। আমাদের সকল-কিছু বস্তু বা পদার্থের মধ্যে ঐ চৈতন্যের বিন্দু নিহিত, কিন্তু সম্যক্-উপলব্ধি হ'লে ঐ বিন্দুই সিন্ধু—'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'। ঊর্ধ এবং অর্ধ পূর্ণ। মোটকথা সমস্তই পূর্ণ, অনন্ত ও অখণ্ড। বেদান্ত এই অখণ্ড ব্রহ্মকে বলে একমেবাদ্বিতীয়ম্। এক ব্রহ্মে পাছে দুইয়ের ধারণা আসে, সেজন্য বলা হয়েছে অদ্বিতীয় অর্থাৎ দুই নয়—এক ; আবার একও নয়—দুই ও একের অতীত। আমার 'ট্রু-সাইকোলজি'-বইয়ের Our Relation to the Absolute-অধ্যায়ে এ'সকল কথা বলেছি। এই তুরীয়চৈতন্য বা মহাচৈতন্য কিন্তু মহাশূন্য (Void) নয়। এই শূন্য সৎ, অস্তি বা কিছু-আছে—যা প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির বিষয়। উপনিষৎ তাই বলেছে—'অস্তিত্যেব উপলব্ধব্যম্'—'ব্রহ্মকে অস্তি বা সত্তা বলেই জানবে'। এই সত্তা—সৎ, চিৎ—প্রকাশ ও আনন্দ—প্রিয় এর অর্থ যেটা থাকে, তারই প্রকাশ, আর প্রকাশ হলেই আনন্দ—অস্তি, ভাতি ও প্রিয়।

স্বামীজী মহারাজ হাসিমুখে আবার বল্লেন: 'এখন অনুভব করো ব্রহ্ম কি ও ব্রহ্ম কাকে বলে। আসলে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির বস্তু। এই উপলব্ধির নামই ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মতত্ত্বোপলব্ধি। এখানে ব্রহ্ম ও জ্ঞান—ব্রহ্মতত্ত্ব ও তার উপলব্ধি এক ও অভিন্ন, ব্রহ্মের জ্ঞান বা ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি নয়। ব্রহ্মই জ্ঞান, ব্রহ্মই উপলব্ধির স্বরূপ। এখন তাই বলি যে, এর চেয়ে ভাল ক'রে ব্রহ্মসম্বন্ধে বা ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে আর কি উপদেশ দেবো বলো?

স্বামীজী মহারাজ তারপর বল্লেন: 'ব্রহ্মের বিচার একান্ত সহজ ও সরল নয়। অজ্ঞানের মধ্যে বাস ক'রে অজ্ঞান ভ্রম নয় একথা বোঝা কঠিন। বিচারের ক্ষেত্রই অজ্ঞানের বা ভ্রমের ক্ষেত্র। অজ্ঞানী মানুষই বিচার ক'রে অজ্ঞানের বা ভ্রমের পারে যাওয়ার

জন্য। মানুষই বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য বিচার করে। সে বিচার করে—আমি স্বরূপত অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষ মায়াবদ্ধ জীব নই, কিন্তু শিবঁ বা ব্রহ্ম। এই বিচার বারবার করতে হয়। বারবার অদ্বৈত-অভিজ্ঞান নিয়ে বিচার করলে দ্বৈতজ্ঞানরূপ অজ্ঞান বা ভ্রম দূর হয়। অজ্ঞান বা ভ্রম দূর হয় বলতে জীব ও ব্রহ্ম—তুটি সত্তা যে পৃথক নয়—এক, আর অজ্ঞান থাকার জন্য তুই তুই জ্ঞান বলতে ভুলজ্ঞান হয়—এ' তত্ত্ব বোঝা যায়। এই বোঝার নামই সত্যনির্ধারণের পর জ্ঞান, আর সত্যনির্ধারণের জন্য জ্ঞানের মধ্যে আর কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস থাকে না—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'। এর নাম নিঃসন্দিগ্ধ অদ্বৈতজ্ঞান। তখন Flash-এর মতো হঠাৎ বা অকস্মাৎই জ্ঞান হয়। যেমন সাঁতার শিখতে শিখতে বারবার ডুবে জল খায়, কিন্তু হঠাৎ একবার সাঁতার দিয়ে দূরে চলে যায়; যেমন সাইকেল শিখতে শিখতে বারবার পড়ে যায়, কিন্তু হঠাৎ একবার কৃতকার্য হয়, সে'রমক ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি হঠাৎ বা অকস্মাৎ হয় বলতে অনুভূতিরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ছিল নিজের মধ্যে সুপ্ত, কিন্তু হঠাৎ তার বিকাশ বা প্রকাশ হয় Flash-এর মতো। পূর্বেই বলেছি যে, এগুলি প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির বিষয়, কেবলই কথার কথা নয়। যারা কেবলই বিচার করে উপলব্ধিকে বাদ দিয়ে, তাঁদের কাছে যথার্থতত্ত্বের প্রকাশ হয় না।

॥ স্মৃতি : সাত ॥

এই আলোচনার নির্দিষ্ট তারিখ নেই, তবে মনে হয় ১৯৩৬ বা ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে হবে। স্বামীজী মহারাজ কলকাতায় নিজের অফিস-ঘরটিতে এসে বসলেন। আমরা পূর্ব থেকেই তাঁর আসার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছিলাম। তিনি এসে উপস্থিত হ'লে আমরা উঠে দাঁড়ালাম ও তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। তিনি নিজে চেয়ারে বসেমেঝেতে পাড়া মাদুরের উপরআমাদের বসতে বল্লেন ও জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কেমন আছি। আমরা ভাল আছি জানালে তিনি হেসে বল্লেন: 'ভাল আছ—তা কেমন ভাল আছ?' আমরা বল্লাম: 'আজ্ঞে—ভালই আছি'। স্বামীজী মহারাজ পুনরায় হেসে বল্লেন: 'তা তো জানি, কিন্তু ভালথাকা তো নানান রকমভাবে হয়, হয় শরীরে—নয় মনে। শরীর অসুস্থ না হয়ে সকল দিক থেকে সুস্থ থাকতে পারে, কিন্তু মনে হয়তো অসুস্থ থাকতে পারে। মনে অসুস্থ থাকার অর্থই মনে নানান চিন্তা-ভাবনা, অর্থাৎ মন শান্ত। কোন নয় বৈষয়িক ব্যাপারে মন হয়তো চিন্তিত, শান্তি নাই মনে। তাই বলছি—ভাল বা সুস্থ তোমরা কোন্‌দিক থেকে, শরীরে—না মনে?'

আমরা সকলেই তখন একটু অপ্রকৃতিস্থ, নির্বাক ও স্থির। ঠিক কি উত্তর দেব তা ভেবে উঠতে পারিনি। স্বামীজীকে তামাক দেওয়া হ'ল। তিনি হুঁকোর নলটি মুখে দিয়ে বল্লেন: 'তবে শরীর ও মনের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ, কেননা শরীর অসুস্থ থাকলে মন স্বভাবতই সুস্থ থাকে না; আবার মন অসুস্থ ও চঞ্চল হলে, বা মনে কোন দুশ্চিন্তা থাকলে শরীরও ভাল থাকে না। তাই ঠিক ঠিক ভাল বা সুস্থ থাকা হ'ল শরীর ও মন উভয়েরই সুস্থ থাকা'।

আমরা স্বামীজী মহারাজের কথায় সায় দিয়ে বল্লাম : 'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

মহারাজ একটু হেসে বল্লেন : 'না, অতো সহজে আজ্ঞে হ্যাঁ বল্লে হয় না। তোমরা আমার কথার ঠিক অর্থ বোধহয় ধরতে পারছো না। আসলে কথা কি জানো?—মন ও শরীরের মধ্যে সম্বন্ধটা নিবিড়—সেকথা তো বলেছি, কিন্তু স্বভাবতই চঞ্চল ও নানান কর্মে ও বিষয়ে ব্যস্ত বলে মন চিন্তাযুক্ত ও অসুস্থ থাকে। তাই চেষ্টা করতে হবে মনকে শান্ত ও সর্বদা চিন্তামুক্ত করতে। মন সর্বদাই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, তাই মনকে বিষয়ছাড়া নির্বিষয় করার জন্য চেষ্টা করতে হয়। এই চেষ্টা করার নাম অভ্যাস বা যোগ। ঋষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে যত্ন বা চেষ্টা করাকেই অভ্যাস বলেছেন—'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ'।[১] অবশ্য এ'সব কথা আমি অনেকবার পূর্বেও তোমাদের বলেছি। তবে আবার বল্লেও ক্ষতি নেই, কেননা 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রনাম্,'—শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম বোঝার জন্য বারবার পড়া ও আলোচনা করার উপকারিতা আছে'।

আমরা মহারাজের কথায় সম্মতি জানালে তিনি পুনরায় বল্লেন: 'মনটাই আসল। মনের বাসনা বা ইচ্ছাই বাইরে বাস্তব-আকারে প্রকাশিত হয়। 'স ঐচ্ছৎ'—ঈশ্বর (সগুণ-ব্রহ্ম) ইচ্ছা করলেন—তিনি এক আছেন, বহু হবেন। অমনি অর্ধনারীশ্বররূপে প্রথমে তাঁর প্রকাশ হ'ল। তারপর বহুরূপে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি হ'ল। কথাই তাই যে, বাসনা বা ইচ্ছার প্রকাশ হয় প্রথমে মনে, তারপর বাইরে কার্যাকারে তার প্রকাশ হয়। তাই বিকাশের নিয়ম হ'ল প্রথমে কারণাকারে,

১। পাতঞ্জলদর্শন ১।১৩
যে যত্নের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা হয়, সেই যত্নে সেরূপ অনুষ্ঠানে তৎপর থাকার নাম অভ্যাস।

তারপর সূক্ষ্মাকারে, তারপর বাইরে বা বহির্জগতে স্থূলাকারে প্রকাশ হয়। প্রকাশের নামই অভিব্যক্তি, অর্থাৎ যা সুপ্ত বা অব্যক্ত আকারে ভিতরে (মনের মধ্যে) ছিল—তাই পরে জাগ্রত বা ব্যক্ত-আকারে বাইরের জগতে প্রকাশ পেল। সাংখ্যকার কপিল এ'কথাই বলেছেন। এর নাম সৎকার্যবাদ্—অর্থাৎ যা সৎ-রূপে অব্যক্ত ছিল, তাই আবার সৎ-রূপে ব্যক্ত হ'ল বা বাইরে প্রকাশ পেল। ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শন একথা মানে না, তারা অসৎকার্যবাদী। অসৎকার্যবাদীদের অভি মত হ'ল—যা কার্যাকারে স্থূলভাবে বাইরের জগতে প্রকাশ পায়, তা পূর্বে অর্থাৎ সৃষ্টির বা প্রকাশের পূর্বে ছিল না। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে আছে যে, অসৎ থেকে সতের সৃষ্টি হয়েছে—'অসতঃ সজ্জায়তে'। এই অসতের অর্থ শূন্য বা কিছু নেই নয়, এই অসতের অর্থ অব্যক্ত-প্রকৃতি—যা থেকে বিশ্বসৃষ্টি হয়। অব্যক্তপ্রকৃতি আর অব্যাকৃতি এককথা। অব্যাকৃতিই গুণময়ী মহামায়া এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীর যোগমায়া'।

নিঃশব্দে আমরা সকলে স্বামীজী মহারাজের কথা একমনে শুনছি। মহারাজ ব'লে যেতে লাগলেন: 'প্রকৃতির আর এক নাম বিরাট বা বিশ্বমন—Cosmic Mind—যার মধ্যে প্রলয়ের পর বিশ্বচরাচরের সমস্ত প্রাণী ও পদার্থের সূক্ষ্মসংস্কার বীজাকারে সুপ্ত থাকে। এই সূক্ষ্মসংস্কারের নাম প্রাণবীজ। বিরাটমনই প্রকৃতি, আবার হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা। কিংবা বিরাটমনের দু'টি রূপ: এক ঈশ্বর—যিনি মায়ার অধীশ্বর এবং অন্যটি হিরণ্যগর্ভ—যিনি মায়ার অধীন। এ'দুটিকে বেদান্তে কারণব্রহ্ম ও কার্যব্রহ্ম বলে। এদের উর্ধে কারণ বা মহাকারণের নাম তুরীয় বা মায়াবিরহী বিশুদ্ধ-ব্রহ্ম। এখানে মায়া থাকে না বলে মনও (ব্যষ্টি ও সমষ্টি-মন) থাকে না, আর মন থাকে না বলে সৃষ্টির ইচ্ছা এবং সৃষ্টিও থাকে না। মানুষের মনের কথাও তাই'।

আমাদের মধ্যে একজন স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'মানুষের মন ও ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের মন—মন তাহলে কি দুটি ?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'মন দু'টি নয়, তবে দু'টি বলে কল্পনা করি আমরা। যেমন শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রভৃতি। একটিকেই দুটি ব'লে আমার ভাগ করি লোকব্যবহারের জন্য। দুটির ধারণা থাকে বলেই বাস্তব বা ব্যবহারিক জগৎ। দুইয়ের ধারণা যেখানে নাই—তা অখণ্ড বা অখণ্ডতার রাজ্য। নদীর জলস্রোত একটিই, কিন্তু একটি লাঠি দিয়ে তাকে দু'ভাগ করলে হয় এ'দিকের জল এবং ও'দিকের জল। বিরাট ও সর্ববিস্তারী শূন্যতা বা আকাশ একটাই, কিন্তু ভালোর ও মন্দের ধারণা দিয়ে তাকে ভাগ ক'রে বলি স্বর্গ ও মর্ত্য। তাই মনেই সব। মনেই শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা। মনেই পুণ্য ও পাপ'।

স্বামীজী মহারাজকে তামাক দেওয়া হ'ল। তিনি সস্নেহে ও সহাস্যে আমাদের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বল্লেন : 'এই দেখ—একই মনুষ্যজাতি। তাদের মধ্যে কেউ অশান্ত ও অস্থির, আবার কেউ শান্ত ও স্থির। সংসারে এ' দু'রকম লোকই দেখবে। সংসারের ভাল-মন্দ পরিবেশের জন্য মানুষের মনের অবস্থা ও বাইরের আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। সংসারে বা সমাজে যাকে তোমরা সাধারণ-মানুষ বলো, অন্য পরিবেশে ও দৃষ্টিতে কিছুদিন পরে আবার তাকেই দেবমানুষ বলবে। কেন বলতো ? চরিত্র ও ব্যবহারের জন্য। সাধারণ মন নিয়ে সাধারণ-মানুষ, আবার অসাধারণ পবিত্র মন নিয়ে অসাধারণ বা দেবমানুষ। অতি সাধারণভাবেই তোমাদের কাছে এ'কথা বল্লাম, নইলে সাধারণ সংসারী-মানুষের পক্ষে দেবমানুষের স্তরে উন্নীত হ'তে জীবনে অনেক কাজ করতে হয়। অনেক কাজ করতে হয় বলতে চঞ্চল ও অব্যবস্থিত মনকে স্থির-ধীর ও সংযত ক'রে পবিত্র ও দিব্যজীবনের স্তরে উন্নীত হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত হতে

হয়। সকল-কিছুই চিন্তার ও কাজের ব্যাপার। উন্নত বা সংযত এবং পবিত্র চিন্তা ও কাজের দ্বারা সাধারণমানুষই দেবমানুষের স্তরে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন সৎচিন্তা ও জীবনের সৎকাজ বা ব্যবহারই মানুষকে দেবতায় পরিণত করে'।

স্বামীজী মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বল্লেন: 'তোমরা আমার ঠিক একথা বুঝতে পারছ না ব'লে মনে হচ্ছে। কথা কি জানো? গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন: 'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ' প্রভৃতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন: 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগভয়ক্রোধঃ' বা 'বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি' (২।৬১) প্রভৃতি। অর্থাৎ স্বার্থের বিষয়ভোগের বাসনা ত্যাগ ক'রে যিনি আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন; ভয়, দুঃখ ও দ্বিধাগ্রস্ত মনকে সংযত ক'রে সর্বদা আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, ইন্দ্রিয়সকলে আসক্ত না হয়ে সংযত মন দিয়ে সংসারে সকল কাজ সন্তুষ্টচিত্তে করেন, তিনিই প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান ও সংযত, অন্যথা সকল বিষয়ে অসন্তুষ্ট ও চঞ্চল মানুষ জীবনে দুঃখ ও অশান্তিই ভোগ করে। তাই বলছি যে, মন নিয়েই কথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে'কথাই বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন: 'আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি' (২।৬৪), অর্থাৎ মনের পরিবর্তে আত্মায় বা আপনাতে চিরসন্তুষ্ট (প্রসন্ন) থাকলে জীবনে শান্তি ও প্রসন্নতা লাভ করা যায়। শান্তি ও প্রসন্নতা লাভ করলে জীবনে সকল দুঃখ-কষ্টের অতীত হওয়া যায়—'প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে' (২।৬৫)। আর তখনই বিবেক-বিচারযুক্ত হয়ে মানুষ স্থির ও শান্ত হয়—'প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে' (২।৬৫)। মোটকথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি বাইরের ইন্দ্রিয়ের ইঙ্গিতে পরিচালিত হলে মন সংযত হয় না, ফলে জীবনে শান্তি নষ্ট হয়। আত্মার বা নিজের শান্তস্বরূপে ধ্যানচিত্ত হ'লে তবেই শান্তি, নইলে

ইন্দ্রিয়সকল মানুষকে বিপর্যস্ত ও পাগল করে। কঠোপনিষদে তাই আছে: 'পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণোৎ স্বয়ম্ভূ, পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্'। 'খানি' বলতে ইন্দ্রিয়ানি বা ইন্দ্রিয়সকল সর্বদা মানুষের মনকে বাহ্য বা বাইরের ভোগের সৌন্দর্য্যে ও বিষয়েই আকর্ষণ করে, ফলে শাশ্বত আত্মার চিন্তা, ধ্যান ও দর্শন থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। সেজন্য সংযত-ইন্দ্রিয় হতে হয়, আর সংযত-ইন্দ্রিয় হতে গেলে মনকে সুসংযত করতে হয়। মনই রশ্মি বা লাগাম, আর ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব, দেহ-রথকে ইন্দ্রিয়েরাই চালিয়ে নিয়ে যায়। তাই লাগাম বা রশ্মিরূপ মনকে সংযত করলে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বেরাও সংযত হয় এবং মন তখন আত্মায় স্থির ও ধ্যানমুখী হয়। গীতার ও কঠোপনিষদের বর্ণনা একটু ভিন্ন রকমের হলেও সত্যকারের তাৎপর্য বা অর্থ এক।

'তা হলেই ছাখো', স্বামীজী মহারাজ বল্লেন, 'সেই এককথা যে, মনই সব। মনে শান্তি ও মনেই সুখ ; মনেই অশান্তি ও দুঃখ— 'আশাহি পরমং দুঃখম্, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্'। নৈরাশ্য অর্থে এখানে disappointment নয়, না চাওয়ার এবং কোন-কিছু পাওয়ার আশা ও আকাঙ্খা না থাকা। মোটকথা প্রতিদানের প্রত্যাশা করলে যদি না পাওয়া যায়, তবে দুঃখ, আর পাওয়া গেলে সুখ। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ একদিক থেকে ভালকথাই বলেছেন : 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ' (২।৩৮)—সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করাই ভাল, তাতে নৈরশ্যের ও দুঃখের ভাব কমে যায়। গীতায় একথাও বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ : (১) 'যোগস্থং কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়, সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে' (২।৪৮)। 'যোগস্থং' বলতে শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী দু'জনেই বলেছেন : 'যোগং পরমেশ্বরৈকপরতাং তত্র স্থিতঃ সন্'—ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রেখে ও ঈশ্বরকেই সকল কর্মের নিয়ন্তা ও কর্তা ভেবে জীবনে কর্ম করা উচিত, আর 'যোগ' বলতে সমত্ববুদ্ধি অর্থাৎ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান

জ্ঞান করা ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আর একটি কথা বলেছেন যে, সকল কামনা ত্যাগ ক'রে নিস্পৃহ ও নিষ্কাম হওয়া চাই, তাহলেই 'আমার আমার'-রূপ মমত্ববুদ্ধি বা মমতা ও 'আমি'-অভিমান থাকে না, আর তখনই মনের যথার্থ প্রশান্তি, অন্যথা অশান্তি, নৈরাশ্য ও দুঃখ'।

আমরা বল্লাম: 'মহারাজ, ভাষ্যকারের দিব্যচক্ষু নিয়ে এ' যেন নূতন ক'রে গীতার উপর আপনার আলোকপাত করা হচ্ছে'।

স্বামীজী মহারাজ হেসে বল্লেন: 'তা বাবু, আমরাও তো শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় কম-কিছু সত্যের সন্ধান পাই নি! তাঁর কৃপায় আমাদের সকল আশাই পূর্ণ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: 'স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি' (২।৭২)। মৃত্যুকালেই বা কেন বলো, জীবনকালেই তো শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদে ব্রহ্মজ্ঞানের আশীর্বাদ আমরা পেয়েছি'।

আমরা বল্লাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি তো আপনার 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে সে'কথার উল্লেখই করেছেন'।

আমাদের কথায় বাধা দিয়ে স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গশিষ্যরা হোমাপাখীর দল, সকাল বেলার তোলা মাখন, আউলের দল প্রভৃতি কথা তো শ্রীশ্রীঠাকুরই অনেকবার বলেছেন'।

'যাক্ সে'কথা। মনের কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। যোগবাশিষ্ট-রামায়ণে বশিষ্টদেব মনকেই জগতের অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ ও কর্তা বলেছেন। তাইতো তোমাদের বলি যে, তোমরাও মনজয়ী হও। মনের পারে গিয়ে মনকে ও সকল ইন্দ্রিয়কে যিনি পরিচালনা করেন—সেই আত্মাকে জানো। আত্মাকে জানার অর্থ আত্মার যে অবিনশ্বর ও সর্বাতীত রূপ—তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করা। তবে হ্যাঁ, আত্মা বা আত্মচৈতন্য সর্বাতীত, আবার সব-কিছুতেই অনুস্যূত। জ্ঞানময় আত্মা সকলেরই প্রতিষ্ঠা, অথচ আত্মার প্রতিষ্ঠা আর কিছু

নাই। আত্মাকে জানতে গেলে মনের ও বুদ্ধির পারে যেতে হয়। এই মনের পারে ক্যামন করে যেতে হয় তার সন্ধানই তো ঋষি পতঞ্জলি অপরূপভাবে পতঞ্জলদর্শনে দিয়েছেন। আর সন্ধান দিয়েছে বেদান্ত। বেদান্ত বলতে অদ্বৈতবেদান্ত। বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে মনের পারে যাওয়ার জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা বলেছেন। ঋষি পতঞ্জলি ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা বলেছেন মনকে জয় করার জন্য। মনকে জয় করার অর্থ মনকে মেরে ফেলা বা শূন্য করা নয়, মনকে চৈতন্যে রূপায়িত করা। অবশ্য এ'সব কথা আমি পূর্বে অনেকবারই তোমাদের বলেছি। তবে এখনও বলি ঐসব কথা বা রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। মনে স্মরণ করলেই হাতেনাতে করার ইচ্ছা জাগে। মনে ইচ্ছার উদয় হলেই তাকে জীবনে উপলব্ধি করার চেষ্টাও আসে। চেষ্টাই সাধনা, আর সাধনাই পরে সিদ্ধির আশীর্বাদ নিয়ে আসে।

'আসলে কথা কি জানো?' স্বামীজী মহারাজ বল্লেন, 'তোমরা শোন, আবার পড় ও জানো অনেক-কিছু শাস্ত্র থেকে বা গুরুজনদের মুখে, কিন্তু সত্যকারভাবে অনুষ্ঠান করো কই? তোমরা সংসার ছেড়েছ (স্বামীজী মহারাজ আমাদের মধ্যে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের লক্ষ্য করেই বল্লেন), কিন্তু অনেক সময়ে ভুলে যাও জীবনে উদ্দেশ্যের কথা। এলে একটা তীব্র-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু মঠে ও আশ্রমে কিছুদিন থাকার পর সব-কিছু উদ্দেশ্যেই ভুলে গেলে। তার কারণ কি জানো? তার কারণ হ'ল যথার্থ ত্যাগ ও বৈরাগ্য কাকে বলে—তা তোমরা বোঝার চেষ্টা করো না। ত্যাগ তো কেবল বাড়ী-ঘর ত্যাগ, মাতাপিতা ও স্বজন-পরিজন-ত্যাগ করা নয়, বাসনাত্যাগই আসল ত্যাগ জীবনে। বাসনাকে ত্যাগ করার অর্থ মন থেকে ভোগের বাসনা ত্যাগ করা। ঐ আবার সেই মনের প্রসঙ্গই

এসে পড়লো। আচার্য শঙ্কর ও অন্যান্য আচার্যরা যথার্থ-অধিকারীর কথা বলেছেন। এমনকি শাস্ত্রপাঠ—কিংবা বেদান্তপাঠের সময়েও ঐ একই অধিকারীর প্রশ্ন আসে। শাস্ত্রের বিষয়বস্তু বোঝার যাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য আছে—তারাই অধিকারী। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথেও তাই। তোমবা হঠাৎ আবেগের বশে হয়তো বাড়ী-ঘর ছাড়লে, কিন্তু মনে বিচার, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য না থাকার জন্য বাড়ী-ঘর ছেড়েও সাধু-সন্ন্যাসী হবার সার্থকতাসম্বন্ধে জানলে না, ফলে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে শৈথিল্য ও অনিচ্ছা সৃষ্টি হলো। তখন জীবনের লক্ষ্যেও ব্যতিক্রম দেখা দিল। তখন যেন-তেন-প্রকারেন গৈরিকবসন লাভ ক'রে 'সন্ন্যাসী' নাম ও গেরুয়াকাপড় নেওয়াই যেন তোমাদের অনেকের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণই হ'ল যে, মনে তোমাদের যথার্থই ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সংস্কার সৃষ্টি হয়নি, অথচ সংসার ত্যাগ করলে। সুতরাং তখন লোকদেখানো ত্যাগ ও বৈরাগ্য জীবনে বিফলতায় পর্যব্যসিত হ'য়'।

আমরা তখন সকলেই নির্বাক ও নিস্তব্ধ। মনে হ'ল কারু কারু মুখে যেন একটু বিমর্ষের ভাব লক্ষ্য ক'রে কিছুক্ষণ চুপ করে মহারাজ করুণাপূর্ণভাবে বল্লেন: 'তা বলে আমি সবাইকে অনধিকারী বা অবৈরাগ্যবান বলছি না, তবে অনেকের মধ্যে বা কারু কারু মধ্যে সেটাই সাধারণত লক্ষ্য করি। তাই পূর্বের প্রসঙ্গ তুলে আবার বলি যে, মনেই পাপ—মনেই পুণ্য, মনেই বন্ধন ও মনেই মুক্তি। মনকে তাই স্থির ও দৃঢ় করতে হয়। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে এসে কাপড়কে রঙিন করাটাই বড় কথা নয়, মনটাকেই আসলে ত্যাগের ও বৈরাগ্যের রঙে রঙাতে হয়। জীবনে তবেই সার্থকতা ও সাফল্য। জীবনদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরদৃষ্টির জাগপ্রদীপ জীবনে জাগিয়ে তুলতে হয়। গীতায়, উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে সেকথাই আছে। রামপ্রসাদ বলেছেন: 'জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না'।

জ্ঞানের বিচার সর্বদাই করতে হয়, তবেই মন ঠিকঠিকভাবে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের রঙে রঙিয়ে ওঠে'।

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে স্নেহভরে তিনি বল্লেন: 'তোমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে আশ্রয় নিয়েছ, সুতরাং ভয় কি? তবে মন ও মুখ এক ক'রে sincerity-র সঙ্গে জীবনে চেষ্টা করা চাই। জীবনে ত্যাগ ও বৈরাগ্য চাইবে, করুণাময় বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীঠাকুর অবশ্যই তা পূর্ণ করবেন। তবে মনে রেখো জীবনের উদ্দেশ্যের কথা। একদিকে স্মরণে রাখবে, আর অন্যদিকে দৃষ্টি রাখবে করুণামূর্তি ও ক্ষমাসুন্দরমূর্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি। তাহলেই বেচালেই পা পড়তে দেবেন না তিনি। ঐ সেই কথা —'জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর রূপ ছাখো না'। ব্রহ্মময়ীর করুণাদৃষ্টি সর্বদাই তাঁর সন্তানদের উপর রয়েছে, কিন্তু সন্তানদেরও কর্তব্য মা-র মুখের দিকে চাওয়া। মা-র করুণার প্রতি লক্ষ্য রাখলে তাবেই কৃপালাভ ও সিদ্ধি'।

স্বামীজী মহারাজ সস্নেহে পুনরায় বল্লেন: 'যন্‌ সাধন, তন্‌ সিদ্ধি', অর্থাৎ সাধনার অভ্যাস না করলে জীবনে সিদ্ধি লাভ কোন সময়েই ও কোন ক্ষেত্রেই হয় না। এই ছাখো না—লণ্ডনে ও আমেরিকায় থাকতে আমায় অনেক কাজ করতে হয়েছে—ক্লাস করা, লেকচার (বক্তৃতা) দেওয়া প্রভৃতি। তাছাড়া সেখানকার বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংস্থায় আমাকে যোগদান করতে হ'ত। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের বাণী ও আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্ম-জীবনের আদর্শের কথা বলতে হ'ত। কত আগ্রহের ও একাগ্রতার সঙ্গে ঐ দেশের সকলে শুনতেন। নানান রকমের প্রশ্ন করতেন তাঁরা ভারতের ধর্মের, দর্শনের ও অধ্যাত্মজীবনের তত্ত্ব ও রহস্য জানার জন্য। নিরলসভাবেই কাজ ক'রে যেতাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ ক'রে। কর্মের সংসারে তাই কর্ম করতে হয় কর্মের কৌশলকে জেনে। ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখাই সেই কর্মকৌশল।

এরপর আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'মহারাজ, ওদেশে প্রতিদিন আপনাকে কটা ক'রে ক্লাস করতে হ'ত ও বক্তৃতা দিতে হ'ত?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'তা কি আর আজ গণনা করে সেই সবের হিসাব দেওয়া যায়? তবে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে সকল রকম কথা ও আলোচনা শোনার জন্য ও'রা বিশেষ আগ্রহী ও উৎসাহী থাকতেন। ধর্মের, ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ও বিশেষ ক'রে যোগ প্রভৃতি আলোচনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়-ব্যাপার-সম্বন্ধেও অনেক কথা বলে ও লিখে জানাতেন আমাকে—যদি কোন সলিউসন (সিদ্ধান্ত) আমার কাছ থেকে পায় তারা। আসল কথা কি জানো—ওঁরা আমাকে এমনইভাবে ভালবেসে-ছিলেন ও নিজের ক'রে নিয়েছিলেন যে, ওঁরা ভাবতেন আমি ওঁদের দেশের ও পরিবারেরই একজন লোক। মিষ্টার ওয়েলডন টমাস তাঁর **America Hinduism Invades গ্রন্থে একথাই বিশেষ করে লিখেছেন।**[১]

১। Colorado Springs Telegraph' পত্রিকা (24th September 1901) স্বামী অভেদানন্দের পাশ্চাত্যের কার্যাবলী সম্বন্ধে উল্লেখ করে লিখেছিল:

'Swami Abhedananda is a native of Calcutta, India, and he has stopped off in Colorado Springs for a few days, en route to New York from the Pacific coast. Guests at the Antlers surveyed him with curiosity this morning, his black skin and his manner betokening nationality.

'He is not a missionary, he says, but a lecturer and has been in this country four years. His lectures on Hindo religion and philosophy have been given at Carnegie Hall New York and it is possible he may arrange for a lectur Colorado Springs. He is to be the guest of Louis R. F স্বামী dinner to night. যে একটি

'Swami Abhedananda is a fluent talker and h address. He has given deep study to the subjects philosophy and religion. He is a friend of Attorney this city and may spend several days here. This r went to Manitou and will make the trip up Pike's befo 'I don't know how long I will be in Colorade Spr Swami Abhedananda at the Antlers this morning, 'but I shall have something to say: Just now, I must go tc nded the

—*COLORADO SPRINGS TELE* Biology,
September 24th 1901

ঠিক এভাবে 'নিউইয়র্ক-টাইমস্' পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল :

"Swami Abhedananda, the young Hindu who has since last Septembar lecturd tri-weekly in this city, yesterday spoke on 'Sin and Sinners', in the regular place of meeting, Mott Memorial Hall, 68, Madison Avenue, at 3 P. M. He said that the belife in sin and sinners was a hindrance to realizing the unity of the individual soul with God. This belife, he said, implied a cruel, merciless Father operating against His children. The idea of sin and sinners was illogical and unseientific. Does it appeal to reason, he asked, that one is a sinner by birth-right and must suffer for another's fault ? "What thou thinkest thou shalt become" was quated, and it was asserted that he who thinks always he wicked will become wicked.

There was great danger in thinking one's self eternally separate from God. As long as this idea existed there was no hope of the great end of all religions, which was the realization of the human soul with the universal Sprit or God. If our innate nature be sinful, then there was no hope of our salvation, and we could never exist as sinless. No power in the universe eould change the nature of a being without destroying the thing itself. So-called 'Sin' was only imperfect knowledge, and dis-appeared when true knowledge came.

It was a great wrong to call men sinners. They were children of immortal bliss. The spirit was divine, 'Sins' would be burnt out, the moment a spark of true knowledge lighted up the understanding, now covered with ignorance. Instead of seeing good and evil, virtue and vice, a sage saw God in and through everything.

ও সাThe lecture was closely listened to by an audience which
দেবের বাণী the hall, and was followed by questions and answers.
bhedananda has the advantage of a remarkably winning
জীবনের আy and the ability to make interesting abstract philoso-
ects relating to religious life. He wears the robe of an
সঙ্গে ঐ দেrder of religious teachers of India, a gown and sash of
colour and a turbrn of light orange colour.

ভারতের ধর্মে

নিরলসভাবেই

সংসারে তাই

প্রতি দৃষ্টি রাখ

—NEW YORK TIMES

March 21, 1898".

॥ পরিশিষ্ট ॥

পরিশিষ্টে পাঁচটি বিষয়ের কিছু কিছু অংশ সংযোজিত হ'ল নিদর্শন স্বরূপ যে, কীভাবে অসংখ্য কর্মব্যস্ততার মধ্যে লিপ্ত থেকেও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিত্তালয় প্রভৃতির আমন্ত্রণ গ্রহণ এবং সকল শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন :

(১)

নিউ-ইয়র্কের কলম্বিয়া-বিশ্ববিত্তালয়ের অধ্যাপক জ্যাক্সন, মনীষী ম্যাক্স-মূলার-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য স্বামী অভেদানন্দকে কলম্বিয়া-বিত্তালয়ে আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন :

"My dear Mr. Abhedananda,,

This note brings you kind greetings, and I wish to know whether you would say a few words about Max Mullar in relation to Hindu Philosophy at a memorial meeting to be held at Columbia University. November 7th at 4-30. Several of the philosophical and psychological profemors will speak. The address must be confined to three or four minutes. I thought it would be pleasant to hear from you as a native Hindu. Max Mueller's death is certainly to be regretted. Awaiting to hear from you. With best wishes,

A. JACKSON
Columbia University
New York, October 21, 1900"

(২)

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লার্ক-বিশ্ববিত্তালয় (উরচেষ্টার, মাস) থেকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে ঐ বিশ্ববিত্তালয়ের সভাপতি জি. ষ্টান্লি হল যে একটি প্রশংসা পত্র দিয়েছিলেন তার নকল এখানে দেওয়া হল :

"CLARK UNIVERSITTY
Worcester, Mass.
Summer School.

This certifies that Swami Abhedananda has attended the Clark University Summer School of Psychology, Biology,

Pedalogy, and Anthropology during the two weeks session, July 13—26, 189).

This certificate is granted to those only who have attended a minimum of four hours daily work during the two weeks.

(SFAL) Sd/- G. Stunly Hall
President."

(৩)

মাননীয় জে. ক্যানিডিস হল হাডসন, এন. ওয়াই থেকে ৩০শে মে, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে উত্তর দিয়েছেন স্বামীজী মহাশয়ের সুন্দতাপূর্ণ পত্র পেয়ে। মিঃ জে. ক্যানিডিসের উত্তরটি হ'ল—

Hudson, N. Y.
May, 30, 1908.

"My dear Swami,

Your very much appreciated letter was received day before yesterday. I was a little bit surprised to learn that you were in London, but pleased and gratified to your success with the new branch you are establishing there. Yet you know joy and happiness is almost invariably mingled with sorrow and disappointments. I am sorry and disappointed because of not having you with us a few days this Spring and Summer. We had looked forward to such a visit from you with many bright anticipations for the further advancement of Truth in this vicinity.

Sometimes, Swami, I think that Truth is of 'awful slow growth.' No doubt but that I am impatient, but when I see the world of humankind as it appears to me, is a perfect pandemonium of inconsistencies ; graft and greed, selfishness···all of this in a jumbled mass, I feel like I can imagine Jesus must have felt when he wept over Jerusalem. Absolute unselfishness

seems to be a jewel rarely possessed and seldom found. It must be the secrot of real greatness, yet it seems to find little place in this greedy world of ours.

I have been mailing you a lodge paper of the Knights of Pythias which I am getting out for them as their official paper, but you have not received it, I know, because of being in England. We have named it. 'The Pythian News', published monthly, and we have received several complimentary notices through the press regarding the publication. I am mailing you the June number under seperate cover. I think that I shall be in a position to do much good through this chanel.

With reference to the new secret and fraternal order which we are founding. I cannot now recall exactly what I wrote you about it, hence, may repeat to a certain extent.

Masonary being founded (so supposed) upon the building of king Solomon's. Temple (that house not made with hands, eternal in the Heavens). Odd Fellows upon the friendship existing between David and also the story of the good Samaritan. Knights of Pythias upon the friendship which existed between Damon and Pythias where one was willing to give his life for another to the tyrant Dionysius, etc., but this new order is and will be founded upon the teaching of that humble Nazarene, Jesus of Nazareth. A great, grander, purer, nobler basic foundation could not be conceived of for this mad commercial Western civilization of ours.

We have now over forty members, many of them among the wealthiest people of Hadson. All of the secret or monitorial work seems to devolve upon me to frame, and I have only just finished the first degree, First Degree, or motto of first degree is 'HUMILITY' Second degree 'WISDOM' and third degree...

I have a new born ideas, and that is that we have you to give a leceure to this order in particular, the public in general of the life and teachings of Jesus. I am confident that with

such a theme to lecture on, we could secure a hall large enough to accommodate the numbers who will attend.

But I will write something about secular affairs. We are making quite an improvement upon our home, and for the last two months I have been labouring with carpenters, painters paper hangers, fence builders, etc. You would scarcely recognize our little home now. We have about remodelled the entire building inside and out, and now enjoy the pleasure of sitting out on a large and spacious piazza extending nearly all round the building. My colour Scheme is green and white for the outside painting on the house.

I will write Dr. Clymer as per your request. Now Swami, you must write me again real soon, else I may feel slightly inclined to give you a good and well deserved scolding.

With love and best wishes from—

Fraternally yours,
J. Canidies Hall."

(৪)

মাননীয় আলফ্রেড টমসন ডেট্রয়ট থেকে (৩১শে এপ্রিল, ১৯১৩) স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে পত্র দিয়েছেন ডেট্রয়টে অনুষ্ঠিত ন্যাসান্যাল নিউ থট এ্যালায়েন্সের অধিবেসনে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে :

"The National New Thought Alliance
Annual National Conference, Detroit.
318, Woodward Avenue, April 31st, 1913.

"Mr. Swami Abhedananda.
West Cornwall, Conn.
Dear friend and Truth,

Acting under the advice of Mrs. Rose M. Ashby, of Atlanta Ga, I have the pleasure herewith to you a cordial invitation

to attend the next annual convention of the National New Thought Alliance, to be held in Detroit during the week beginning Sunday, June 15th, with the Detroit New Thought Alliance as our host.

This year's convention should achieve higher results for the aims and missions of the National New Thought Allionce than previous conventions, whatever they may have done and good as they have been. More attention will be given to the practical side of New Thought personal, organic and field activities ; better financial arrangements for carrying out the purpose of the Alliance ; the two international conventions, that proposed for London in 1914, and the one to be held in San Francisco in 1915, and other matters of general importance to the spirftual, practical constructive interesting of the New Thought, will give distinction to Detroit progress.

You will understand without specific statement here, that the New Thought people of Detroit will do all things possible in the way of entertainment and amusement for the convention visitors. Detroit is justly famous and beautiful city, and as this session of the convention is to be held at the ideal time when the beauty, fragrance and songs of June are glorifying the world a period of pleasant associations and joyful recreation is guaranteed।

An invitation like unto this is being sent to the following well-known New Thought leaders :

Dr. Cha, Brodie Patterson, Edward Markham, Ella Wheeler Wilcox, Ds. Orison Swett, Marden, Ralph Waldo Trine, Julia Seaton Sears, Leander Edmund Whipple, Rexford Jeffries, Helen Van Anderson-Gordon, B. Fay Mille, Horase Fletcher, Jas. A. Edgartton, Rev Lucy. C. McGee, Mrs. Florence Willard Day, Walter Devoe, Villa Folkner Page, Mrs. Mary, R. T. Chapin, Eva Augusta Vasellius, Mrs. Sophia Ven Marter, Mrs. Sara. A Clemene, Bishop Oliver. D. Sabin. Rev. R. J. Floody, May Wright Swall, Rev. Mabel McCoy Irwin, Clara Bewick Colby,

Rev. DeWitt Van Dorem, Rev. R. Heber Newton, Helen Rhodes-Wallace, William Towne, Elizabeth Towne, Kate Atkinson-Boehme, Lillian whitting, Miss, Gertrude. Hall, R. C. Dauglass, Allico Herring Christopher, Leila Simon, Henry Frank, Rose, M. Asby, J. M. McGonigle, Dr. R. Swinbern Slymer, Swami Abhedananda, Prof. S. A. Weltmrr ; Willam Walker Atkinson F. G. Northrop, Cr. E. H. Partt, Grace, M. Brown, Fanny. B. James, Mona Brooks, Charles Filmyre, Annie Rix Milt, Dr. John Milton Scott, Chrustion D. Larson Henry Harrison Brown, Dr. A. Lindsey, Ida Mansfield Wilson, T. Harry Gaze Henry Victor Morgan, Rev. Albert C. Grier, Agnee Taylor and others

If you know some one included above to whom invitation should be sent will you kindly advise me of the fact giving name and address ?

Your presence and participation in the Detroit convention will add greatly to the value and success of the same, and the Alliance will therefore esteem it an honour to have so able and distinguished a worker as you yourself take part in its deliberations and pleasures.

Your notice of acceptence of this invitation, with the title of your subject for an address of average length, will be greatly appreciafed.

In closing, allow me to urge the sending of your answer at as early a dete as possible.

Yours very truly,
Alfred Tomson"

(৫)

আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিস্‌ট্রিক্ট কলম্বিয়ার 'দি ন্যাসানাল-জিওগ্রাফিক সোসাইটি'-র সম্পাদক ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে ঐ সোসাইটির সভ্যভুক্ত ক'রে যে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন তার নকল উদ্ধৃত হ'ল :

"THE NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Through the Board of Managers at a meeting held in Washington District of Columbia in the United States of America on the second day of February 1910 has elected Swami Abhedananda of New York City a member of that Society.

In Witness Whereof, this certificate has been

Sd/
Secretary"

॥ স্মৃতি : আট ॥

স্বামী অভেদানন্দের সব-কিছুই ছিল নিয়মানুবর্তিতার ভিতর গাঁথা—systematic, আর সকল কাজই তিনি করতেন ঠিক ঘড়ির কাঁটার নির্দেশের মতো। দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা ঐ নিয়মের ধারা মেনে তিনি চলতেন, এতটুকু ব্যতিক্রম হ'তে দেননি কোনদিন। তবে কি বলবো যে, তিনি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র-স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না, সময়ের একান্তভাবে দাস ছিলেন? তাই বা কেন, যিনি তাঁর প্রেমময় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে জীবনে কঠোর সাধন ক'রে দেশ-কালের তথা মায়ার পারে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি কি কখনও সময়ের দাস হতে পারেন। অনিয়মের পূজক আমরা তাই কতো জল্পনা-কল্পনাই না করেছি যে, নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকার অর্থই আত্মস্বাধীনতাকে বিসর্জন দেওয়া। আমাদের সেই সিদ্ধান্ত আমরা জানিয়েছিও কতো সময়ে কতভাবে স্বামীজী মহারাজকে এবং সেই জিজ্ঞাসার জন্য উত্তরও পেতাম শিক্ষার কশাঘাতে।

একদিনের কথা! স্বামীজী মহারাজের জীবনযাপনপ্রণালী-সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে আমরা তুলনা ক'রে বসলাম জড়যন্ত্রের সঙ্গে। কোন-কিছুকে দিবারাত্র ঘড়ির কাঁটার মতো মেনে চলার অর্থই নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে নিয়মতান্ত্রিকতার হাতে বলি দেওয়া। আমাদের এই বিজ্ঞমন্তব্য শুনে স্বামীজী মহারাজ একদিন হেসে বলেছিলেন: 'তোমাদের মতো পরাধীন জাতির পক্ষেই কেবল এ'সব কথা বলা সম্ভব। স্বাধীনতার গন্ধ অনেক দিন তোমরা ভুলে গেছ, তাই সময় ও নিয়ম মেনে চলাটা হ'ল তোমাদের কাছে পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল। বলিহারি যাই তোমাদের বুদ্ধি, যুক্তি ও সিদ্ধান্ত'।

তারপর অন্তরে যেন একটু বেদনার ভাব নিয়ে বলেছিলেন: 'শুধু ব্যক্তিবিশেষের কেন, সমগ্র জাতির পক্ষে নিয়মানুবর্তিতাই

হ'ল একমাত্র বেঁচে থাকার লক্ষণ। মেরুদণ্ডহীন মৃতপ্রায় জাতিরাই কেবল নিয়ম ও শৃঙ্খলতাকে না মেনে যথেচ্ছচারিতার ও কুঁড়েমির প্রশ্রয় গ্রহণ করে। বিশৃঙ্খলতা কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকতার কঠোয় পড়ে না। যে জাতি পৃথিবীতে বড়, সেই জাতিই দিয়েছে চিরদিন নিয়মানুবর্তিতার সম্মান আসলে তোমরা নিজেদের আদর্শই হারিয়ে ফেলেছ, তাই বিশৃঙ্খল এলোমেলো জীবনযাত্রা তোমাদের কাছে সাবলীল ও স্বচ্ছ ব'লে মনে হয়। আসলে এটাই কিন্তু যে পরাধীনতা ও দাসত্বের বড় একটা চিহ্ন তা' তোমরা এখনো বুঝতে পারোনি। জীবনে নিষ্ঠা ও সংযমের ভাব নিয়মানুবর্তিতা থেকেই আসে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে গেলে তার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়, তবেই গড়ে ওঠে সুসংযত ও সুশৃঙ্খল জীবন, আর কর্মের সংসারে চলার পথও হয় সুষ্ঠু ও সচল'।

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি পুনরায় বল্লেন: 'তোমাদের ভিতর অনেকের নাকি ধারণা যে, সাধু-সন্ন্যাসী যখন, কোন-কিছুর অধীন হওয়ার অর্থই মায়াতে আবদ্ধ হওয়া; সুতরাং মায়া ও বাধ্যবাধকতাকে যত বেশী এড়ানো যায় জীবনে— ততই মঙ্গল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয় তার বিপরীত। অনেকে কোন-কিছুর দাস বলতে অধীন হওয়া বোঝায়, কিন্তু অজ্ঞাতসারে কুঁড়েমির কাছে আত্মসমর্পণের দাসখৎ লিখে দিতে তারা পশ্চাৎপদ হয় না। এটা মনে রাখবে যে, নিয়মানুবর্তিতা না থাকলে সুসংযত জীবনের গঠন কোনদিনই সম্ভব হয় না।

অনেকের মধ্যে আরো একটা ধারণা আছে যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি যত বেশী হয়, সাংসারিক সকল বিষয়ে অন্যমনস্কতা ততই কমে যায়। কিন্তু এ'ধারণাও একেবারে ভুল। দৈনন্দিন জীবনে কোন-কিছু ভুলে যাওয়ার অর্থই হ'ল মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতার আশ্রয় নেওয়া। কাজেকর্মে ভুল হওয়া কোনদিনই সংযমের ও উন্নতির লক্ষণ

নয়, বরং তাতে অবনতির ভাবই সৃষ্টি হয় জীবনে। আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ ও নিস্পৃহা বলতে নিঃস্বার্থ ভাব জীবনে আদরণীয়, কিন্তু ভুলে যাওয়া বা অন্যমনস্কতা স্নায়বিক ও মানসিক দুর্বলতারই নামান্তর। অধ্যাত্মজীবনের যারা সত্যকারের পথিক, তাঁদের বৈষয়িক সকল বিষয়ের উপর যেমন আঁট থাকে, তেমনি থাকে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কর্মের উপর। মন থেকে তাই মুছে ফেলা দরকার অহংকারের ভাব। অহংভাব, অহংজ্ঞান, অহংকার, স্বার্থপরতা সব এককথা। অহংভাবে ডুবে থাকার অর্থই কুঁড়েমির প্রশ্রয় দেওয়া স্বার্থপরতার আশ্রয় নিয়ে। স্বার্থপরতার ভাবকেও তাই তাই মুছে ফেলতে হয় মন থেকে। জ্ঞানীরা স্বার্থগন্ধহীন পুরুষ।

কিন্তু পাশ্চাত্যে কি পুরুষ, কি মেয়ে, কি ছেলে সকলেই কর্মকুশলতার ও সংযমের এক একজন জ্বলন্ত মূর্তি। নিয়মানুবর্তিতার উপর তাদের কী অটুট নিষ্ঠা! তাদের দেখে সত্যই জীবনে আনন্দ ও উৎসাহ হয়। আর তোমরা কেবল বসে বসে মাথায় বড় বড় মতলব আঁটছ, মুখে বড় বড় কথা, কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। না আছে কিছুতে তোমাদের নিষ্ঠা, না আছে আত্মসংযম ও বিশ্বাস, আর না আছে জীবনে প্রেরণা ও উন্মাদনা। সারা দেশটা দেখছি যেন paralysed (পক্ষাঘাতগ্রস্ত) হয়ে ঘুমিয়ে আছে। তাই এখন থেকে সময়ের পূজো করতে শেখো। সময়ের পূজো করার অর্থই তোমাদের নিজেদের জীবনের মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি সচেতন হওয়া। এক সেকেণ্ডের জন্যও তাই কখনো সময়ের অপব্যবহার করবে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জানবে ধীরে ধীরে অনন্তের মধ্যেই মিশে যাচ্ছে, একবার গেলে আর তারা ফিরে আসে না। সেজন্যই বলি যে, জীবনে সময়ের সদ্ব্যবহার করো, এতটুকুও কুঁড়েমির প্রশ্রয় দেবে না। ক্ষণস্থায়ী জীবন, আজ আছে কাল নাই। গীতায় ও উপনিষদে তাই

সংসারকে 'অশ্বত্থ' বলে বর্ণনা করেছে। অশ্বত্থগাছ আজ আছে কাল নাই—পরিবর্তনশীল জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তাই কাজে লাগাতে হয়, তাতে আনন্দ পাবে, শান্তি ও সান্ত্বনা পাবে জীবনে'। স্বামীজী মহারাজের তেজোদ্দীপ্ত কথাগুলি শুধু সেদিনই যে আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গভীর রেখাপাত করেছিল তা নয়, আজও জীবন্ত হয়ে আছে এবং চিরদিনই থাকবে।

স্বামী অভেদানন্দের নিজের জীবনও যে কত নিয়মানুবর্তী ও সুশৃঙ্খল ছিল তার কিছুটা পরিচয় দেবো এখানে সংক্ষেপে। একটি প্রাতঃকাল থেকে আরম্ভ ক'রে পরদিন প্রাতঃকাল—এই চব্বিশ ঘণ্টা তিনি কি রকমভাবে সময় অতিবাহিত করতেন, তারই চাক্ষুষ চিত্র একটি সংক্ষেপে অঙ্কিত করবো ভবিষ্যৎ-ইতিহাসিক ঘটনার প্রমাণপঞ্জীর জন্য।

অতিপ্রত্যূষে উঠে স্বামীজী মহারাজ তাঁর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতেন। প্রায় প্রতিদিন সকাল সাতটায় তাঁর গড়গড়ায় তামাক দেওয়া হতো। তামাক খেতে খেতে তিনি বিচিত্র বিষয়ের বই পড়তেন বেলা প্রায় আটটা-পর্যন্ত। তারপর হতো চা খাওয়ার সময়। আগে থাকতে সাজিয়ে রাখা হ'তো তাঁর অফিসঘরের টেবিল চেয়ার প্রভৃতি ঝেড়েমুছে। শোওয়ার ঘরের পূর্বদিকের জানালার সামনে থাকতো একটি চেয়ার, আর টেবিলের উপর সাজানো থাকতো চায়ের সাজ-সরঞ্জাম: চায়ের কাপ, দুধ, চিনি, চামচ, তোয়ালে প্রভৃতি। চায়ের জল ঢেলে নিয়ে নিজের পছন্দ মতো তাতে দুধ ও চিনি মেশাতেন তিনি। কফি বা কোকোও তিনি খেতেন কখনো কখনো চায়ের পরিবর্তে। টেবিলে-চেয়ারে খাওয়ার অভ্যাস করেছিলেন তিনি ওদেশে (পাশ্চাত্যে) থাকার সময়ে। তিনি বলতেন: 'এ'নিয়মটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। এতে ধূলো-বালি উড়ে এসে পড়ার ভয় কম থাকে। মুসলমানেরা মেজেতে বসলেও মাদুরের

উপর পরিষ্কার কাপড় পেতে তার উপর থালা রেখে খাওয়া-দাওয়া করেন। খ্রীষ্টানদের তো কথাই নাই। স্বাস্থ্যের দিক থেকে এ' নিয়ম খুবই ভাল। তাছাড়া চেয়ারে-টেবিলে খাবার সময়ে শরীর সোজা থাকে। হজমের পক্ষে তা' অনুকূল'।

সকালে ও সন্ধ্যায় চা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল একটু ভিন্ন রকমের। সকালে থাকতো সামান্য রকমের ফল, দু'স্লাইজ রুটি ও একটু মাখন। চা-খাওয়ার সময়ে হ'ত নানা বিষয়ের আলোচনা, গল্প-গুজব ও হাসি-ঠাট্টা-তামাসা। এই অভ্যাস কেবল স্বামীজী মহারাজের একারই ছিল না, তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সকেলরই ছিল শুনেছি। চা-পানের সময়ে আলোচনা চলতো কোনদিন সামাজিক বিবর্তন ও আচার-বিচার নিয়ে, কোনদিন দর্শন, ইতিহাস, চারুশিল্প-সম্বন্ধে, কোনদিন বা শুধু বিভিন্ন দেশের ধর্মের, কোনদিন নানান বিষয়ের প্রশ্নোত্তর নিয়ে, আবার কোনদিন বা কেবল হাসি-ঠাট্টা-তামাসাতেই কেটে যেত প্রায় সমস্ত সময়টা। প্রতিদিনই স্বামীজী মহারাজ সকল সময়ে ছিলেন হাস্যময় সদানন্দময় পুরুষ। তবে মাঝে মাঝে তাঁর ভিতর অসাধারণ গাম্ভীর্যের বিকাশও দেখা যেত। বেলা পৌনে-ন'টা বা ন'টার সময়ে অফিসঘরটিতে এসে তিনি বসতেন। তখনই নির্দিষ্ট ছিল বাইরের দর্শনার্থীদের দেখা করার সময়। অফিসঘরের সমস্ত জিনিসপত্র পূর্ব থেকেই নিখুঁতভাবে সাজানো থাকতো, এলোমেলো ভাব কোনদিনই তিনি পছন্দ করতেন না। সাজানো-গুছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলতার তিনি ছিলেন চিরদিন পক্ষপাতী, বরং সকল-কিছুর এলোমেলো ভাব দেখলে তিনি বিরক্ত হতেন ও মনে মনে বলতেন—'সংযত মনের সুসংযত অভ্যাসের এ'গুলি ফলশ্রুতি নয়'।

অফিস-ঘরের মেঝেতে একটি সতরঞ্চি বা মাদুর পাতা থাকতো। তার সামনে থাকতো স্বামীজী মহারাজের টেবিল ও চেয়ার।

তিনি বসতেন দক্ষিণদিকে মুখ ক'রে ঘরের উত্তরদিকের দেওয়ালের ঠিক মাঝামাঝি। উত্তবদিকে ছিল একটি দরজা, শোওযার ঘর এবং অফিসঘরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ক'রতো সেই দরজাটি। দরজার উপর টাঙানো ছিল একদিকে ধর্মসমন্বয়েব ছবি ও অপরদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘাপর্বতচূড়ার একটি রঙিন তৈলচিত্র এ. সেনের আঁকা। তৈলচিত্রটি এ. সেন তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন দার্জিলিঙে থাক্‌তে। উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল একটি বইয়ের ঘোরানো-সেলফ, সাজানো থাকতো তাতে বেশীর ভাগ ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী মাসিক পত্রিকা, কিছু বেদান্তমঠ থেকে ও অন্যান্য স্থানের প্রকাশিত গ্রন্থমালা। স্বামীজী মহারাজের বসার জায়গার দু'দিকে ঠিক মাথার উপরে ডানদিকে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও বামদিকে শ্রীশ্রীমার মাঝারি সাইজের বাঁধানো দু'টি ফটো। ঘরের দক্ষিণদিকে একটি দরজা—যেখান দিয়ে দর্শনার্থী ভক্তেরা প্রবেশ করতেন। তার পাশে ও পূর্বদিকে ঠিক জানালার ধারে ছিল দু'টি আলমারী। দক্ষিণদিকের আলমারীতে ছিল সংস্কৃত ও ইংরাজী বই সাজানো, পূর্বদিকের আলমারীতে ছিল চন্দনকাঠের ও রূপার অনেকগুলি কাস্কেট—যাদের ভিতর রাখা ছিল কতকগুলি মানপত্র। আমেরিকা থেকে যখন তিনি ভারতে ফিরে আসেন তখন তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল ঐ মানপত্রগুলি দিয়ে। গ্রন্থও ছিল কিছু সাজানো ঐ আলমারীর ভিতর। স্বামীজী মহারাজের শরীর যাবার দু'বছর পূর্বে অসুখের সময়ে পাতা থাকতো বেতের হেলানদেওয়া একটি ইজি-চেয়ার পূর্বদিকে জানালার কাছে—যার উপর বসে তিনি অভ্যাগত ভক্ত-শিষ্যদের সঙ্গে দেখাশোনা করতেন।

বেলা ন'টার সময়ে অফিসঘরে প্রবেশ করেই স্বামীজী মহারাজ তাঁর ঘোরানো-চেয়ারটির ওপর বসতেন। সেই সময়েই পড়তেন বিভিন্ন চিঠিপত্রাদি—যেগুলি সাজানো থাকতো তাঁর টেবিলের উপর

এবং উত্তরাদি দিতেন সে'গুলির এক একটি ক'রে। তারপর পড়তেন ইংরাজী ও বাংলা দৈনিক খবরের কাগজ নিত্য-নৈমিত্তিকভাবে। তারই মধ্যে আবার কথাবার্তা বলতেন ও আলাপ-আলোচনাদি করতেন লোকজন যাঁরা আসতেন তাঁর কাছে।

সে' সময়ই ছিল আবার স্বামীজী মহারাজকে আমাদের প্রণাম করার সময়। প্রণাম করার মধ্যে এতটুকুও ছিল না গতানুগতিক কোন নিয়মকানুন, বরং ছিল সকলের মধ্যে প্রাণের আবেগ ও মনের একান্ত আকুলতা। তাঁর কাছ থেকে ফেরার পর হৃদয় সকলেরই ভরে উঠতো এক নূতন উৎসাহে ও অপূর্ব শক্তির প্রেরণায়।

ঐ প্রণাম করার কথাই বলি পুনরায় সামান্যভাবে। প্রণাম করার জন্য যখন উপস্থিত হতাম আমরা স্বামীজী মহারাজের অফিস-ঘরের সামনে, তিনি বলতেন: 'এই যে এসো, ক্যামন আছ?' ইত্যাদি। কিংবা কাউকে হয়তো বলতেন: 'কি গো, একেবারে ডুমুরফুল হ'য়ে গেছ যে?' ডুমুরফুল বলার অর্থ দু'একদিন কাজের গতিকে কেউ হয়তো মহারাজের কাছে যেতে পারে নি—তাই। তাঁর জিজ্ঞাসা করার কণ্ঠস্বর ও ভঙ্গী ছিল এতই স্নেহপূর্ণ ও আপন-করা যে, মনে হ'ত যেন তিনিই আমাদের পিতা মাতা ভাই বন্ধু সব-কিছুই একাধারে! জিজ্ঞাসা করতেন মঠ, আশ্রম ও সমিতির সকল রকম সংবাদ ও কাজের কথা—কোন্‌টা কতদূর হ'ল, কোন্ কাজ করতে হবে বা হবে না, কার পক্ষে কোন্ কাজ ভাল নয়। অবশ্য সকল কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করতেন তন্ন তন্ন ক'রে ও পরামর্শ দিতেন আমাদের প্রয়োজন হ'লে। বিভিন্ন বইপত্র এবং ধর্ম ও দর্শন-সম্বন্ধে ছোটখাট আলোচনাও যে হ'ত না তা' নয়।

এ'রকম ক'রে সাড়ে এগারটা, কখনো কখনো বা বারোটাও বেজে যেত। তারপরই উঠতেন তিনি নিজের বিশ্রাম-ঘরে যাওয়ার জন্য। সেখানেও আবার কাজ আরম্ভ হ'ত—কোন জামা, গেঞ্জি

বা কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে, সূঁচ-সুতা নিয়ে সেলাই করতে বসে যেতেন। কিংবা কাপড় কিনে এনে টুপি বা জামার ছাঁট নিজের হাতে কাঁচি দিয়ে কেটে সেলাই করতেন। কখনো কখনো কোন বইও পড়তেন। এ'ভাবে নূতন নূতন তাঁর কাজের আর অন্ত ছিল না। অবিশ্রান্তভাবে অজস্র কাজ তিনি করতেন, ক্লান্তির বা বিরক্তির ভাব এতটুকুও কোনদিন দেখিনি তাঁর মধ্যে। কাজ করার প্রসঙ্গ নিয়ে একদিন তিনি আমাদের বলেছিলেন: 'অনেকে বলে নাকি সময়ই পাইনি তা' কাজ করবো কখন্। কিন্তু সময়ের তুমি দাস—না সময় তোমার দাস? নিয়মিতভাবে কাজ যে করে তার কাছে সময়ের কোনদিন অভাব হয় না। কুঁড়েমী করলে ক্যামন ক'রে আর সময় পাবে বলো। তাই কাজও করতে হবে, অফিসও যেতে হবে, ধর্মের আলোচনাও করতে হবে। কোনটাই বাদ দিলে চলবে না। তবে ভাবের ঘরে চুরি করলে হবে না। কাজের সময় নিশ্চয়ই পাবে—যদি তোমার ইচ্ছা থাকে মনে। কাজ করার বা কোন-কিছুর জন্য সময় পাওনি মানে তোমার ইচ্ছা নাই কাজ করার। Self-analysis (আত্মবিশ্লেষণ) করলে এটাই কিন্তু ধরা পড়ে'।

বরাবরই রান্না হ'ত তাঁর জন্য আলাদা ক'রে। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর প্রথম দিনকতক তিনি সবার সঙ্গেই একত্রে বসে খেয়েছিলেন। কিন্তু সে খাওয়া তাঁর সহ্য হ'ল না বেশীদিন। অগত্যা পৃথক ক'রে রান্নার ব্যবস্থাই করা হয়েছিল তখন থেকে।

ছোটখাট কাজ—চিঠিপত্র লেখা, খবরের কাগজ বা বই পড়া প্রভৃতির ভিতর দিয়ে বেজে যেত প্রায় দেড়টা। তারপর যেতেন তিনি দাড়ি কামানোর ও স্নান করার জন্য। স্নান প্রভৃতি সারতে বাজতো প্রায় দুটো। তারপর তিনি বসতেন খেতে। খেতে লাগতো প্রায় এক ঘণ্টারও বেশী। খাবার সময়ে চলতো যত রকমের কথা ও আলোচনা। খাবার সামগ্রী থাকতো খুব সামান্য।

দিনের বেলা খেতেন তিনি ভাত, আর রাত্রে রুটি। ভাত খেতেন ছোট একটি বাটির এক বাটি। দিনের বেলায় তরকারীর ভিতর থাকতো যেকোন একটা সিদ্ধ আলু, পেঁপে বা বেগুন, বাঁধাকপি, কিন্‌ কোন একটা তিঁতো, কোনদিন বা মাছের ঝোল অথবা সামান্য একটু ডাল। আমরা আবার ছিলাম সব প্রসাদপাবার দল। স্বামীজী মহারাজও জানতেন সেটা ভাল ক'রেই, তাই ছোট এক বাটি ভাতের ভিতর থেকেই প্রসাদ রাখতেন তিনি আমাদের জন্য। অবশ্য বেশী খাওয়ার পক্ষপাতী তিনি কোনদিনই ছিলেন না। ভাতের সঙ্গে দিনের বেলায় ফলও তিনি খেতেন কোন কোন দিন সামান্য ক'রে।

দিনের খাওয়া শেষ হ'তে বাজতো প্রায় আড়াইটা। তারপর আধঘণ্টা—কি বড় জোর একঘণ্টা বিশ্রাম করতেন তিনি। তারপর উঠে মুখ ধুতেন। তখন আবার তাঁকে তামাক দেওয়া হ'ত। তিনি বসে হয়তো খবরের কাগজ—না হয় কোন একটা বই পড়তেন। দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের নূতন কোন বই বাজারে প্রকশিত হ'লেই তা' জোগাড় ক'রে পড়ার তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। প্রাচ্য—কি পাশ্চাত্যআর্টের (শিল্পের) বই পড়তে তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। সন্ধ্যা আটটার সময়ে আবার তাঁকে চা দেওয়া হ'ত, আর তার সঙ্গে থাকতো দু'তিনখানা বিস্কুট কিংবা দু'এক স্লাইজ পাউরুটি।

তারপর যেতেন তিনি আবার অফিসঘরে। তখনই যত নবাগত ও পরিচিত ভক্তেরা স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা ও আলোচনা করতে আসতেন। একবার তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলে জমাট হ'য়ে উঠতো সারা ঘরের পরিবেশ। যে'দিন যেমন প্রসঙ্গ উঠতো তাতেই তিনি যোগ দিতেন আনন্দের সঙ্গে। কখনো কখনো যে পরিশ্রান্ত হতেন না নানা কথায়—তাই বা

ক্যামন ক'রে বলি। আমাদেরও মাঝে মাঝে তিনি বলতেন: 'লোকে কি আর সত্যকারের কিছু জানতে চায়? কর্ম-কোলাহলের মধ্যে থেকে মঠে এসেছে, দু'দণ্ড কোথা ভগবানের প্রসঙ্গ করবে—তা' নয়, এখানে এসেও শুরু ক'রে দেয় সেই সংসারের কথা: চাক্‌রীটা হয়েও হ'ল না, ছেলেটা এবারে পরীক্ষা দিয়েছে—আশীর্বাদ করুন যেন পাশ করে, মেয়ের বিয়েটা কোনরকমে হ'য়ে গেছে, জামাইয়ের অসুখ করেছে বাবা, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে হবে—তাই মনটা বড় খারাপ, অ-বাবুর সঙ্গে চেষ্টা করলাম আপোষ করতে, কিন্তু শুনলেন না তিনি, শেষে হাইকোর্টে মামলা রুজু ক'রে দিলেন—ইত্যাদি নানান রকমের এলোমেলো স্বার্থের ও বিষয়ের কথা। স্বর্গে গেলেও ধানভাঙা-স্বভাব ঢেঁকির ঘোচে না। সংসারের মানুষগুলোর অবস্থাও তাই। 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' মুখে করে বটে, কিন্তু ধর্মের কথা কি আর সত্য সত্য তারা শুনতে চায়,—না জানতে চায়? কেবল আজেবাজে কথা, আর তার মাঝখানে পড়ে আমার যে কি অসহায় অবস্থা হয় তা' একবার ভেবে ভ্যাখো দিখিনি? মঠে-মন্দিরে আসে ক্ষণেকের জন্যও শান্তি পাবে ব'লে, কিন্তু তা' কি আর হয়? ধর্মস্থানে এলেও সাংসারিক প্রসঙ্গের মধ্যেই সর্বদা ডুবে থাকে তারা, সুতরাং শান্তি আর পাবে কি ক'রে বলো'।

রাত্রি প্রায় দশটা—কি সাড়ে দশটার সময়ে উঠে যেতেন তিনি নিজের বিশ্রাম-ঘরে পুনরায়। তারপর হয় বই বা খবরের কাগজ—নয় দরকারী কোন চিঠিপত্র তিনি পড়তেন। এ'রকম ক'রে বেজে যেত প্রায় রাত্রি বারোটা। সেবক হয়তো বলতো: 'মহারাজ, রান্না হয়েগেছে'। স্বামীজী মহারাজের তখন চমক ভাঙতো। শশব্যস্তে তিনি বলতেন: ও, তাই নাকি? আচ্ছা আমি আসছি'।

তখন হাত-মুখ ধোয়ার জন্য তিনি কলঘরে যেতেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের গান গাইতেন হাত-মুখ ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ঘড়িতে

হয়তো বাজতো তখন একটা, আবার কখনো কখনো দেড়টা। তারপর এসে বসতেন চেয়ারে খাওয়ার জন্য। রাত্রে খেতেন তিনি রুটি। মাত্র আধপোয়া ময়দার রুটি তৈরী করা হ'ত খুব ছোট ছোট পাতলা ক'রে। রুটির সঙ্গে থাকতো একটা তরকারী, কোন শাক-শব্‌জীর ষ্টু, একটু ডাল, সামান্য ফল ও একটু স্যালাড। মিষ্টির কোন জিনিস তিনি খেতেন না কোনদিনই।

রাত্রে খাওয়া শেষ হ'ত প্রায় দু'টোর সময়ে। কখনো কখনো তার কিছুটা পূর্বেও (দেড়টায়) তিনি রাত্রের খাওয়া শেষ করতেন। তারপর বসতেন তামাক খেতে। অম্বুরি, দা-কাটা ও বিষ্ণুপুরী তিন রকম তামাকই মেশানো হ'ত তাঁর তামাকে, সেজন্য গন্ধে ভরপূর হয়ে থাকতো সারাঘরটি। খাওয়ার সময়ে নানান রকম বিষয়ের হ'ত আলাপ ও আলোচনা। তামাক খেতে বসেও তিনি বিচিত্র বিষয়ের গল্প-গুজব ও আলাপ-আলোচনা করতেন। কখনো কখনো গান করতেন গুরুগম্ভীর অথচ সুমিষ্ট সুরে বসার চেয়ারের হাতলটার উপর তাল দিতে দিতে। বেজে যেত প্রায় রাত্রি আড়াইটা বা তিনটা। তারপর সকলকে বিদায় দিয়ে তিনি যেতেন শোওয়ার জন্য।

আমরা নীচের লোক সকলে ঘুম থেকে উঠতাম সকাল পাঁচটা —কি সাড়ে-চারটার সময়ে। এর পূর্বেও যে উঠতেন না অনেকে— তা নয়। কিন্তু প্রতিদিন উঠে শুনতে পেতাম স্বামীজী মহারাজের সেই উদাত্ত কণ্ঠের গান। একদিন বেশ মনে আছে তিনি গাইছেন : 'জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী। প্রসুপ্তা ভুজাগাকারা আধারপদ্মবাসিনী' ইত্যাদি। রাগ-রাগিণীসম্বন্ধে জ্ঞান ছিল তাঁর গভীর। তাল-সম্বন্ধেও জ্ঞান ছিল অসাধারণ। স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) ধ্রুপদ-গানের সঙ্গে পাখোয়াজ-বাজানোর স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেন নি জীবনের শেষদিন-পর্যন্ত। মহারাজের ঘুম-ভাঙ্গানো গানের সুর ভেসে

আসতো ভোরের বাতাসের সঙ্গে প্রতিদিনই আমাদের কানে, আর হৃদয়ের মধ্যে সৃষ্টি করতো এক অব্যক্ত পবিত্র ভাবের ব্যঞ্জনা। সেই সবের স্মৃতি উজ্জ্বল হ'য়ে আছে আজও-পর্যন্ত আমাদের মানসপটে! সকালে ভোরের দিকে তিনি গান করতেন আরও অনেক রকমের। যেমন—

(১) হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হ'ল
পার করো আমারে।
তুমি পারের কর্তা জেনে বার্তা,
ডাক্‌ছি হে তোমারে॥ ...

(২) আমার মন যদি যায় ভুলে।
তবে, বালির শয্যায় কালীর নাম
আমার দিয়ো কর্ণমূলে।
এ' দেহ আপনার নয় রে, সদা রিপু সঙ্গে চলে,
তবে, আন্‌রে ভোলা জপের মালা,
দেহ ভাসাই গঙ্গাজলে।
ভয় পেয়ে রাজা রামকৃষ্ণ ভোলার প্রতি বলে—
আমার ইষ্টপ্রতি দৃষ্টি খাটো
কী আছে কপালে॥

(৩) ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্যবিনোদিনী॥
শরীর শারীর-যন্ত্রে, সুষুম্নাদি একতন্ত্রে
গুণভেদে মহামন্ত্র তিনগ্রামসঞ্চারিণী। প্রভৃতি

(৪) আমি ঐ খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাকতে আমায় জাগাঘরে চুরি ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়েছ
মনেরে আঁখ্‌ ঠারী।
ওমা, তোমার সৃষ্টি দৃষ্টিপোড়া,
মিষ্টি বলে ঘুরি ॥

(৫) সাধক কমলাকান্তের গান—
আপনাতে আপনি থেকো মন
যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥ প্রভৃতি।

তাছাড়া আরও কত রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি রচিত গান গাইতেন।

এ'রকমই ছিল স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের দিন-রাত্রির বুকে সমান্তরালভাবে জীবনযাত্রাপ্রণালীর কর্মময়প্রবাহ। এর ব্যতিক্রম হয়েছিল কেবল শেষের দু'বছর—শরীর যখন তাঁর অসুস্থ হয়েছিল। যখন তিনি দার্জিলিঙ আশ্রমে (শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আশ্রম, দার্জিলিঙ) থাকতেন, তখনকার জীবনযাপনপ্রণালীও ছিল প্রায় এই একই রকমের। তবে স্থান ও জলবায়ুর ভিন্নতার জন্য কিছু অদলবদল হ'ত তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মধারার ভিতর।

শেষজীবনের দু'বছর কলকাতায় সকাল সাতটায় বেড়াতেন তিনি মঠের পিছনের মাঠটায়। তবে সেই বেড়ানোও ছিল নামেমাত্র। যাকেই পেতেন তাঁর বেড়ানোর সময়ে সাম্‌নে—তাঁকে নিয়েই তাঁর চলতো বিচিত্র বিষয়ের উপর আলোচনা : কোথায় কি নূতন বিষয়ের বই ছাপা হয়েছে তার কথা, কিংবা হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের

বা শ্রীশ্রীমার জীবনের প্রসঙ্গ, নয়তো গতরাত্রের অসমাপ্ত ও অমীমাংসিত কোন জটিল দার্শনিক আলোচনার বিষয়। আধঘণ্টা —কি বড় জোর একঘণ্টা বেড়াতেন তিনি মাঠে ধীরে ধীরে আলোচনার ভিতর নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে। তারপরই উঠে যেতেন কফি বা চা-খাওয়ার জন্ম উপরে নিজের ঘরে। তারপর লোকজনের সঙ্গে করতেন আলাপ-আলোচনা। সকল সময়েই থাকতো তাঁর উজ্জ্বল হাসিভরা মুখ। সর্বদাই থাকতো আনন্দে উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রসন্ন-গম্ভীর তাঁর ঘরের পরিবেশ। বেলা এগারটার সময়ে সামান্য টিফিন করার পর আবার এসে বসতেন তিনি অফিস-ঘরটিতে তাঁর আমেরিকায় কিংবা ভারতে দেওয়া বক্তৃতাগুলি নিয়ে সংশোধন করার জন্য। ঐ কাজ চলতো বেলা দেড়টা—কি দুটো পর্যন্ত। রাত্রেও চলতো ঠিক এই ধরনের ম্যানাস্ক্রিপ্ট পড়া ও সংশোধনের কাজ। এভাবেই কেটে গেছে তাঁর শেষের পুরো দু'টি বছর! সেই সব অতীত দিনের স্মৃতিকথা আজও আছে মনে জাগরুক হ'য়ে। আনন্দভরা সেই সব দিনের কথা চিরদিনই থাকবে জাগরুক হ'য়ে আমাদের মনে।

প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজ যখন তাঁর অফিস-ঘরে বসতেন তখনই নবাগত কিংবা মঠবাসী সকলের পক্ষেই ছিল দেখা ও আলোচনা করার সময় তা' পূর্বেই বলেছি। প্রসঙ্গ চলতো যিনি যেমনটি চাইতেন, অথবা স্বামীজী মহারাজই আলোচনা শুরু করতেন যার যে'রকমটি দরকার। অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার তিনি ছিলেন জ্বলন্তমূর্তি। আলোচনা তিনি করতেন বিচিত্র রকমের বিষয় নিয়ে। যেমন কেউ হয়তো বল্লেন: 'মহারাজ সংসারে বড়ই কষ্ট, শান্তি এতটুকুও নেই'। স্বামীজী মহারাজ অমনি আন্তরিকতা ও সমবেদনার সুরে বলতেন: 'হ্যাঁ সত্যই বলেছ, জীবনে ও সংসারে বড়ই কষ্ট। টাকা-পয়সার চিন্তা, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব, আজ এর জ্বর—কাল ওর স'দি,

অমুকের চাকরী নেই—দারিদ্র্যের তাড়না ও অনটন, অমুকের বিয়ে দিতে হবে—এই নানান রকমের ঘটনা ও হাঙ্গামা। শান্তি ও সুরাহা সত্যই কোনদিকে নেই কোনদিন, অশান্তির আগুনই চারদিকে জ্বলছে ক্রমাগত। ঠিকই বলেছ যে, সংসারে যেন দুঃখ আর কষ্ট, শান্তি ও আনন্দের লেশমাত্র নাই'। তখন ম্লান হ'য়ে গেছে যেন ক্ষণেকের জন্যও সংসারের সকল অসারতার প্রশ্ন জ্ঞান-প্রদীপ্ত স্বামীজী মহারাজের কাছে। অফুরন্ত করুণায় ভরে উঠেছে তাঁর অন্তর, যুক্তিতর্কের সকল প্রশ্নই যেন হয়েছে ম্লান ও নীরব, প্রেম ভালবাসা ও সমবেদনার ভাবই ফুটে উঠেছে তাঁর হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে!

শুধু তাই নয়, হয়তো সন্তানহারা হয়েছেন কোন বিধবা, স্বামীজী মহারাজকে লিখে জানিয়েছে জীবনে সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য, মহারাজও ব্যাকুল-হৃদয় নিয়ে লিখে পাঠালেন তাকে : 'স্নেহের—, বড়ই কষ্ট পেয়েছি তোমার পত্রখানি পেয়ে। শোকসন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণেই কেবল প্রার্থনা জানাতে পারি তোমার জন্য, শান্তি ও সান্ত্বনা দেবার মালিক তিনিই একমাত্র। তুমি নিজেও তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবে'! বৈদান্তিক জ্ঞানবাদী স্বামীজী মহারাজের নিরাসক্ত প্রাণ কোমলতায় ও স্নেহতরঙ্গে হয়ে উঠতো তখন উৎসারিত, আর জ্ঞানের জমাট বরফ গলে গিয়ে প্রেমের বিগলিত সলিলে হ'ত পরিণত!

সাংসারিক লোকের দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে বলতে স্বামীজী মহারাজ সময়ে সময়ে অধীর হ'য়ে পড়তেন, অফুরন্ত বেদনার ভাব তখন ফুটে উঠতো তাঁর প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে, চক্ষুও ভরে উঠতো জলে! যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে অনুভব করতেন তিনি সকল মানুষের দুঃখ-যাতনার কথা, সকলের জন্যই করতেন কল্যাণময়ী প্রার্থনা তাঁর প্রেমময় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে।

আবার বিপরীত ভাবের বিকাশও দেখেছি তাঁর মধ্যে। একজন হয়তো বল্লেন : 'মহারাজ, জীবনটা বিড়ম্বনাময়, সংসারের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছি, আশীর্বাদ করুন যেন শান্তি পাই'। স্বামীজী মহারাজ শুনে বল্লেন : 'এখন আশীর্বাদ ক'রে আর কি ফল হবে বলো ? দুঃখ তো সংসারে সকলেরই আছে, তাই বিচলিত হ'লে চলবে কেন ? সংসারসমুদ্রে যখন নৌকা ভাসিয়েছ একবার, তখন যেতেই হবে পাড়ি দিয়ে এগিয়ে। তবে কাপুরুষের মতো নয়, যুদ্ধবিজয়ী বীরের মতো। সেক্সপীয়ার বলেছেন : 'Cowards die many times before their death'—'কাপুরুষ লোক মৃত্যুর পূর্বেও অনেকবার মৃত্যুভয়ে ভীত হয়'। ভয়ের বিষয়ই বিশেষ ক'রে মৃত্যুভয়। মৃত্যুভয়ই মানুষের কাছে জীবনসমস্যার ভয়। তাই উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে ভয় পেলে চলবে কেন বলো ? সংসারের ভার যখন স্বেচ্ছায় বরণ করেছ, তখন কর্ম ক'রে যেতে হবে কর্তব্য ভেবে নয়, প্রেম ও ভালবাসার ভাব নিয়ে, তবেই দুঃখ-কষ্টের সংসারে থেকেও শান্তি ও আনন্দ পাবে এবং দুর্বলতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শক্তি ও সাহস পাবে মনে। সেজন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করো করুণাময় ভগবানের কাছে। তিনি প্রসন্ন হলে তবেই সংসারে ও জীবনে শান্তি'।

'ভয়ই পায় মানুষ মৃত্যুকে ভেবে! প্রতিদিন কত মানুষই না মৃত্যুমুখে হচ্ছে পতিত। দেখছেও শত শত মানুষের মৃত্যুর বিভীষিকা-ময়ী ছায়া। কত মানুষেরই না দেহ ভস্মিভূত হয় জ্বলন্ত চিতাগ্নির মাঝে, কিন্তু মানুষ কিভাবে যে, তাকেও একদিন যেতে হবে এই পৃথিবীর ভোগৈশ্বর্যকে ছেড়ে ? মানুয ভাবে নিজেকে অমর, তাই মৃত্যুর কথা ভাবতেও সে ভয় পায় অন্তরে। একেই বলে 'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্'। আশ্চর্যেরই কথা! তবে বিবেকী ও বৈরাগ্যবান মানুষের কথা স্বতন্ত্র।

স্বামীজী মহারাজ বলতেন মাঝে মাঝে : 'দুর্বলতাই মহাপাপ। অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মোহগ্রস্ত হলেন আত্মীয়-স্বজনকে দেখে, আর উপস্থিত হ'ল তার মধ্যে বিষাদ ও দুর্বলতা। অর্জুনকে তিরস্কার ক'রে বল্লেন তখন শ্রীকৃষ্ণ : 'যুদ্ধক্ষেত্রে ভীত হয় কাপুরুষেরা। অর্জুন, তুমি ভয় ও মোহ ত্যাগ ক'রে ক্ষত্রিয়ের যা কর্তব্য তাই করো। তাতে তোমার পুণ্য হবে'।

তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন : 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত' (১।২১)। শ্রীকৃষ্ণ রথ স্থাপন করলেন কৌরব ও পাণ্ডব-সেনাদের মধ্যে, কিন্তু মহাবীর অর্জুন কৃপার বশবর্তী হয়ে পশ্চাদ্পদ হলেন যুদ্ধকর্ম থেকে। তিনি বল্লেন—

> দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
> সীদন্তি মম গাত্রানি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
> বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
> গাণ্ডীবং সংশ্রতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥ ১।২৯-৩০

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়ে বল্লেন : 'কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষয়ে সমুপস্থিতম্?' সুতরাং 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং তক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ'। এরপরও 'ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দ মুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ'। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জ্ঞান উপদেশ দিলেন ও পরিশেষে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে ভয় ও অজ্ঞান দূর করলেন।

'তেমনি সংসারে নেমে যারা দুঃখ-কষ্ট ও নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝখানে ভয় পায়, তারা কাপুরুষ ও বিবেকহীন। তাছাড়া মানুষের আরও একটা স্বভাব কি জানো?—কোন একটা কাজে একবার অকৃতকার্য হ'লে নিরাশ হ'য়ে পড়ে ও ভাবে যে, তাকে দিয়ে আর-কিছু হবে না। কিন্তু একবার কোন-কিছুতে কৃতকার্য হ'লে না ব'লে বারবারই যে অকৃতকার্য হবে এমন

কথা নেই। উদ্যম ও পুরুষকারই জীবনের লক্ষণ। তোমরা যে মানুষ ও মানুষ হয়ে যে বেঁচে আছ তার প্রমাণ—তোমাদের ভিতর উদ্যম আছে, পুরুষকার আছে, 'ষ্ট্রাগল ফর একজিস্‌টেন্স' (জীবনসংগ্রাম) আছে। জানবে—জীবনে জয় যেমন আছে, পরাজয়ও তেমনি আছে। জয়-পরাজয়, ঘাত-প্রতিঘাত—এ'সব নিয়েই তো মানুষের জীবন; এ'সব নিয়েই তো সংসারে উত্থান ও পতন। জোয়ার থাকলেই ভাঁটা আসবে, উত্থান হলেই পতন হবে। বাধা-বন্ধনহীন একটানা সরল স্বচ্ছন্দ জীবন পরিবর্তনশীল জগতে আর ক'জন পায় বলো? তাই হতাশার ভাব মনে আনবে না। শরীরে শক্তি, মনে সাহস ও উদ্যম সর্বদাই রাখতে চেষ্টা করবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন: 'গতাসূন-গতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ'। তাই মনকে কখনো দুর্বল করো না, মনে কখনও অনুশোচনাও করো না। আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসাই জীবনে কৃতকার্যতা লাভ করার একমাত্র উপায়। মনকে সর্বদা বলবে 'আমি পারবো', 'পারবো না' এ'কথা স্বপ্নেও ভাববে না। এ' রকম হ'লে তবেই সকল বিষয়ে জীবনে কৃতকার্যতা লাভ করবে। সত্য বলছি, বিশ্বাস করো'।

দয়া-ভিক্ষার বা নিশ্চেষ্ট জীবন নিয়ে কেবলই কৃপা পাওয়ার-কথা শুনলে স্বামীজী মহারাজ সকল সময়েই বিরক্ত হতেন। তিনি বলতেন: 'গুরুকৃপা, ভগবানের দয়া এ'সবে বিশ্বাস করা মোটেই খারাপ নয়, কিন্তু নিজে কিছুই করবো না, গুরু বা ভগবান সব ক'রে দেবেন—এ'রকম যারা কেবলই চিন্তা করে, তারা দুর্বল ও আত্ম-বিশ্বাসহীন ছাড়া আর কি! এই যে কৃপার কথা বলা হয়েছে: 'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্, যৎকৃপা তমহং বন্দে, পরমানন্দ-মাধবম্'—এই মনোভাব থেকে শিষ্যের বা ভক্তের মধ্যে নিরভিমান ও আত্মসমর্পনের ভাব প্রকাশ পায়। যথার্থ শিষ্যের বা ভক্তেরা dedicated life—নিবেদিত প্রাণ। ভক্ত চিরদিনই

ভগবানের কাছে শরণাগত থাকবে। প্রপত্তি বা শরণাগতি অর্থে এই নয় যে, কুড়েমি ক'রে বসে থাকবো—আর ভগবানকে বলবো-- 'হে ভগবান তুমি আমায় কৃপা করো'। কৃপারও একটা নিয়ম বা condition আছে।[১] কৃপা-পাওয়ারও যথার্থ অধিকারী হওয়া চাই। তাই অহংকার বিসর্জন দিয়ে নিরভিমান হতে হয়। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যে কৃপা-পাওয়ার আশা করি, সেই আশার ভিতর উদ্যম থাকে না, আত্মবিশ্বাস ও শরণাগতির ভাব থাকে না, থাকে কেবল নিশ্চেষ্টতা ও চালাকী ক'রে বাজীমাৎ করার চেষ্টা। এ'সবে কি আর হয় বাপু? ভগবানের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কৃপা আদায় করা বড় সহজ কথা নয়! তিনি বুদ্ধিমান ও সুচতুর—পরমচৈতন্যস্বরূপ। ত্রিভুবনের বুদ্ধিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, সুতরাং কিছু করবো না, ফাঁকি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দয়া বা কৃপা আদায় করবো—এও কি কখনো হয়? তাই কৃপা ও প্রসন্নতা চাইলে কর্তৃত্বাভিমান বিসর্জন দিতে হয়। নিজের উপর বিশ্বাস অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস রেখে সংসারে কর্ম ও সাধনা করতে হবে, তবেই তিনি কৃপা করেন—অবশ্য unconditional কৃপাবাদে যদি বিশ্বাস করো, নচেৎ একমাত্র বিবেক-বিচার, ভক্তি বা কর্তৃত্বাভিমানরহিত কর্ম দিয়েই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায়। তবে চেষ্টা চাই

১। ভগবদ্গীতা (vide Chapter XIII) ব্যাখ্যাকালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন: 'Purification of the heart is a condition under which grace of the Lord descends. The **grace** and **purification of the heart are** one and the samething. When heart is pursfied, the grace is there. So, in order to attain the **grace,** a Bhakta or devotee thinks of the **purification of heart**, and that **condition** comes through Divine Will. But a Jnani, or a Karmi, tries to purify his heart, and he knows that grace of the Lord and purfication of heart are simultaneous'.

ও নিজের মধ্যে একান্ত বিশ্বাস চাই। Negative (নেতিবাচক) ভাবকে মনে একেবারে স্থান দেবে না, সর্বদাই positive (ইতিবাচক) ভাব মনে আনবে। 'আমি পারবো' বা 'আমার দ্বারা হবে' এ'কথাই সর্বদা চিন্তা করবে, 'পারবো না'—এ'রকম ভাব কখনো মনে আনবে না। আশাই মানুষকে কৃতকার্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, নিরাশা জীবনে ধ্বংস ও অকৃতকার্যতার অভিশাপ নিয়ে আসে'।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ভাব ছিল ঠিক এ'রকম আশাময়ই। লোক ও প্রসঙ্গ-হিসাবে তিনি তিরস্কার করতেন যেমন একদিকে, সমবেদনাও জানাতেন তেমনি অপরদিকে স্নেহপূর্ণ প্রসন্নমূর্তি নিয়ে। কঠোরতা ও কোমলতা এ'দুয়ের মিলন ছিল তাঁর বিরাট ব্যক্তিময় জীবনে।

আলোচনা হ'ত তাঁর সঙ্গে বিচিত্র বিষয়ের পূর্বেই বলেছি। জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল পরিপূর্ণ তাঁর মধ্যে। যেকেউ যেকোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আসতেন স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে, স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে যোগ দিতেন তিনি সেই সব আলোচনায় অপূর্ব মনীষা ও প্রজ্ঞার উদার ও স্বচ্ছ আলোক নিয়ে। তাই আনন্দমুখর হ'য়ে উঠতো তাঁর সকল আলোচনাই গোড়া থেকে শেষ-পর্যন্ত একজন হয়তো প্রশ্ন করলে: 'মহারাজ, আপনি পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশে ঘুরেছেন, কিন্তু কোন্ দেশের খাওয়া (আহার) বেশ স্বাস্থ্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত দেখলেন?' প্রশ্ন শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে স্বামীজী মহারাজ বলতেন শুধু পাশ্চাত্যের নয়, প্রাচ্যেরও নানান দেশের খাওয়ার রীতিনীতি, বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা-সম্বন্ধে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, চীন, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, যুগোশ্লেভিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি ছাড়া এক ভারতবর্ষের বিচিত্র দেশের সিংহলের খাওয়ার দ্রব্য, রুচি ও রান্নার নিয়মপ্রণালীই সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের। তারপর কি কি তরকারী বা শাকসবজী কোন্ কোন্

দেশে পাওয়া যায়, কেমন ক'রে তাদের উৎপন্ন ও চাষ-আবাদ ঠিকভাবে করতে হয়, কিভাবে তাদের রান্না করতে হয়, কোন্ কোন্ দেশের খাওয়া ভাল ও বিজ্ঞানসম্মত—এ'সকল আলোচনাও তিনি করতেন দ্বিধাহীন মন নিয়ে অবিশ্রান্তভাবে। প্রতিটি বিষয়ের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার তিনি ছিলেন জ্বলন্ত মূর্তি। তাঁর অভিমতই ছিল যে, ভারতীয়দের খাওযার জিনিস একটা যা হয় হলেই হ'ল, স্বাস্থ্যের দিকে মোটেই লক্ষ্য নাই। কতকগুলো ঘি, চর্বি, মাখন, তেল, গরমমশলা আর মিষ্টি খেলেই সাধারণত আমরা মনে করি বুঝি ভাল খাওয়া হ'ল। আমাদের রুচিকর খাওয়ার জিনিসের মধ্যে লুচি, পরোটা, বেশী ক'রে মশলা-দেওয়া মাছ-মাংসের কালিয়া, পোলাও এবং মিষ্টি প্রধান। তাও আবার এতটুকুতে হয় না, চাই সকল রকম জিনিস বেশী বেশী। আকণ্ঠ খাওয়া না হ'লে প্রায় খাওয়া আমাদের হয় অসম্পূর্ণ, অথচ এ'সবই হ'ল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। সে'দিক থেকে বরং মহারাষ্ট্র, সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে লোকেদের খায়ওা সরল ও স্বাস্থ্যকর। ওসব দেশের (পাশ্চাত্যে) রান্নার ও খাওয়ার প্রণালী কিন্তু বেশ সহজ, সরল ও সুন্দর। তেল, ঘি ও মশলার ব্যবহার ওরা খুব কমই করে, অথচ খাওয়ার জিনিস সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। তারা পরিমাণে খায় কম, কিন্তু বারে বেশী। খাওয়ার নির্বাচন তাদের বৈজ্ঞানিক ও রুচিসঙ্গত। তাই বাঙলাদেশের চৌষট্টি রকমের খাওয়ার রীতি ঠিক স্বাস্থ্যকর নয়'।

তারপর একজন হয়তো প্রশ্ন করলেন : 'কেন মহারাজ, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের খাওয়ার যত প্রকারের উপকরণ ও সাজসজ্জা আছে, তেমনটি বোধহয় আর কোন দেশেই পাবেন না'। স্বামীজী মহারাজ স্মিতহাস্যে উত্তর দিতেন : 'হ্যাঁ, কথাটা অবিশ্যি খুবই সত্য বলেছ, কেননা এক বাঙলাদেশের মাটিতেই তৈরী হয় যত

রকমের তরকারী ও শাকসবজী, তেমনটি আর কোন দেশে হয় না। ভারতের কোন কোন দেশে টাটকা-শাকসবজী পাওয়াই দুষ্কর। বাঙলাদেশের তরকারী ও খাবারের মধ্যে সুক্তুনি, ছ্যাঁচড়া মাছের ঝোল, অম্বল, খিচুড়ী, দই, সন্দেশ রসগোল্লা, পান্তুয়া, জিলাপি—এ'সবের তুলনা কোথাও মেলে না। অবশ্য পোলাও, কালিয়া এ'সব আমদানী হয়েছিল বাইরে (বাঙলার বাইরে) থেকে মুসলমানদের রাজত্বকালে। বাঙালীজাতি রান্নার বিষয়ে সত্যই সুপটু। অনুকরণশক্তিও এদের অসাধারণ। রান্নার সামগ্রীর নির্বাচনপ্রণালী প্রশংসাযোগ্য। একমাত্র এদের মতো উর্বর মস্তিষ্কই সৃষ্টি করতে পারে এতো হাজারো রকমের তরকারী ও মিষ্টান্ন। তাছাড়া অপরাপর কাজের মতো বাঙালীদের রান্নার মধ্যে যথেষ্টপরিমাণে শিল্পচাতুর্য্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের অভিমত যে, বাগগুহা, অজন্তা প্রভৃতির শিল্পনৈপুণ্যের মূলে ছিল বাঙালীজাতির অবদান। অবশ্য এর পিছনে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু আছে তা' বলা মুস্কিল। তবে কি জানো, কতকগুলো ভাল রাঁধলে বা ভাল খেলেই তো আর শিল্পচাতুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি হয় না। বাঙালীজাতি সকল বিষয়েই অগ্রণী। তীক্ষ্ণ ও বিচক্ষণ তাঁদের বুদ্ধি ও প্রতিভা, দেশসেবা ও স্বাধীনতাসংগ্রামে দান তাঁদের অপরিসীম। স্বার্থত্যাগ, দেশপ্রেম, চারিত্রিক বল, স্বাজাত্যবোধশক্তি বাঙালীজাতির অতুলনীয়। কিন্তু তাহলেও এ'কথা সত্য যে, বাঙালীরা যদি রান্নার পিছনে এতটা বুদ্ধির অপচয় না ক'রে অপরাপর বিষয়ের পরিপূর্ণতার দিকে মন দিত, তাহলে মনে হয় দেশের ও জাতির সচল উন্নতির পথ আরও বাধামুক্ত হ'ত। তবে সকল দিক থেকে বিচার করলে আবার বলা যায় যে, পাঞ্জাবীদের রান্না ও খাওয়ার সাজসরঞ্জাম বরং সহজ ও সরল, শরীরও তাদের বেশ হৃষ্টপুষ্ট, মনে স্ফূর্তি, অদম্য কাজের উৎসাহ, কর্মপ্রেরণা ও সাহস—যদিও বাঙালীদের মতো

মস্তিষ্ক তাঁদের মধ্যে আছে কিনা জানিনা। বাঙালীদের মতো গঠনশীল মহারাষ্ট্রীয়দের কথাও এ'প্রসঙ্গে মনে পড়ে'।

তারপর একজন হয়তো প্রশ্ন করলেন একেবারে ভিন্ন রকমের। তিনি বল্লেন : 'মহারাজ, ভগবান লাভ কেমন ক'রে হয় ?' স্বামীজী মহারাজ একটু হেসে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন : 'নূতন ক'রে ভগবানকে আর কি লাভ করবে বলো ? তিনি তো অন্তর্যামীরূপে সবার মধ্যে এবং সর্বত্র আছেন। তিনি তোমারও অন্তরে ও বাহিরে আছেন। তিনি প্রাণের প্রাণ, বুদ্ধির বুদ্ধি, আত্মার আত্মা। প্রতিটি ইচ্ছা, প্রতিটি কাজ তাঁর কল্যাণময় ইঙ্গিত ছাড়া এক মুহূর্তের জন্য কোন-কিছু হ'তে পারে না। তিনিই তো তোমার বুদ্ধিরূপে ও আত্মারূপে হৃদয়গুহায় বাস করছেন : 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্'। পৃথিবীতে এতটুকুও স্থান নেই যেখানে তিনি নাই—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'। তিনি সর্বত্রই আছেন—কাছেও বটে, দূরেও বটে ; অন্তরেও বটে—বাইরেও বটে : 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে, তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ'। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন : 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি,'—ঈশ্বর সকলেরই হৃদয়দেশে অন্তর্যামীরূপে বাস করছেন। তাছাড়া প্রতিটি মানুষ নিজেই আত্মাস্বরূপ —যদিও সে তা জানতে পারে না অজ্ঞানের জন্য। অজ্ঞান স্বার্থপরতার রূপ নিয়ে সবার ভিতর বাঁসা বেঁধে রয়েছে ও সকলের বিচার-বুদ্ধিকে ম্লান ক'রে দিচ্ছে। যে মুহূর্তে স্বার্থপরতার অন্ধকার দূর হবে, সে' মুহূর্তেই ভগবানের কল্যাণতম রূপ প্রত্যক্ষ ক'রে মানুষ ধন্য হবে। তিনি সর্বদাই স্বপ্রকাশ ও স্বয়ং-জ্যোতিঃ। তিনি আত্মারূপে তোমার. আমার ও জীব-জগৎ সকলের ভিতরেই আছেন—'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্'। তাঁকে লাভ করার অর্থ তিনি যে তোমার-আমার থেকে ও সবার থেকে অভিন্ন এটা প্রাণে প্রাণে জানা ও অনুভব করা। এই জানার নামই অপরোক্ষ্য-অনুভূতি। এ' অনুভূতিই ব্রহ্মানুভূতি'।

অপর একজন হয়তো প্রশ্ন করলে : 'মহারাজ, ধর্ম ও বিজ্ঞানে পার্থক্য কি?' স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'ধর্মের সত্যকারের 'ডেফিনিসন্' (অভিধান) কি তা' অনেকে ভেবে উঠতে পারে না। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এইটুকুমাত্র বুঝেছি যে, ধর্ম মানে আত্মানুভূতি। 'ধর্ম'—যা ধারণ করে, যা আমাদের ও সকল-কিছুকে সত্যে বিধৃত করে। তাই আত্মাই ধর্ম, আর আত্মার উপলব্ধির নাম ধর্ম। ব্রত, যাগযজ্ঞ, পূজা-উৎসব—এ'সব ধর্মের আনুসঙ্গিক বা সহায়ক, এরা আসল ধর্ম নয়। তবে সাধারণের জন্য এ'সবেরও প্রয়োজন আছে। জীব-জগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র, অণু-পরমাণু এ'সব কেমন ক'রে হ'ল, এই জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ কি—এ' সকলের বাস্তব ও চাক্ষুষ জ্ঞানের সন্ধান যে অনুশীলনী বৃত্তি দেয়, তাকে বিজ্ঞান বলে। পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণমূলক পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়। বিজ্ঞান অপার্থিব নিত্যবস্তুর সন্ধান দিতে পারে না, তাই বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা এখনো-পর্যন্ত হয় নি বলতে হবে। তবে অবিশ্রান্তভাবে মানুষের মনের গতি যে তার চরমলক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে—যা থেকে হয়তো ধর্ম ও বিজ্ঞানের পরস্পর-মিতালী অদূর ভবিষ্যতে একদিন-না-একদিন হবেই। বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক্ ঠিক একথাই বলেছেন তাঁর *Where is Science Going*-গ্রন্থে।

'আমি আমার *Spiritual Unfoldment*-গ্রন্থের প্রথমেই বলেছি যে, ধর্ম দু'রকম—essential unessential,—প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় বলতে যা সত্যকারের ধর্ম বা ধর্মের রূপ এবং তা আত্মসত্তা ও আত্মার উপলব্ধি। ঐ উপলব্ধির সহকারী ও আনুসঙ্গিক বিষয় ধর্মের অপ্রয়োজনীয় দিক। বারব্রতপালন, কৃচ্ছ্রসাধন, সংযম, আচার-অনুষ্ঠান ধর্মানুভূতি বা আত্মানুভূতি লাভ করতে এগুলি সাহায্য করে। কিন্তু সাধারণ মানুষ

ঐ আচার-বিচার, নিয়মতান্ত্রিকতার দিকটাকেই প্রধান ভেবে আত্মার উপলব্ধিকে একদিক থেকে ভুলেই যাই আমরা, ফলে ধর্ম ও ধর্মের উদ্দেশ্য হয় নিষ্ফল। তাই ধম কেবলই বাহ্যিক-আচার-অনুষ্ঠান নয়, ধর্ম অন্তরেব ও উপলব্ধির জিনিষ।

'তাছাড়া *Religion of the Twentieth Century*-গ্রন্থে আমি বলেছি যে, ধর্মে বৌদ্ধিকযুক্তির আবশ্যকতা আছে, কেননা যুক্তি ও বিচার ছাড়া ধর্মের যথার্থ-অনুভূতি লাভ করা কঠিন। যুক্তিতর্ক বিজ্ঞানের পরিপূরক। বিজ্ঞান জাগতিক ও প্রাকৃতিক জ্ঞানকে প্রসারিত ও পরিপুষ্ট করে। মোটকথা বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণমূলক ও যুক্তিনিষ্ঠ বিষয়। তাই ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলনের ভাব থাকা প্রয়োজন, নচেৎ ধর্ম কেবলই বাইরের আড়ম্বরযুক্ত নিঃসার অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। বিজ্ঞান যেমন যথার্থ সত্যনির্ধারণের পথে এগিয়ে চলেছে, ধর্মও তেমনি। যুক্তি ও বিচার ছাড়া ধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ হওয়ায় অসম্ভব।

'তাছাড়া ধর্মে জ্ঞান ও অনুভূতির দিকই প্রধান। সেজন্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যেমন কার্য ও কারণ সকল-কিছু সৃষ্টির ও বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, ধর্মের পক্ষেও তেমনি। সেজন্য Fundamental position in cosmology-র মূলসূত্র বেদান্তে ও বিজ্ঞানে অপরিহার্যভাবে দেখা যায়। বর্তমান বিজ্ঞানের অভিযান ও ধর্মের অগ্রগতির মধ্যে বেশ একটি সুসংগত ঐক্যের ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ধর্ম বিজ্ঞানের নীতিকেই গ্রহণ করেছে তার প্রকাশ ও অগ্রগতির জন্য। যুক্তিহীনতা ও বিচারহীনতাকে তাই গ্রহণ করেনি ধর্ম, গ্রহণ করেছে বরং বিজ্ঞানের আলোকে যুক্তিসার্থকতার দিককে!

'তবে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য হ'ল: একটা আছে পথে তৃপ্ত ও পিপাসু মন নিয়ে, আর অপরটা আছে

আত্মতৃপ্ত হ'যে ; একটা পথ বা উপায়, আর অপরটা লক্ষ্য। ধর্ম ও তাই বিজ্ঞান পরস্পরসাপেক্ষ, অথবা বলা যায় একটি অপরটির পরিপূরক। বৈজ্ঞানিকদের ভিতর অনেকে এখন কস্‌মিক এনার্জি (পরাশক্তি) বা গডের (ঈশ্বরের) অস্তিত্ব মানতে আরম্ভ করেছেন। আইনিষ্টিন, জিন্‌স্‌, এডিঙটন, হাইজেনবর্গ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের নাম এই সম্পর্কে করা যেতে পারে'।

কথাপ্রসঙ্গে হয়তো কখনও জ্যোতিষশাস্ত্রের (astrology) কথা উঠতো। স্বামীজী মহারাজ বলতেন : 'সায়েন্স (বিজ্ঞান) হিসাবে এ্যাসট্রোলজিকে (জ্যোতিষশাস্ত্রকে) মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আপত্তি ঐ এ্যাস্‌ট্রোলজি (জ্যোতিষশাস্ত্র) অদৃষ্ট গণনা ক'রে যা বলে তাকে অব্যর্থ ও জীবনে ধ্রুবতারা বলে মেনে নেওয়ায়। আমিও এ্যাস্‌ট্রোলজি ভাল ক'রে পড়েছি, বক্তৃতা দিয়েছি এর উপর আমেরিকায় থাকতে,[১] কিন্তু তাহলেও যে শাস্ত্র মানুষের অদৃষ্ট নিয়ে খেলা করে, আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতার উপর একাধিপত্য বিস্তার করে, বিবেক-বুদ্ধিজীবী মানুষকে দৈবের হাতের যন্ত্রপুত্তলিকা ক'রে তোলে, তার সকল-কিছুর সত্যতা মেনে নিতে আমি রাজী নই। যুক্তির দিক থেকে বলা যায় সংস্কারই মানুষের চরিত্র গঠন করে, সংস্কারের প্রেরণাই প্রবৃত্তির আকারে মানুষ ও জীবজন্তুকে পরিচালিত করে। এই সংস্কারকে ভাঙা ও গড়ার মালিকও একমাত্র মানুষই। মানুষ ভালো-মন্দ কর্ম দিয়ে তার ভালো-মন্দ সংস্কার সৃষ্টি করে, আবার মানুষই কর্ম দিয়ে তার কর্ম ও জীবনগতির পরিবর্তন করে। এককথায় বলতে গেলে মানুষই নিজে তার অদৃষ্টের নিয়ন্তা ও কর্তা, ঈশ্বর বা সয়তানের স্থান সেখানে নেই মানুষের ইচ্ছাই আসলে প্রবল ও ক্রীয়াশীল। তাই ইচ্ছা করলে মানুষ নিজের চেষ্টায় তার কল্যাণের পথকে প্রসারিত করতে পারে, আবার

১। Vide A Study of Heliocentric Science.

অকল্যাণের অভিশাপকে ডেকে আনতে পারে। মোটকথা অ্যাস্ট্রোলজি পামিষ্ট্রি (হস্তরেখার গণনা, কিম্বা সামুদ্রিকবিদ্যা) মানুষের মনে এ' ধারণা ও বিশ্বাসই এনে দেয় যে, অদৃষ্টের প্রভাব ও শক্তিই সব, দৈবের লিখন খণ্ডন করা মানুষের সাধ্য নয়। এতে মানুষের স্বাধীন চেষ্টা ও আত্মসাধীনতা নষ্ট হয়। তাছাড়া দৈব বা অদৃষ্টের প্রভাব অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন মানুষদের উপর বেশী ক'য়ে প্রভাব বিস্তার করে। বৈজ্ঞানিক ও বিচারীরা বলেন অদৃষ্ট ও অলৌকিকীশক্তি দৃষ্টশক্তিরই অব্যক্ত অবস্থা। তবে এ'কথাও আবার ঠিক যে, বিশ্বের সকল বস্তু বা পদার্থ একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রকৃতির রাজত্বে তাই বে-আইন বা অনিয়ম কোনদিন থাকতে পারে না। তাই যাকে বলি 'অদৃষ্ট' বা 'অলৌকিক'-কিছু—তাও লৌকিক ও শক্তিমান একটি নিয়মের (higher law) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। দৃষ্ট নয় বা যথার্থরহস্য জানি না বলেই কোন-কিছুকে আমরা বলি অলৌকিক বা অদৃষ্ট। শ্রীশ্রীঠাকুর লালজবাফুলের গাছে লাল ও সাদা দু'টি জবাফুল দেখোছলেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সাধারণ মানুষ বিস্মিত হয় বটে ও ভাবে সমস্তই মায়ার ভেল্কী, কিন্তু আসলে এ'কথা ঠিক যে, ঐ লালজবাফুলের গাছে সাদাজবাফুল ফুটেছিল প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনেই—যাদও সেই নিয়মটি আমরা জানি না এবং জানি না বলেই অলৌকিক। পাশ্চাত্যদেশের লোকেরা অদৃষ্ট বা দৈব নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না, তাদের কাছে নিজেদের চেষ্টা বা পুরুষকারের মূল্যই বেশী। এ্যাস্ট্রোলজি ও পামিষ্ট্রিকে তারা মোটামুটি সায়েন্স (বিজ্ঞান) হিসাবে গণ্য করলেও এদেরকে প্রাণীর ভাগ্যনিয়ন্তা ব'লে বিশ্বাস করে না। এদের নিয়ে যতো মাতামাতি দেখি কেবল এ' দেশেই (ভারতবর্ষেই) বেশী। তাছাড়া ওদেশে (পাশ্চাত্যে) এ্যাসট্রোলজিকে লোকে পয়সা-রোজগারে উপায় ব'লে গ্রহণ করে না।

'আমার Jumshedpur Lecture -এ অদৃষ্ট ও পুরুষকার নিয়ে

বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। পুরুষকার পুরুষ বা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও চেষ্টা। ইচ্ছা করলে মানুষ সকল কাজই করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। তাই সব-কিছু করাচ্ছেন ভববান— এটা মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়—যদিও শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলেছেন: 'তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছা-ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে এক বিরাট ইচ্ছারূপ মহাপ্রকৃতির উপর দৃষ্টি ও বিশ্বাস রাখতে বলেছেন— তাতে ক'রে নিজের 'কাঁচা-আমি' বা ক্ষুদ্র-অহমিকা ও অভিমান দূর হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তুমি কিছুই নও, তুমি একটি automatic machine in the hand of Nature. ঈশ্বরে প্রপত্তি বা শরণাগতির ভাব আলাদা, আর অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেকে দুর্বল ও শক্তিহীন যন্ত্রভাব ভিন্ন কথা। বরং পুরুষকার বা নিজের পশ্যন্তিবুদ্ধির প্রেরণা ও চেষ্টা নিয়ে অদৃষ্ট বা তথাকথিত বিধিলিপিকে খণ্ডন করা শ্রেয়'।

পরিপূর্ণভাবে না হলেও যতটুকু দেখেছি তা' থেকে এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জ্যোতিষ ও হস্তরেখাগণনাকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ একটি perfect বিদ্যা ও কার্যকরী ফলিত বিজ্ঞান বা এ্যপ্লায়েড সায়েন্স ব'লে স্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন: 'ভাল কর্মের দ্বারা হাতের রেখারও পরিবর্তন করা যায়। দৈব, কবচ, মাদুলি, জলপড়া, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক্ এ'সব নিয়ে যদি চব্বিশ ঘণ্টাই মানুষ মেতে থাকে তবে আত্মচিন্তা ও ভগবচ্চিন্তা সে আর করবে কখন! অনন্ত সম্ভাবনার (infinite posibility) বীজ মানুষের মনের অবচেতনস্তরে সুপ্ত আছে, অধ্যবসায় ও পুরুষকার থাকলে স্বাধীন ইচ্ছার প্রেরণায় সেই সুপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে ফলে-ফুলে সুশোভিত বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। তাই আত্মবিশ্বাসই মানুষের যথার্থকল্যাণের পথকে উন্মুক্ত করে। তাছাড়া সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, আত্মা সর্বশক্তিমান, সকল শক্তি সূক্ষ্ম-আকারে মানুষের মধ্যেই নিহিত

করলে মানুষ তার অগ্রগতির পথ সম্প্রসারিত করতে পারে' —এ'সব কথা।

সকল আলোচনার ভিতর নানান কথার পর হয়তো উঠ্‌তো দর্শনশাস্ত্রের কথা। দর্শনে বিচিত্র রকমের মতবাদ আছে—অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি। স্বামীজী মহারাজ সকল আলোচনাতেই যোগ দিতেন সমানভাবে। অদ্বৈতবাদের প্রসঙ্গে তিনি বলতেন: 'অদ্বৈতবাদ সব শেষের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও ঐ অভিমত ছিল। বৈরাগ্য ও সকল ঐহিক বিষয়ে বিতৃষ্ণা না এলে অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। জ্ঞান বা বিচারপথ বড়ই কঠিন—তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের উপর দিয়ে চলা যেমন কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই করো'। অদ্বৈতজ্ঞানে ক্ষুরধার ও পশ্যন্তী বুদ্ধির প্রয়োজন। অদ্বৈতজ্ঞানের কথা কেবল মুখে বল্লে হয় না, প্রাণে প্রাণে অনুভব করা চাই। বিশ্বাসে ও ব্যবহারে পুরোদস্তুর দ্বৈতবাদী, ,পার্থিব জিনিসের উপর ষোলআনা স্বার্থের আসক্তি, আর দু'চারখানা গ্রন্থ পড়ে যদি মুখে বলো যে ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা, তবে তা' হিপোক্রেসির (কপটতার) লক্ষণ নয় কি? মনে ভাবছো একরকম ও আচরণে করছো আরএক রকম,—এ'রকমটি হ'লে চলবে না। মন ও মুখকে এক ও সমান্তরাল করতে হবে। অদ্বৈতানুভূতি হ'লে সত্য সত্যই মন ও মুখ—কথা ও কাজ সমান্তরাল হয়। তখন মনে যা ভাববে, বাইরে তাই আচরণ করবে। তখনই জগৎকে পরিবর্তনশীল ও ব্রহ্মকে নিজের সত্তা থেকে অভিন্ন এবং অপরিণামী পরমচৈতন্য ব'লে ঠিকঠিক অনুভব হবে। এই অনুভব কিন্তু মন ও বুদ্ধির নয়—বোধির। এই অনুভব বোধে-বোধস্বরূপ। তথাকথিত সংসারের সুখদুঃখজড়িত মানুষ তখনই ঠিক ঠিক মায়াপাশমুক্ত হ'য়ে অখণ্ড ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে। এতটুকু স্বার্থবুদ্ধি ও মায়া-মমতা থাকতে অদ্বৈতানুভূতি হয় না। অদ্বৈতজ্ঞান ও সর্বানুভূতির নাম ব্রহ্মজ্ঞান।

অদ্বৈতজ্ঞানের বিচারশৈলীকে 'অদ্বৈতবাদ' বলে। অদ্বৈতজ্ঞান শেষের কথা। অদ্বৈতানুভূতি হ'লে মনুষ্যজীবনের সকল রহস্যের চিরসমাধান হয়। তখন আর কিছুই বাকী থাকে না জানতে ও বুঝতে—'কিঞ্চিৎ নাবশিষ্যতে'। ব্রহ্মানুভূতি মায়ায় সংসারেই মানুষ লাভ করতে পারে। একেই বলে জীবন্মুক্তি। আচার্য শঙ্কর 'তত্তু সমন্বয়াৎ'। (১।১।৪) বেদান্তসূত্রের এর বিচার করেছেন'।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জ্ঞান ও প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী তা' পূর্বেই বলেছি। প্রাণীতত্ত্ব, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কলাবিদ্যা, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কারশাস্ত্র, রসায়ণশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিদ্যায়ই তাঁর অসাধারণ অধিকার ও অনুভূতি ছিল। তিনি ছিলেন সত্যকারভাবে পশ্যন্তি-বুদ্ধির (intuitive perception) অধিকারী। পশ্যন্তী-মন (truth-seeing mind) নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাই দর্শন করেছিলেন জ্ঞানময় ভগবানের সর্বত্র বিস্তৃত ও সর্বত্র বিস্ফারিত চক্ষু—'সদা পশ্যন্তী সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্'। ঐরকম অবস্থাতেই হয় 'যস্মিন বিজ্ঞাতে সর্ববিজ্ঞানং ভবতি', অর্থাৎ অধিষ্ঠান রূপ ব্রহ্মের বা ব্যাপক ও মূল-চৈতন্যের জ্ঞান বা অনুভতি হলে আর সকল-কিছুর জ্ঞানই অধিগত হয়। আর তখনই ঠিকঠিক ব্রহ্মজ্ঞান।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তুলনামূলকভাবে সকল গ্রন্থের ও বিষয়ের পড়াশোনার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, আর হাল্‌কা, অম্বল-চাকা বা পল্লবগ্রাহী পড়াশোনার চিরদিনই ছিলেন বিরোধী। অন্ততঃ যেকোন একটি বিষয়ে জ্ঞান থাকবে গভীরভাবে, আর বাকী সমস্ত জিনিসের বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকবে কিছু-কিছু—এই ছিল তাঁর অভিমত। তাঁর কথাই ছিল: 'something of everything and everything of something'। তা'ছাড়া ভারতের শাস্ত্রই কেবল পড়বো ও জানবো, অন্য কোন দেশের শাস্ত্র বা

দর্শনের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ ও পরিচয় রাখবো না—এ' ধরনের একোমুখী ও সীমায়িত মনোবৃত্তিকে তিনি গোড়ামী ও সংকীর্ণতার নামান্তর বলতেন। সকল দেশের দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের দেশের সকল-কিছুকে মিলিয়ে (কম্প্যারেটিভ্লি) পড়লে তবেই মন ও বুদ্ধির প্রসারতা অক্ষুণ্ণ থাকে—এই ছিল তাঁর অভিমত। তুলনামূলক অনুশীলন ছাড়া মানুষের পার্থিব জ্ঞান ও অনুভূতিও কোনদিন সম্পূর্ণ ও গভীর হয় না—এ'কথাই তিনি সকল সময়ে বলতেন। তাঁর নিজের জীবনও ছিল ঠিক এই পরিপূর্ণতার অখণ্ডদৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশকে নিয়ে গঠিত! তাই সংসারের সাধারণ খুঁটিনাটির ও সর্বসাধারণের সঙ্গে সকল সময়ে নিজেকে সম্পর্কিত রেখে তিনি ছিলেন সকলের একান্ত দরদী সহানুভূতিসম্পন্ন জ্ঞানদীপ্ত মানুষ। তাই সরলতার সঙ্গে গাম্ভীর্য্যের সংমিশ্রণ ছিল তাঁর চরিত্রে হর-গৌরীর মিলনের মতো। অন্ধবিশ্বাসকে কোনদিনই গ্রহণ করতে পারেন নি তিনি জীবনে! সে'জন্য বলতেন বিশ্বাসের পিছনেও থাকবে বিচার। তাছাড়া ঈশ্বরদর্শন না হওয়া-পর্যন্ত বিশ্বাসের যথার্থরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না এবং বিশ্বাসই শ্রদ্ধার মূর্তিতে দেখা দেয় পরিশেষে জ্ঞানদাতা গুরুরূপে।

কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্মুখভাগ
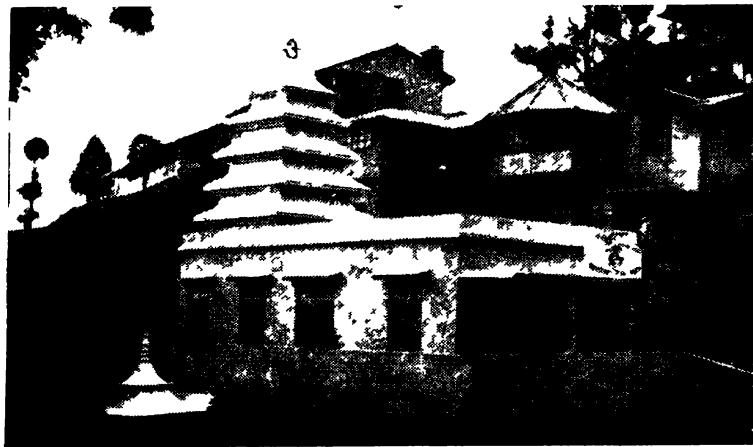
নীচে—দার্জিলিঙ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত আশ্রমে নবনির্মিত মন্দির।
উপরে—দক্ষিণপার্শ্বে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের থাকার ঘর।

ভিক্টোরিয়া-ফল্‌সের যাওয়ার পথে দার্জিলিঙ,
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম
নীচে—দাতব্য-চিকিৎসালয়
উপরে—২য় ও ৩য় তলায় সাধুনিবাস।

॥ স্মৃতি ঃ নয় ॥

আমরা তখন দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে। আনুমানিক ইংরেজী ১৯৩২ কিংবা ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল বা মে মাস হবে। ফগে বা ঘন-কুয়াসায় সারা দার্জিলিঙসহর ঢাকা থাকতো তখন, সূর্যের সাধ্যও নেই কোন রকমে একবার উঁকি মারতে পারে। সকাল সাড়ে আটটা কি ন'টা হবে স্বামীজী মহারাজ তাঁর অফিস-ঘরের চেয়ারে বসে তামাক খেতেন। অফিস-ঘরটি ছিল তাঁর থাকার ঘরের সামনের দিকে,—ছোটখাট অথচ দেখতে বেশ সুন্দর। সেই ঘরের পশ্চিম দিকের কোণে রাখা ছিল একটি বেতের চেয়ার। সামনে একটি ছোট টেবিল, তার উপর থাকতো একটি ফুলের ভাস্। প্রতিাদন সকালে টাট্‌কা-ডালিয়া, গোলাপ, অর্কিডফুল তুলে তাতে সাজিয়ে রাখা হ'ত ও জ্বেলে দেওয়া হ'ত কয়েকটা ধূপকাটি। ধূপের গন্ধে সারা অফিস-ঘবটি ভরপুর হ'য়ে উঠতো। ঘরের দু'দিকে আরো কতকগুলি বেতের চেয়ার সাজানো থাকতো অভ্যাগত দর্শনার্থী ও ভক্তদের বসার জন্য নীচে পাতা থাকতো একটি কার্পেট, মাদুর বা সতরঞ্চি। ঘরটির চারদিকে কাঠের দেওয়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘা, দার্জিলিঙ ও আরো কয়েকটি ভাল ভাল দৃশ্যের ছবি। তাছাড়া ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমার বসা ফটো টাঙানো। জানালাগুলিতে কাচের সার্সি দেওয়া ছিল, জলভরা ঘনকুয়াসা অথবা বৃষ্টি এলে সার্সিগুলি বন্ধ ক'রে দিলেও বাইরের দৃশ্য ও সবার চাইতে উত্তরদিকের সার্সি দিয়ে গগনচুম্বী কাঞ্চনজঙ্ঘার বিস্ময়বিপুল মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যেতো---অবশ্য আকাশ যদি মেঘশূন্য বা কুয়াসামুক্ত থাকতো। অফিস-ঘরের বাইরে দরজার দু'দিকে কাঠের টবে ছিল অর্কিড, গোলাপ ও নানান রকম ফুলের গাছ। ফুল ফুটে থাকতো প্রায় সকল সময়েই। তবে ঠাণ্ডার জন্য ফুলের গন্ধ

বিশেষ পাওয়া যেত না। দরজার সামনে ছিল খানিকটা উঠান। সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো ছিল। তার সামনে এবং আশেপাশে ছিল হরেক রকম ফুলের গাছ, তাতে ফুল ফুটে আলো ক'রে থাকতো চারদিক। অবশ্য এ'সবেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হ'ত মাঝে মাঝে।

সকাল সাড়ে-আটটা—কি ন'টার সময়ে সেখানেও ছিল আমাদের সকলের স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করার পালা। তাই অফিস-ঘরের ডানপাশ দিয়ে আশ্রমবাসীদের থাকার জায়গা থেকে উপরে যে সিঁড়ি উঠেছে সেইখান দিয়ে আস্তে আস্তে একদিন উঠছি আমরা দু' তিন জন মিলে। সিঁড়িটা ছিল সিমেণ্টে তৈরী। তার দু'পাশে ছিল লোহার রেলিঙ্ ও সারি সারি নানান রকম ফুলের গাছ সাজানো। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ে হঠাৎ নজরে পড়লো বামদিকের ঘরের জানালার দিকে। জানালাটা ছিল খোলা। দেখলাম আমাদেরই মধ্যে একজন তামাক খাচ্ছিলেন খোসমেজাজে অথচ গম্ভীরভাবে তাঁর বিছানার উপর বসে। তামাক-খাওয়াটা যদিও ছিল না একেবারে অদ্ভুত রকমের, তবুও দৃশ্যটা ছিল কিছুটা হাস্যকর ও কিছুটা কৌতুকজনক। বন্ধু আমাদের বসেছিলেন ঠিক যেন ধ্যানমৌন মহাদেবের মতো। এলোমেলো লেপ ও কম্বলের স্তূপ তাঁর পাশে রচনা করেছিল একটি অভ্রভেদী হিমালয়, তবে বাঘছালের পরিবর্তে পরণে ছিল তাঁর গেরুয়াকাপড় ও গায়ে কয়েকটা মোটামোটা ধোঁয়াটে রঙের গরম জামা ও মাথায় গেরুয়া-টুপি। সারা-ঘরটি ভরে উঠেছিল তাঁর তামাকের ধোঁয়ায়, আর বাইরের আকাশ-বাতাসও আচ্ছন্ন হয়েছিল নিবিড় ঘন-কুয়াসায়। সবার চাইতে দর্শনীয় বস্তু হয়েছিল বন্ধুর ধোঁয়া-ছাড়ার ভঙ্গীটা—যা হারমেনেছিল চলন্ত রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের ধূম্রকূট-ধোঁয়ার কাছে। তাই বিস্মিত হয়েছিলাম যেমন একদিকে তেমনি হাসিও পেয়েছিল অপরদিকে। পিছনের দরজা দিয়ে ক্রমশঃ এসে

দাঁড়ালাম আমরা স্বামীজী মহারাজের সামনে ও একে একে প্রণাম ক'রে বসলাম পাশের চেয়ারগুলিতে। চাপাহাসি তখনো রয়েছে আমাদের মুখে। স্বামীজী মহারাজ আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: 'কিগো, ব্যাপারটা কি হয়েছে বলো দিখিনি?' আমরা হেসে বল্লাম: 'মহারাজ, ঘরে আগুন লেগেছে'। স্বামীজী মহারাজ একটু শশব্যস্ত ও সচকিত হ'য়ে বল্লেন: 'সেকি? কোথায় লাগলো?' আমরা বল্লাম: 'না—আগুন লাগেনি বটে, তবে দার্জিলিঙমেলের একটা ইঞ্জিন চলেছে প্রবল বেগে নীচের ঘর দিয়ে, ধোঁয়া ছুটেছে তাব কুণ্ডলী হয়ে এঁকেবেঁকে সাপের মতো, আকাশ বাতাস ও সারা দার্জিলিঙসহর বলতে গেলে ধোঁয়ায় হয়েছে আচ্ছন্ন'।

স্বামীজী মহাবাজ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থাকলেন আমাদের মুখের দিকে চেয়ে ছোট্ট শিশুরা যেমন নীরব ও নির্বাক হ'য়ে থাকে অঘটন-কিছু একটা ঘট্‌তে দেখলে। তাঁর কিছুটা অসহায় ও কিছুটা গম্ভীর সেই অবস্থা দেখে অবশেষে সত্যঘটনার সকল-কিছুই খুলে বল্লাম তাঁকে। তিনি শুনে হো হো ক'রে হেসে বল্লেন: 'ওঃ, তাই বলো, আমি মনে করেছিলাম বুঝি সত্যসত্যই কোথাও আগুন লেগেছে। আগুন-লাগায় আর বিচিত্র কি বলো। যা সব ছেলেরা অসাবধানী'। তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লেন: 'তা ও' আর কি শিখবে, আমার কাছ থেকে ঐ আদর্শটাই মাত্র শিখেছে যে, ক্যামন ক'রে হুকো থেকে ধোঁয়া ছাড়তে হয়। ধোঁয়া ছাড়া ভিন্ন আর কি ভাল গুণ আমার দেখেছে বলো'।

আমরা শুনে হাসতে লাগলাম। কিন্তু স্বামীজী মহারাজকে যেন একটু বিষণ্ন দেখলাম। তাঁকে তামাক দেওয়া হ'ল। তিনি তামাক খেতে খেতে বেশ গম্ভীরভাবে আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন:

'গ্যাখো, আমি তোমাদের অনেকবারই বলেছি যে, তোমাদের আদর্শ হবে চেয়ারে-বসা অভেদানন্দ নয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ-যাওয়ার পর কালী-তপস্বীবেশে হিমালয় থেকে কুমারিকা-পর্যন্ত খালি-পায়ে ও একটি কৌপীনমাত্র সম্বল ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছিল যে অভেদানন্দ—সেই অভেদানন্দই হবে তোমাদের জীবনের আদর্শ। কঠোরতা ও সংযম না থাকলে জীবন গঠন কোনদিনই হয় না। জীবনে ত্যাগই আসল। ঠিকঠিক যাঁরা ত্যাগী, তারাই আবার ঠিক ঠিক ভোগী বা ভোগ করতে জানে। ত্যাগময় জীবন না হ'লে ভোগ হয় রোগের কারণ'।

নীরবে নির্বাক হ'য়ে আমরা শুনছি। বলার বা জিজ্ঞাসা করার তখন আর কিছুই ছিল না, শোনারইছিল বরং কেবল আকাঙ্ক্ষা ও আকুল আগ্রহ! স্বামীজী মহারাজের মুখ প্রদীপ্ত ও রক্তিম। তিনি একটু আনমনা হ'য়ে বললেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের) শরীর যাবার পর স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ), গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ) ও সবাই বেরিয়ে পড়লো ভারতবর্ষের যে যার দিকে। আমিও তাই করলাম। কত দেশ পায়ে হেঁটে আমরা ঘুরেছি। সকলেই যে যার স্বাধীনভাবে, কেউ কারু সঙ্গে নয়, কেউ কারু উপর নির্ভর করে নয়। এক একদিকে মুখ ক'রে চলেছি, নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ছিল না, সম্বলমাত্র ছিল একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ, আর মনের অদম্য উৎসাহ ও শক্তি'।

'এবার এলাহাবাদে ঝুঁসির কথাই তোমাদের বলি। ঝুঁসিতে আমি অনেকদিন ঝুপির ভিতর ছিলাম। তার পূর্বে কাশীতে ছিলাম অনেকদিন, কষ্ট পেয়েছিলাম অসুখে। সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজ) আমার খুব সেবা করেছিল। ঝুঁসি ঠিক গঙ্গার ধারে। সামনে এলাহাবাদের ফোর্ট। ধ্যান করতাম ঝুপির ভিতর বসে। সদানন্দ আমার সঙ্গেই ছিল। সে' সময়ে আমি তাকে নিশ্চলদাসের 'বিচারসাগর' পড়াতাম। বিচারসাগরের পঠন-প্যাঠনের চল বাঙ্গালা-

দেশে নাই বল্লে চলে। পণ্ডিত নিশ্চল দাস 'বিচারসাগর'-গ্রন্থের লেখক। 'বৃত্তিপ্রভাকর' প্রভৃতি তাঁর আরও গ্রন্থ আছে। পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে 'বিচারসাগর' মেয়েরাও পড়ে ও চর্চা করে। তখন আমাদের আহার জোটে তো জুটলো না জোটে উপবাস এই ছিল ভাব। কত দিন কত রাত্রে ঠিক এ'ভাবেই কেটে যেত কিছুই হুঁস থাকতো না বেহুঁস হ'য়ে ধ্যান করতাম, ফোর্টের ঘণ্টাও কাণে প্রবেশ করতো না। একদিন ঠিক করলাম যে, অজগরবৃত্তি অবলম্বন করবো। অজগরবৃত্তি হোল নিজে কিছুই চেষ্টা করবো না, বিনা চেষ্টায় খাবার জোটেতো ভাল, নইলে উপবাস। সে'দিন আবার বৃষ্টি হচ্ছিল। অন্য গুহায় একজন নানকপন্থী সাধু ছিল। সে আমায় অত্যন্ত যত্ন করতো। ভিক্ষা করার জন্য সে আমায় অনুরোধ করলে। আমি বল্লাম যে, আজ অজগরবৃত্তি নিয়েছি, ভিক্ষা করবো না। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কি ইচ্ছা ভাখো, বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, সদানন্দেরও সে'দিকে খেয়াল ছিল না, সে গঙ্গার ধারে বসে শাস্ত্র আলোচনা করছিল, এমন সময়ে দেখা গেল আমাদের বহু চির-পরিচিত বরাহনগরের একজন পুরাতন বন্ধু মৈত্র মশায় এসে হাজির। তাঁর হাতে একঝুড়ি মিষ্টি। সদানন্দ দূর থেকে দেখে দৌড়ে এলো। আমিও দেখেও অবাক্। মৈত্র মশাই বল্লেন: 'আমি তোমাদের জন্যে তাড়াতাড়ি আস্‌ছি এই মিষ্টিগুলো নিয়ে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ করুণার কথা ভেবে আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠলো' ভাব্‌লাম গীতার সেই কথা: 'যোগক্ষেমং বহামহ্যম্',—ভগবান ভক্তের ভার নিজেই বহন করেন। মৈত্র মশায় গিয়েছিলেন প্রয়াগে, সেখানে শুনেছিলেন কার কাছ থেকে যে, কালী-তনস্বী থাকে ঝুঁসিতে তাই মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন আমার সঙ্গে ভাখা করতে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণায়ই মৈত্র মশায় এসে হাজির হয়েছিলেন একেবারে আমাদের অজগরবৃত্তির দিনই। ভগবানের

কার্যকলাপ মানুষ আর কতটুকু বোঝে বলো! অন্তর্যামী তিনি, সকলের অন্তরের ভাবই তিনি বুঝতে পারেন।"

স্বামীজী মহারাজ আবার বল্লেন: 'সাধু, ব্রহ্মচারী, মুমুক্ষু ভক্ত—সকলের আদর্শ এ'রকমই হওয়া উচিত। তপস্যাময় হবে জীবন, ভগবানের জন্য পাগলকরা টান থাকবে মনে, তবেই তো। ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ছিল শুনেছ তো? শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাছে ছিলেন স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের বিরহব্যথা এক মুহূর্তের জন্য তারা সহ্য করতে পারতো না। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁদের জীবনে ধ্যান-জ্ঞান। শ্রীরাধার কথা ছিল ভিন্ন। শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তি ও পরমপ্রেমস্বরূপ চৈতন্যময়ী।

কিন্তু সে যাই হোক্, এটা জেনে রেখো যে, ভগবানের জন্য প্রাণ যখন সত্যকারের আকুলি-বিকুলি করবে, তখনই জানবে তোমাদের মনে অনুরাগ জেগেছে, আর তখনই ঠিক ঠিক পার্থিব সুখ-সম্পদের উপর বিতৃষ্ণা আসবে ও যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হবে মনে। সাধক বা ভক্ত তাই বুদ্ধিহীন, চেষ্টাহীন ও ম্যাদাটে হবে কেন? সাধক ভক্তের মনে সর্বদাই এই রোক থাকবে যে, এই জীবনেই ভগবান লাভ করবো—'সংকল্প সাধন কিংবা শরীর পতন'। শুধু লোকদ্যাখানো ভক্তি ও আচরণ দিয়ে জীবনে কোনদিন কিছুই হয় না। শুধু কর্মের-জগতে কেন, ধর্ম ও সাধনের জগতেও হাত-পা ছেড়ে লাফিয়ে পড়তে হবে 'উইথ্ ট্রু সিন্‌সিয়ারিটি' (যথার্থ মন-মুখ এক ক'রে)—তবেই না? কেবল হুঁকোর ধোঁয়াকে সোজা ক'রে ছাড়বো--কি বাঁকা ক'রে ছাড়বো—এই করলে তো আর ভগবান লাভ হয় না, যথার্থভাবে জীবন তৈরীও হয় না! শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগময় জ্বলন্ত আদর্শকে জীবনে মূর্তিমান ক'রে তুলতে হবে। এরজন্য চাই বুদ্ধদেবের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞা: 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু,' অথবা রামপ্রসাদের মতো অচলা ভক্তি। সাধক রসিকচন্দ্র জগন্মাতাকে সম্মুখসমরে আহ্বান ক'রে

বলেছিলেন : 'আয় মা সাধনসমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে'। সাধনজীবনে এ'রকম রোক চাই, তেজস্বিতা চাই ও সঙ্গে সঙ্গে প্রপত্তি ও শরণাগতির ভাব চাই। শুধু রোক ক'রে থাকলে অহংকার মাথা তুলতে পারে, তাই ভগবানের কাছে ভক্তি ও শরণাগতির ভাব চাই। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছ্যাখনা—শ্রীভবতারিণী দেখা দিলেন না ব'লে কি ব্যাকুল-কাতরতা! বলেছিলেন: 'মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমাকে দিলি না?' জীবনে এ'রকম ব্যাকুলতা চাই, তবে তো সিদ্ধি।"

কথাগুলি বলতে বলতে স্বামীজী মহারাজের মুখ রক্তিমাভায় প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠলো। সমস্ত শরীর স্তব্ধ, চক্ষু স্তিমিত ও শান্ত, গড়গড়ার নল মুখেই লেগে থাকলো। মনে হলো যেন ধূলিময় পার্থিব রাজ্য ছেড়ে সুদূর কোন অপার্থিব অজানা এক দেশে তিনি বিচরণ করছিলেন। দিব্যজ্যোতিতে পরিপূর্ণ তাঁর মুখমণ্ডল এবং লাবণ্যময় তাঁর মুখের জ্যোতি! দশ কি পনের মিনিটকাল ঠিক এ'ভাবে কেটে গেল। তারপর একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি অন্যমনস্কভাবে বল্লেন: "শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। সেই ভালবাসায় যে কী আকর্ষণী শক্তি ছিল তা' আমি মুখে কেমন ক'রে আর বোঝাব তোমাদের! তাঁর কাছে গেলে মনে হ'ত তিনিই আমাদের বাপ, মা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন—সব। সেই ভালবাসার কি আর তুলনা আছে! আমাদেরও এমন হয়েছিল যে, তাঁকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতেও ভাললাগত না। অন্তরের সকল কথা তাঁকে খুলে বলতাম, তিনিও শুনে সেই মতো ব্যবস্থা করতেন"

সেবক আর একবার তখন তামাক দিয়ে গেল। স্বামীজী মহারাজ আস্তে আস্তে তামাক টানতে টানতে হেসে বল্লেন: "তবে হ্যাঁ, একবার কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল আর সেই ছাড়াছাড়ি থেকে আমি বুঝেছিলাম তিনি আমায় কত ভালবাসেন'।

আমরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তখন জিজ্ঞাসা করলাম: 'কখন্ সে'ই ছাড়াছাড়ি হয়েছিল মহারাজ?' স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'ঐ যে, যখন আমি বরাবর-পাহাড়ে গিয়েছিলাম একজন হটযোগীর কাছে। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে যোগশিক্ষা করার তীব্র বাসনা ছিল। দক্ষিণেশ্বরে যখন প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা হ'ল, তখনও তাঁকে আমি যোগশিক্ষার কথা বলেছিলাম। কলেজ ষ্ট্রীটে এলবার্ট হলে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির মুখে প্রথম পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাখ্যা শুনি, সে' বক্তৃতাই বলতে গেলে আমার মনে যোগভ্যাস করার বাসনা জাগিয়ে তুলেছিল। জলখাবারের পয়সা জমিয়ে পাতঞ্জলদর্শনের একখানা বই কিনেছিলাম। সংস্কৃতের উপর আমার বরাবরই অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। পাতঞ্জলদর্শন ভাল ক'রে পড়ার জন্য একদিন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কাছে হাজিরও হয়েছিলাম'।

অধৈর্যের দল আমরা তখন অস্থির হ'য়েও পড়েছিলাম স্বামীজী মহারাজের মুখ থেকে সেই বরাবর-পাহাড়ে হঠযোগীর কাছে যাওয়ার ঘটনা শোনার জন্য। তিনিও আমাদের আর প্রশ্ন করার অবসর দেননি। গায়ের গরম-কাপড়টি আরো একটু ভাল ক'রে জড়িয়ে নিয়ে তিনি বল্লেন: 'যোগশিক্ষা করার নেশা তখনও আমার মোটেই কাটেনি। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মুখে হঠযোগীর কথা শুনে ঠিক ক'রে ফেল্লাম যে বরাবর-পাহাড়ে (গয়ার কাছে) আমি যাব। সুতরাং বেরিয়ে পড়লাম একদিন কাকেও কিছু না ব'লে। শ্রীশ্রীঠাকুরও সেকথা জানতেন না। রেলভাড়ার পয়সা কোন রকমে জোগাড় ক'রে কাশীপুর থেকে গঙ্গা পার হলাম। তখন সেই মাত্র ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। সামান্য রক্তিম পূর্বদিক। বালি-ষ্টেশনে উপস্থিত ও যথাসময়ে গাড়ীতে চড়ে গয়ায় পৌঁছালাম তার পরের দিন সকাল সাড়ে-সাতটা—কি আটটায়। ষ্টেশন থেকে প্রায় চার ক্রোশ পায়ে হেঁটে হাজির হলাম একেবারে বরাবর-পাহাড়ের পাদদেশেই।

পাহাড়ের তলায় ছিল ছোট ছোট গ্রাম এখানে সেখানে ছড়ানো। দুনিয়ার কর্ম-কোলাহল থেকে সেই সব গ্রামের মানুষ ছিল একেবারে দূরে, আর-সরল স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনই ছিল যেন তাদের কাম্য! গ্রামের লোকদের কাছ থেকে হটযোগীর গুহার খবর জেনে নিয়ে উঠতে লাগলাম ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে। চারদিকে ঘনজঙ্গল, আর জায়গায় জায়গায় ছিল কাঁটাগাছের ছোট ছোট ঝোপ। অনেকক্ষণ চলার পর দূরে দেখতে পেলাম একটা গুহার ভিতর বসে আছেন একজন সাধু। তার সম্মুখে জ্বলছে একটা ধুনি, আর চারদিকে তাঁকে ঘিরে বসে আছে দু'তিন জন লোক। লোকগুলির পরণে ছিল সাদাকাপড়, সাধুজীর শিষ্য বোলেই তাদের মনে হলো। সাধুর চেহারাটা ছিল অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির, ভীষণ রুক্ষশুষ্ক। দেখেই প্রাণ গেল শুকিয়ে। ভাবলাম উনিই হবেন বোধহয় হটযোগী—যাঁর কথা বলেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। আমায় সম্মুখে যেতে দেখে সাধুর শিষ্যগুলো পাথর ছুঁড়ে মারবার উপক্রম করলে আমি কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে চলতে লাগলাম ও চলতে চলতে হাজির হলাম একেবারে তাদের সামনে। কাছে গিয়েই 'ও নমো নারায়ণায়' ব'লে একটা প্রণাম ঠুকে দিলাম। আমার পরণে ছিল গেরুয়া ও হাতে কমণ্ডলু। তারা ভাবলে আমি সন্ন্যাসী, সুতরাং বেঁচে গেলাম সে যাত্রায় কোনরকমে'।

'পাহাড়ের উপর আশ্রমটা মন্দ ছিল না। বেশ নির্জন, কাছে লোকালয়ের নামগন্ধ ছিল না। কিন্তু কি জানি কেনপরিবেশটাআমার মোটেই ভাল লাগছিল না। সাধুকে দেখে মনে হোল অঘোরপন্থী। অঘোরপন্থীরা তান্ত্রিকদেরই আলাদা একটা ক্লাশ (শ্রেণী)। তাঁরাও যোগসাধনা করেন। তাদের আচার-ব্যবহার সাধারণের চোখে অত্যন্ত কদর্য মনে হয়। মড়ার আধপোড়া মাংস মাথার খুলিতে ক'রে তারা আহার করে। বিশেষ ক'রে মরা মানুষের মাথার ঘি তাদের অত্যন্ত

প্রিয়। কচিছেলের মাংসও তাঁরা নাকি কখনো কখনো খান। কাপালিকরা এদেরই ভিন্ন একটা ক্লাশ (শ্রেণী)। কাপালিকদের চেহারা অত্যন্ত ভীষণ। তাদের আচার-ব্যবহার আরো ভয়ঙ্কর। মা কালীর সামনে তারা মানুষকে বলি দেন ও মাথাহীন কবন্ধশরীরের উপর বসে গভীর রাত্রে তাঁরা শক্তি সাধনা করেন। তন্ত্রে শবসাধনার কথা আছে, কিন্তু এই সাধনা কাপালিকদের মতো নয়।[১]

১। বঙ্কিমচন্দ্রের (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কাপালিকের প্রসঙ্গ আছে। শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র কিছুদিন মেদিনীপুরে অতিবাহিত করেছিলেন (১৮৪ -১৮৪৯)। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর-জেলার নেগুঁয়া-মহকুমায় ২১শে জানুয়ারীতে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টাররূপে কার্যভার গ্রহণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তখন থেকেই তাঁর মনে সমুদ্র-সৈকতের (বালীয়াড়ীস্থানের) প্রভাব মনে পড়ে এবং তারই ফলস্বরূপ ছ'বছর পরে 'কপালকুণ্ডলা'-উপন্যাসের জন্ম হয় (১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কলকাতা থেকে কপালকুণ্ডলা'—উপন্যাস প্রকাশিত হয়)।

'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া-মহকুমাতে (এক্ষণে কাঁথি-মহকুমা) ছিলেন তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে সেই (কাপালিক) আসিত। যখন তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গলোয় বাস করিতেন তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছু দূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বন-জঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে, ঐ সন্ন্যাসী (কাপালিক) সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থান হইতে খুলনা-মহকুমায় (খুলনা তখন জেলা ছিল না) বদলি হন"।

শ্রীরতনকুমার দাশগুপ্ত এসম্বন্ধে লিখেছেন: "তখন নেগুঁয়া-মহকুমার অধীনে ছিল অনেক গ্রাম—দৌলতপুর, বীরকুল, পটাসপুর, ভগবানপুর, কাঁথি, রামনগর, খেজুরী।···বঙ্কিমচন্দ্র এখানে থাকাকালীন দরিয়াপুর, চাঁদপুর, বীরকুল প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন।—এই দরিয়াপুরের কাছেই কপালকুণ্ডলা-

বরাবর-পাহাড়ে সাধুজীর শিষ্যদের দেখে আমি কিন্তু বেশ হতাশ হয়েছিলাম। দেখলাম তাঁর একটি শিষ্য আবার ভীষণ হাঁপানি-রোগে কষ্ট পাচ্ছে। শিষ্যদের দেখে গুরুর অবস্থা খানিকটা অনুমান করা গেল। তখন হঠযোগী-সাধুর উপর আমার শ্রদ্ধার ভাব অনেক কমে এলো, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তে লাগলো করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তাঁর অহেতুকী ভালবাসার কথা! কী তীব্র আকুল-করা একটা আকর্ষণের ভাব আমার হৃদয়ে তখন অনুভূত করতে লাগলো। ভেসে উঠতে লাগলো চোখের সামনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই স্নেহপূর্ণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানি। সে' জায়গা থেকে তখন পালানোই শ্রেয় মনে করলাম। কিন্তু পালাবো ক্যামন ক'রে সে' চিন্তাই আমাকে অস্থির ক'রে তুল্লো। শেষে মতলব করলাম যে, জল-আনার অছিলা ক'রে মারবো চোঁচাদৌড়। করলামও তাই। হঠযোগীর কাছে কমণ্ডলু ক'রে জল আনার অনুমতি

মন্দির। রসুলপুর থেকে চাঁদপুর এই তিরিশ মাইল পথ ছিল সাগরসৈকতে। এই পথ এখন ঘনজঙ্গলাকীর্ণ, মনুষ্যবাসের অনুপযোগী। এই জঙ্গলাকীর্ণ সাগরসৈকতের স্থান দীর্ঘ তিরিশ বৎসরের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। এইটিই কপালকুণ্ডলা-উপন্যাসের আসল পটভূমি। চাঁদপুরের ডাকবাঙলোতে থাকতেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, তা আজ বিলুপ্ত। অবশ্য সেই চাঁদপুর গ্রাম আছে। সেখানেই কাপালিকের তিনি দেখা পেয়েছিলেন। সেই কাপালিক তাঁকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) যেতে রাজী হননি। পরে নেগুঁয়া থেকে মহকুমাসহর কাঁথিতে উঠে আসে। ইংরাজ-বণিকদের প্রাচীন কাগজপত্রে কাঁথির নাম কেণ্ডোয়া (Kendoa) বলে উল্লেখ আছে"—।

চেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম বাইরে ও কিছুদুর গিয়েই ছুটতে লাগলাম প্রাণপণে। চারদিকে কাঁটাগাছের ঝোপ, ছুটতে ছুটতে পা রক্তাক্ত হ'য়ে গেল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরে নামই আমার একমাত্র সম্বল। কোনদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে দৌড়ুতে লাগলাম সোজা—যে পথ ধরে এসেছিলাম গয়াষ্টেশন থেকে। সাধুজীর চেলারা পাথর ছুড়তে আরম্ভ করলো আমাকে দৌড়ে পালাতে দেখে। আমারও তখন প্রাণের ভয়, দৌড়তে লাগলাম প্রাণপণে। অবশেষে হাজির হলাম গ্রামের একটা ধর্মশালায়। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চারদিকে গাঢ়-অন্ধকার। ধর্মশালায় কোনরকমে রাত্রিটা কাটালাম। অধিক রাত্রপর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তাই কেবল মনে হ'তে লাগলো। চারদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ, আর ঘন-অন্ধকার। রাত্রিটা কাটলো কতকটা জেগে, কতকটা ঘুমিয়ে। ভোর হ'তে না হ'তে চলতে লাগলাম গয়াষ্টেশনের দিকে। অবশেষে ষ্টেশনে এসে তবে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলাম। ষ্টেশনে গাড়ি হাজির হ'ল তার কিছুক্ষণ পরে। টিকিট কেটে গাড়িতে (ট্রেনে) উঠে বসলাম। সারা রাস্তাটা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাই কেবল মনে হচ্ছিল, আর আকুলি-বিকুলি করছিল প্রাণটা তাঁকে দেখার জন্য। তার পরদিন প্রায় ভোরের দিকে গাড়ী এসে থামলো বালিষ্টেশনে। গাড়ী থেকে নেমে গঙ্গা পার হলাম। তারপর একেবারে ধূলোপায়ে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে গিয়ে হাজির হলাম। দু'চোখ তখন জলে ভরে উঠেছিল। কুণ্ঠিত মন নিয়ে হাজির হলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ও প্রণাম করলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে'।

'শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাঁর ঘরের ছোট্ট তক্তাপোষটির উপর বসে ছিলেন। আমায় দেখেই আনন্দে অধীর হ'য়ে বল্লেন : 'কিরে, এ্যাদ্দিন আমায় না ব'লে কোথায় ছিলি বল্ ?' তখন অন্থোপান্ত তাঁকে খুলে বল্লাম বরাবর-পাহাড়ের কাহিনী ! তিনিশুনেই হো হো ক'রে হেসে

উঠলেন। স্নেহের চক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞাসা করলেন : 'তা— হঠযোগীকে ক্যামন দেখলি বল্‌দিকিনি? লাগলো ভাল তো?' আমি মাথা হেট ক'রে বল্লাম : 'মোটেই ভাললাগেনি'। শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে অথচ ইষৎ হেসে বল্লেন : 'হ্যাঁ, ভাললাগবে কেন বল্‌? বড় বড় সাধু আর সিদ্ধযোগী যে যেখানে আছে, সবাইকে তো আমি জানি। চারখুঁট ঘুরে আয়, (নিজের বুকে হাত দিয়া) এখানে যা দেখছিস্‌, এমনটি আর কোথাও পাবিনি'। এই ব'লে প্রাণখুলে আমার মাথায় হাত রেখে আমায় তিনি আশীর্বাদ করলেন। প্রাণের সমস্ত অশান্তি ও গ্লানি তখন নিমিষের মধ্যে দূর হ'য়ে গেল। তারপর সস্নেহে বল্লেন : 'ছাখ্‌, অকূলসমুদ্রে পড়ে মাস্তুলের পাখী যেমন চারদিক ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে শেষে মাস্তুলেই এসে বসে,[১] তেমনি চারখুঁট না ঘুরে দেখলে কি আর এখানকার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) কদর কেউ বুঝতে পারে? তা' ভালই করেছিস হঠযোগীকে দেখে এসে'।

আমরা তখন জিজ্ঞাসা করলাম : 'মহারাজ, আপনারা বরানগর-মঠে শাস্ত্রানুসারে বিরাজাহোম ক'রে সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ বিরাজাহোমের মন্ত্রাদি নাকি আপনিই সংগ্রহ করেছিলেন একজন দশনামী-সন্ন্যাসীর কাছ থেকে?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'হ্যাঁ, সেটা হয়েছিল গয়ার কাছেবরাবর-পাহাড়ে যখন ঐ হঠযোগীর কাছে যাই। সেই

১। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৬।৮।২) এ'রকমের একটি উদাহরণ আছে। সেখানে মনরূপ জীবাত্মাকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে : 'স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বাহন্যত্রায়তনমলব্ধা বন্ধনমেবোপশ্রয়তে, এবমেব খলু সোম্য! তন্মনো * * প্রাণবন্ধনং হি সোম্য'।—অর্থাৎ সুতা দিয়ে বাঁধা পাখী যেমন চারদিক ঘুরে ঘুরে ও অন্য কোন আশ্রয় না পেয়ে অবশেষে বন্ধনে অর্থাৎ নিজের খাঁচাতেই ফিরে আসে, তেমনি * * পরমাত্মাই মনের তথা জীবাত্মার একমাত্র আশ্রয়।

কাহিনী তো তোমাদের এতক্ষণ বল্লাম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন কাশীপুরের বাগানে সন্ন্যাসীবেশে অর্থাৎ মুণ্ডিতমস্তকে ও কমণ্ডলুহস্তে এসে আমাদের বলেন যে, গয়াধামের কাছে বরাবর-পাহাড়ের একটি গুহায় একজন সিদ্ধ-হঠযোগীকে দেখে এলাম। শুনে তখনই আমার একান্ত ইচ্ছা হ'ল সেই হঠযোগীকে দেখবার। সুতরাং গেলাম বরাবর-পাহাড়ে কিভাবে সেকথা বলেছি।

'কথা এই যে, যখন সকলকে জিজ্ঞাসা করতে করতে খালিপায়ে জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম বরাবর-পাহাড়ের দিকে তখন অবশেষে হাজির হলাম একটি ছোট্টগ্রামে। গ্রামটি ছিল পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ঐ গ্রামের শিবমন্দিরে একটি ধর্মশালা ছিল। আমি হটযোগী-সাধুর াছ থেকে ফেরার সময়ে রাত্রে ঐ ধর্মশালায় রাত্রিযাপন করলাম।

'সৌভাগ্যের বিষয় যে,সেখানে তখন একজন 'পুরী'-নামা দশনামী সন্ন্যাসী আমার মতো রাত্রিযাপন করার জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। দু'জনে একসঙ্গে থাকায় রাত্রে তাঁর সঙ্গে বেশ পরিচয় হ'ল। পরিচয়ে জানলাম তাঁর কাছে সন্ন্যাসপদ্ধতির ও বিরজাহোমের একটি পুঁথি ছিল। আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম তাঁর পুঁাথ থেকে সন্ন্যাসের পদ্ধতি ও বিরজাহোমের মন্ত্র লিখে নেবো। তিনি সম্মত হলেন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে পুঁথিটি সংগ্রহ ক'রে আমার কাছে যে খাতা ছিল তাতে সেই পুঁথি থেকে বিরজাহোমের মন্ত্রগুলি, প্রেষমন্ত্র, মঠ, মড়ি যোগপট্ট যাবতীয় বিষয় লিখে নিলাম। তারপর ভোর হ'লে 'পুরী'-নামা সাধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এ' সমস্তই শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) ইচ্ছা ও আশীর্বাদ। ঐ বিরজাহোমের খাতার মন্ত্র ও নির্দেশগুলিই বরানগর-মঠে যখন সন্ন্যাসের অনুষ্ঠান হয় তখন কাজে লাগে। বরানগর-মঠে সন্ন্যাস-

অনুষ্ঠানের সময়ে আমিই তন্ত্রধারকের কাজ করেছিলাম। স্বামীজীর (বিবেকনন্দের) আদেশে'।[২]

আমরা তখন জিজ্ঞাসা করলাম : 'মহারাজ, বরানগরের এটাই কি আপনাদের যথার্থভাবে সন্ন্যাসগ্রহণ ?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'যথার্থভাবে বলতে তোমরা কি বলতে চাইছো ? শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের এগারো জনকে সন্ন্যাস বহুপূর্বেই দিয়েছিলেন। মুরুব্বি গোপাল দাদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) স্বেচ্ছায় গঙ্গাসাগরযাত্রী সাধুদের গেরুয়াবস্ত্র দান করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর তা জানতে পেরে গোপাল-দাদাকে ডেকে বলেন : 'গেরুয়া-কাপড় কিসের জন্য করা হচ্ছে ?' গোপাল-দাদা বল্লেন : 'জগন্নাথঘাটে গঙ্গাসাগরমেলায় যাওয়ার জন্য যে সাধুরা এসেছেন তাঁদের দেব স্থির করেছি'। শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বল্লেন : 'তুই আমার সন্তানদের দে, এরা এক একজন হাজারী-সাধু, এদের দিলে তোর হাজারগুণ ফল হবে। গোপাল-দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় সম্মত হয়েছিলেন। তখন এগারোটি রুদ্রাক্ষের মালা ও এগারোখানি গেরুয়া-কাপড় ঠাকুরের এগারোজন সন্তানকে তিনি দান করেন। রুদ্রাক্ষের মালা ও গেরুয়াকাপড় পেয়ে আমরা তখুনিই শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে এসে গৈরিকবস্ত্র ও মালা পরলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের আশীর্বাদ করলেন।'[৩]

২। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহাদের (শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের) বিরজাহোম সম্পন্ন ক'রে সন্ন্যাসগ্রহণ ঐ সময়ে বরাহনগর মঠেই হয়। অনেকে বলেন যে, আটপুরে বাবুরাম মহারাজের বাটীতে খ্রীষ্টমাস-উপলক্ষ্যে তাঁরা যে হোম করেছিলেন সন্ন্যাসানুষ্ঠান নাকি সে সময়েই হয়। কিন্তু এ'কথা ঠিক নয়।

৩। এ' সম্বন্ধে স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ-লিখিত **History of the Ramakrishna Math and Mission** (1957)-গ্রন্থে ৬৫-৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ-লিখিত 'আমার জীবনকথা'-র পাণ্ডুলিপি, স্বামী শিবানন্দ মহারাজ লিখিত একটি পত্র (৮ই জানুয়ারী, ২৮৯০) এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের 'স্মৃতিকথা'-গ্রন্থ

তারপর মহারাজ স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) পূর্বপ্রসঙ্গ তুলে বল্লেন : 'দেখো, স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) আমায় কি ভালই না বাসতেন। এখন শুনি নাকি স্বামীজীকে আমি বিশেষ মান্য করি না। তোমরা তো আমার 'বিবেকানন্দ এ্যাণ্ড হিজ্ ওয়ার্ক'-গ্রন্থটি পড়েছ ? কি রকম লাগে বলতো ? আচ্ছা—ঐ গ্রন্থ পড়ে বুঝতে পারবে স্বামীজীকে আমি মানি না—কি ভালবাসি না'।

আমরা বল্লাম : 'সেকি কথা মহারাজ ? অপূর্ব আপনার ভাষার মাধুর্য ও শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রকাশভঙ্গী বইয়ের প্রতিটি কথায় স্বামীজীর প্রতি আপনার নিবিড় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব ফুটে

(পৃঃ ৫৮) থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ সম্বন্ধে তিনটি অভিমতের বা সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন—যেগুলির মধ্যে সন্ন্যাসগ্রহণকারীদের নামের কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ প্রথমে লিখেছেন : "Most probably they also took monastic name from that day. But unfortunately the exact date is missing perhaps forever. With regard to this subject, a passage discovered by the duciples of Swami Abhedananda in his unpublished autobiography presented here in translation ... ...

"At the foot of the hill (*Barabar-phada*) he (Abhedananda) meet a work of the Puri Order of Sankaracharya, from whom he copied down the Mantras of Viraja-Homa, as also esoteric designations of that Order, to which, lay the way, Tota Puri also belonged, Evidently, Kali (Abhedananda) used these Mantras in the Viraja-Home described above". কিন্তু স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ ঠিক সেই প্রমাণপঞ্জী গ্রহণ করতে সংশয়যুক্ত কেন জানি না—"We have no authority to question the validity of their reading."

তারপর গম্ভীরানন্দ মহারাজ "The next important reference"-কথার উল্লেখ ক'রে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ-লিখিত (৮ই জানুয়ারী, ১৮৯০) পত্রের উল্লেখ করেছেন—যে উল্লেখের মধ্যেও কিছুটা সন্দেহ থেকে গেছে। তারপর স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের 'স্মৃতিকথা' থেকে এই

উঠেছে। গুরুভাইয়ের উপর গুরুভাইয়ের অগাধ ভক্তি ও অফুরন্ত ভালবাসার নিদর্শন সত্যই আপনার ঐ বইখানির পাতায় পাতায় পরিস্ফুট'।

স্বামীজী মহারাজ হেসে বল্লেন : 'ঠিক বলেছ। প্রশংসাবাদেরও অর্থ আমি বুঝি। স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) বিরাট ব্যক্তিত্ব ও তাঁর পাশ্চাত্যে সাফল্যময় কর্মপদ্ধতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্যই তো আমার 'বিবেকানন্দ এ্যাণ্ড হিজ্ ওয়ার্ক' বইটি লেখা। স্বামীজী যে কত বড় ছিলেন, কত মহান্ ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল যে কি নিবিড় ও কত মধুর,—তা' আর অপরে কি ক'রে বুঝবে! শুধু বাইরের আড়ম্বরই সব-কিছু নয়, প্রাণে প্রাণে সম্বন্ধটাই আসল'।

আমরা বল্লাম : 'মহারাজ, 'বিবেকানন্দ এ্যাণ্ড,হিজ্ ওয়ার্ক'-বইটির ভাষার লালিত্য ও গাম্ভীর্য অতুলনীয়। আপনার অপরাপর গ্রন্থের ভাষা থেকে এই ছোট অথচ মহান গ্রন্থের ভাষা ভিন্ন রকমেরই। ছন্দমাধুর্য এতে সুপরিস্ফুট।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলেছ। বইখানির ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত, তাই এত ভাল হয়েছে। আমেরিকায়ও এ' বইটির খুব প্রশংসা ও সমাদর হয়েছিল।

আমরা বল্লাম : 'গ্রন্থের ভাষা যেমন প্রাণবান, তেমনি উদ্দীপনাময়ী। আপনিই তো লিখেছেন :

সন্ন্যাস-অনুষ্ঠানের একটি বিবৃতির উল্লেখ করেছেন—যার মধ্যেও সন্ন্যাসনামের মধ্যে বেশ-কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং কোন্ ঘটনা ঠিক বা সত্য তার যথাযথ নির্ণয় এখনো-পর্যন্ত হয়নি। আমরা কিন্তু আমাদের আচার্যদেব স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছে বহুবারই প্রত্যক্ষভাবে শুনেছি যে, তাঁর 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে লিখিত ঘটনাটি ও ঘটনার তারিখ ভালভাবে মনে করেই (স্মৃতি থেকেই) তিনি লিখেছেন, সুতরাং এটিকেই আমরা প্রামাণিক বলে গ্রহণ করি।

'These storms of opposition instead of qunchinge the fire of the spiritual truth of Vedanta that was burning upon the altar of the God-inspired soul of this Hindu preacher, fanned it into a blaze of light, the glory of which was visible from shore to shore, nay from accross the waters of the Atlantic ocean'[৪]

'The great soul thus passed away, his fame as a great Yogi, as a spiritual teacher, a riligious leader, a patriot saint, as a writer and an orator and above all, as the most disinterested worker for humanity had reached its climax and when new calls for greater work were ringing in his ears. As a lover of freedom, he could not have chosen a more auspicious day that the fourth of July, when the almosphere around our planet was reverberating with the thoughts of freedom that were arising from the free souls of the American nation.'[৫]

'তা' ছাড়া স্বামিজীর (বিবেকানন্দের) প্রতি যেখানে আপনার ভালবাসা, শ্রদ্ধাবনতি ও আত্মনিবেদনের সরল-স্বচ্ছন্দ ভাব সুপরিস্ফুট হয়েছে, সেখানকার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী আরো সুন্দর। যেমন—

'Before I close, I must tell you that I had the honour of living with this great Swami in India, in England, and in this country. I lived and travelled

৪। 'বিবেকানন্দ এ্যাণ্ড হিজ ওয়ার্ক', (১৯৩৭), পৃঃ ১১

৫। ঐ পৃঃ ২৫-২৬

with this great spiritual brother of mine, saw him day after day and night after night, and watched his character for nearly twenty years, and I stand here to assure you that I have not found another like him in these three continents, and that no one can take the place of this wonderful personage. As a man, his character was pure and spotless ; as a philosopher, he was the greatest of all Eastern and Western philosophers. In him, I found the ideal of Karma-Yoga, Bhakti-Yoga, Raja-Yoga and Jnana-Yoga ; he was like the living example of Vedanta in all its different branches.'[৬]

বিশেষ ক'রে যেখানে অভেদানন্দ মহারাজ লিখেছেন : 'He is my comfort and solace. He is senior brother to the whole world'. [৭] —অর্থাৎ 'তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) আমার সুখ-সান্ত্বনা, তিনি সমগ্র বিশ্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আসনে সমাসীন'—সেখানে প্রাণের সরল স্বীকৃতি আমরা সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করি'।

মহারাজ বল্লেন : 'কি জানি বাবু, স্বামীজীকে আমি অন্তর দিয়ে যেমনটি দেখেছি ও বুঝেছি, তেমনিটি গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকলের ভার স্বামীজীকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'নরেন, এদের তুই দেখ্‌বি'। তাই স্বামীজী ছিলেন আমাদের কেন্দ্রাধিপতি'।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আমাদের দিকে চেয়ে স্বামীজী মহারাজ পুনরায় বল্লেন : 'Be orginal or die.' জীবনের স্বাধীনতা ও

৬। বিবেকানন্দ এ্যাণ্ড হিজ ওয়ার্কস, (১৯৩৭) পৃঃ ২৮–২০
৭। ঐ পৃঃ ৩১

স্বাতন্ত্র্যবোধ একটা বড় জিনিষ। মানুষ যদি অনুকরণ ক'রে ক'রে কেবল অচলায়তন ও গতানুগতিকতার পথে চলে, তবে সে একটা মেশিনে বা যন্ত্রে পরিণত হয়। তাই মানুষের মধ্যে যদি স্বাতন্ত্র্য কিছু না থাকে তবে তার জীবনের কোন সার্থকতা থাকে না। লণ্ডনে থাকতে স্বামীজীকে (বিবেকানন্দকে) আমি একবার বলেছিলাম : 'দেখ, আমার লেখার মধ্যে তোমার ভাষা (ইংরাজী) কিন্তু আমি মোটেই অনুকরণ করিনি'। স্বামীজী তা' স্বীকার করেছিলেন'।

আমরা বল্লাম : 'স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) ভাষারও সত্য তুলনা নাই। তিনি ছিলেন 'born-preacher' (জন্ম থেকে বক্তা)। তাঁর অগ্নিময়ী ভাষা একটা সাইক্লোনিক(ঘূর্ণি) তরঙ্গের সৃষ্টি ক'রে সকল শ্রোতা ও পাঠককে যেন উত্তাল প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়ে নিতে যেতো, সবার ভিতর একটা প্রচণ্ড উন্মাদনার ভাব সৃষ্টি করতো, আর আপনার ভাষার মধ্যে পাই শান্ত-সমাহিত ও সংযত ভাবের ইঙ্গিত—যার যুক্তিতর্কপূর্ণ কন্‌ষ্ট্রাকৃটিভ(গঠনমূলক) একটি ধারা'।

স্বামীজী মহারাজ ঈষৎ একটু হেসে বল্লেন : 'তা কি জানি বাবু, দু'জনের ভাষার মধ্যে বৈশিষ্ট্য তো একটা থাকবেই। প্রত্যেক মানুষের রুচি ও প্রকৃতি যেমন ভিন্ন ভিন্ন, লেখার ষ্টাইল ও ভাষার বাঁধুনিও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন বা বিচিত্র হওয়া স্বাভাবিক। সকল মানুষের মুখকে ভেঙে যেমন একই রকমের করা যায় না, সবার লেখার ধারাকেও তেমনি একই ধরনের করা অসম্ভব। তবে স্বচ্ছতাই জানবে লেখার আসল তত্ত্বকে প্রকাশ করে। যত transparent (স্বচ্ছ) হবে নদীর বা পুষ্করিণীর জল—তা গভীর হলেও তার তলা (তলদেশ) পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। তেমনি লেখার ও রচনার ভাষা বা ভাষার construction (গঠন) বেশী শক্ত ও ধোঁয়াটে হ'লেই যে তার ভাব গভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হবে—এমন কোন কথা নেই। যিনি যে জিনিষটা যত বেশী পরিস্কার ক'রে প্রকাশ করতে পারেন,

তাঁর বলার ভঙ্গী ও লেখার ভাষা ততই স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়। আচার্য শঙ্করের ভাষা দেখেছ তো ক্যামন প্রসন্ন অথচ গম্ভীর' ?

ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারটা বেজেছে। স্বামীজী মহারাজ তাঁর চিঠিপত্র লেখার জন্য তখন উঠে দাঁড়ালেন। আমারাও উঠে বাইরে এলাম।

আর একদিনের কথা। স্বামীজী মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দেরই কথাপ্রসঙ্গে বল্লেন : 'স্বামীজীর কাণ্ডকারখানা তো জানোই। তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন লণ্ডনে। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) তার পূর্বেই উপস্থিত হয়েছিলেন লণ্ডনে। আমি লণ্ডনে পৌছুলে ব্লুমস্‌বেরী-স্কোয়ারে খৃষ্টো-থিয়োসফিক্যাল-সোসাইটীর হলে (Hall) স্বামীজী একদিন আমার লেকচারের (বক্তৃতার) ব্যবস্থা করেছিলেন। আসলে ঠিক ছিল স্বামীজী নিজেই বক্তৃতা দেবেন, কিন্তু তাঁর মনে মনে সঙ্কল্প ছিল অন্য রকমের। ২৭শে অক্টোবর, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। সে'দিন আগে থেকে ডেকে আমায় বল্লেন : 'তোমাকে সোসাইটি-হলে (Hall) আজ বক্তৃতা দিতে হবে'। আমি তো শুনে অবাক্। সোজাসুজি বক্তৃতা দিতে অস্বীকার করেই বসলাম। বল্লাম : 'জানতো, পাব্‌লিকের (জনসাধারণের) সামনে বক্তৃতা আমি কোনদিনই করিনি'। স্বামীজী বল্লেন : 'তা আমি জানি, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ ক'রে তৈরী হও'। তবুও আমি ঘোর আপত্তি জানালাম। কিন্তু তখন আর আমার আপত্তি শোনে কে ? তিনি আমার কোন কথায়ই কান দিলেন না। আমি তখন যে কী বিপদে পড়েছিলাম তা এক শ্রীশ্রীঠাকুরই জানেন ! আমার অসহায় অবস্থা দেখে স্বামীজী বল্লেন : 'যাঁর নাম সম্বল ক'রে আমরা ঘরবাড়ী ছেড়েছি, তাঁকে স্মরণ ক'রে যা মনে আসবে তাই দু'চার কথা বলবে। চিন্তার কি কারণ আছে ?' আমি বল্লাম : 'সে তো

তোমার কাছে অতি সহজ কথা। আমি কিন্তু তা' পারবো না'। স্বামীজী কিন্তু শোনবার পাত্র ছিলেন না। তিনি দৃঢ়ভাবে অথচ স্নেহপূর্ণ হাস্যে বল্লেন : 'তা হয় না। আমি তোমার নাম এ্যানাউন্স (প্রচার) ক'রে দেব, এখন থেকে তৈরী হও'। এই ব'লে তিনি চলে গেলেন। পাশ্চাত্যদেশে আমায় বক্তৃতা দিতে হবে তা আমি জানতাম, কিন্তু এত শীঘ্র যে সম্মুখসমরে দাঁড়াতে হবে তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাই অনবরত একদিকে চিন্তা করতে লাগলাম স্বামীজীর অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কথা, আর অন্যদিকে করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা। গত্যন্তর কিছু না দেখে অবশেষে মোটামুটি একটা সাবজেক্ট্ (বিষয়বস্তু) ঠিক ক'রে রাখাই শ্রেয় মনে করলাম। জানতাম যে, স্বামীজী যখন বলেছেন, তখন তাঁর কথার নড়চড় কখনই হবে না। অগত্যা বক্তৃতার দিন (২৭শে অক্টোবর) বৈকালে হাজির হলাম খৃষ্টো-থিয়োসফিক্যাল-সোসাইটির হলে। তখনো-পর্যন্ত লোকে জানতো যে, স্বামীজীই বক্তৃতা দেবেন। বহু বিশিষ্ট শ্রোতাদের সমাগম হয়েছিল। বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বে স্বামীজী তাঁর সঙ্কল্প কাজে পরিণত করলেন। তিনি উঠে শ্রোতাদের উদ্দেশ ক'রে বল্লেন : 'মাননীয় শ্রোতৃবৃন্দ, আমার প্রিয় ও সুপণ্ডিত গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ সবে মাত্র এসেছেন ভারতবর্ষ থেকে আপনাদের জন্য শুভেচ্ছা নিয়ে, তিনিই আজ আপনাদের বেদান্ত-সম্বন্ধে কিছু বলবেন'। শোনামাত্র আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ যেন সমগ্র শরীরে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। স্বামীজীর অ্যানাউন্সমেণ্ট (প্রচার) শুনে শ্রোতৃবর্গ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ঘন ঘন করতালি দিতে লাগলেন। অগত্যা উঠে দাঁড়ালাম ডায়াসে। শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যোতির্ময় ও কল্যাণময় প্রসন্নমূর্তি যেন অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ঠিক করেছিলাম 'পঞ্চদশী' (পঞ্চদশীর

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ (স্বামী অভেদানন্দকে লণ্ডনে যাওযাব জন্য বিদাযদানেব প্রাক্কালে)

(আউটবাম-ঘাট

লণ্ডনে স্বামী অভেদানন্দ

দার্শনিক মতবাদ)-সম্বন্ধে কিছু বলবো।[৮] শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীকে স্মরণ ক'রে 'পঞ্চদশী'-গ্রন্থের দার্শনিক মতবাদ-সম্বন্ধে অনর্গল বলে যেতে লাগলাম, নিজে বুঝতে পারছিলাম না যে কি আমি বলছি। তবে মনে হচ্ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরই যেন আমার মুখ দিয়ে বলে যাচ্ছিলেন অনর্গল অবিশ্রান্তভাবে। করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের prcsence (উপস্থিতি) তখন প্রত্যাক্ষভাবে আমি অনুভব করেছিলাম। সমগ্র হল্‌টা তখন নিঃস্তব্ধতায় ভরে উঠেছিল'।

'ঘণ্টাখানেক বলার পর যখন আমি বক্তৃতা শেষ করলাম, তখন হলের একদিক থেকে অন্যদিক-পর্যন্ত শ্রোতাদের মুহুর্মুহুঃ করতালি-ধ্বনি যেন উত্তাল সমুদ্রের এক তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজীকেও বিপুল আনন্দে করতালি দিতে দেখেছিলাম। তিনি এগিয়ে এসে সস্নেহে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। গোড়ার দিকে একবার স্বামীজীকে হঠাৎ ঘাড়-নাড়তে দেখে ভেবেছিলাম বুঝি বক্তৃতায় আমার কোন ত্রুটি হচ্ছে, কিন্তু পরে বুঝলাম তা' নয়। তিনি ওভাবে আমার বক্তৃতা উপভোগ করেছিলেন। সমবেত শ্রোতারা আমার বক্তৃতা ভালভাবে এ্যাপ্রিসিয়েট (উপলব্ধি) করেছিলেন'।[৯]

৮। বক্তৃতাটি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (কলিকাতা) থেকে *An Introduction to the Philosophy of Panchadasi* নামে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য ছাপা হয়েছে সমগ্র ভাষণের সংক্ষিপ্ত অংশ। 'পঞ্চদশী'-গ্রন্থ বিবরণমতাবলম্বী বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বরের পঞ্চদশ বা পনেরোটি অধ্যায়ে রচিত আলোচনা। বেদান্তের এটি কঠিন গ্রন্থ। অভেদানন্দ মহারাজ তার সারাংশ-মাত্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

৯। "One of the events which satisfied the Swami (Vivekananda) immensely, was the success of the maiden speech of the Swami Abhedananda, whom he had designated to speak in instead at a club in Bloomsbury Spuare, on October 27. The new monk gave an excellent addrcss on the general character of the Vedanta teaching; and it was noticed that he possessed spiritual fervour and pessibilities of making a gocd speaker.

তখন মনে হ'লো শ্রীশ্রীঠাকুরের অনন্ত কৃপা ও অফুরন্ত করুণার কথা! প্রত্যক্ষ করলাম স্বামীজীর অহেতুক একান্ত ভালবাসার নিদর্শন! সত্যই দেখেছিলাম সে'দিন গুরুভাইয়ের কৃতকার্যতায় গুরুভাইয়ের কি গৌরব, ভালবাসা ও আত্মগরিমার ভাব!'

স্বামীজী মহারাজ তারপর বল্লেন: 'স্বামীজীকে যেমন ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম, তেমনি যুক্তির দিক থেকে আবার তাঁর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতেও ছাড়তাম না। মতের অমিলও হ'ত কোন কোন সময়ে কোন কোন বিষয় নিয়ে, কিন্তু সেই অমিলের পিছনে থাকতো না আত্মগরিমা ও প্রশংসালাভের বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি, থাকতো ভালবাসার ও শ্রদ্ধাবনতির ভাব। সেই দু' একটা ঘটনার কথাই তোমাদের বলি আজ'।

'প্রথমবার ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) বেলুড় মঠের নির্দিষ্ট কতকাগুলি নিয়মপ্রণালী প্রণয়ন ক'রে কর্মপদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন।

A description of this occasion, written by Mr. Eric Hammond reads:

"Some disappointed awaited those that had gathered that afternoon. It was announced that Swamiji did not intend to speak, and Swami Abhedananda would address them insted. An overweelming joy was noticeable in the Swami (Vivekananda) in his scholar's success. Joy compelled him to put at least some of itself into words that rang with delight unalloyed. It was the joy of a spiritual father over the achievement of a well-beloved son, a successful and brilliant student. The Master was more than oontent to have effaced himsful and in order that his brother's opportunity should be altogether unhindered. The whole impression had in it a glowing beauty, quite indescribable. It was as though the Master thought and knew his thought to be true: *Even if I perish on this dear*

সকলের জন্যই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন তিনি (বিবেকানন্দ) ইংলণ্ডে যান,[১০] তখন আমার সঙ্গে তাঁর দু'টি বিষয় নিয়ে মতভেদও হয়েছিল। একটি হ'ল : নির্বিশেষে সকলকে সন্ন্যাসের উচ্চ আদর্শের অধিকারী করা ও অপরটি—মঠ ও মিশনের প্রতীক নিয়ে। তার পূর্বে ক্রমবিকাশ ও জন্মান্তরবাদ-সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় নিয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে কিছুটা আলোচনা। যাইহোক, নির্বিচারে সকলকেই সংঘভুক্ত ও সাধু-সন্ন্যাসী করার ব্যাপারে আমি আপত্তি তুলেছিলাম—যদিও সেই আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছিল উভয়ের মধ্যে পরিশেষে। একদিন বল্লাম : 'এই যে সকলকে নির্বিচারে সঙ্ঘে স্থান দিয়ে তুমি সন্ন্যাসের অধিকার দিচ্ছ, এটা কিন্তু আমার ভাল মনে হচ্ছে না। মিডিয়েভেল যুগে (মধ্যযুগে) ক্রিশ্চান-ধর্মসঙ্ঘের শোচনীয় পরিণতির কথা তুমি ভালভাবেই জানো। বৌদ্ধসঙ্ঘের কথাও তাই। ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষের ইতিহাসও তুমি জানো। জাতি ও অধিকারী-নির্বিশেষে সঙ্ঘের

lips and the world will hear it *'. He (Vivekananda) remarked that this was the first appearence of his dear brother and pupil, as an English-speaking lecture before an English audieuce, and he pulsated with pure pleasure at the applause that sollowed the remark. His selflessness throughout the episode burnt tself into one's deepest memory.'—*Life of Swami Vivekananda*, (*1stedition*) *Vol. II*, 528-29.

১০। স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার লণ্ডনে যান ইংরেজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। স্বামী অভেদানন্দও প্রথমবার পাশ্চাত্যে (লণ্ডনে) যান ইংরেজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দের এই দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ইংরেজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, কারণ প্রথমবারে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতের দিকে রওনো হন ও রোম প্রভৃতি ঘুরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী সিংহলে পদার্পণ করেন

মধ্যে সকলকে সন্ন্যাসী করা—বিশেষ ক'রে বৌদ্ধধর্মের পরিণতির কথাও তোমার জানো আছে।

'উত্তরে স্বামীজী (বিবেকানন্দ) আমায় বলেছিলেন: 'তুমি ঠিকই বলেছ। ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তির অধিকারী আর ক'জন হয় বলো![১১] তবে কি জানো, চান্স (chance—সুযোগ) সকল মানুষকেই দেওয়া উচিত। আমি যে ছেলেদের শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্ঘে স্থান দিচ্ছি, এটা জানবে তাদের চান্স্ (সুযোগ) দিচ্ছি এ'জন্য যে—যদি কোনদিন কোন ছেলে নিজের চেষ্টা ও অধ্যাবসায়ের ভিতর দিয়ে ভবিষ্যতে ভগবানের কৃপালাভ করতে পারে'।

সে'দিন স্বামীজীর (বিবেকানন্দের) সেই যুক্তি আমি বিনা বাধায় মাথা পেতে নিয়েছিলাম, কারণ জীবনে উন্নতির পথে চান্স বা সুযোগ সকল মানুষই পেতে পারে, শ্রেণী, জাতি ও বর্ণ-বিভাগ বা অধিকারীভাগের প্রশ্ন সেখানে বরং নগণ্য। অনন্ত সম্ভাবনার (infinite possibilities) বীজ প্রত্যেকের মধ্যেই সুপ্ত আছে, সুতরাং দিব্যজ্ঞানের অধিকারী সকলেই হ'তে পারে, পারে না—একথা ঠিক নয়। তবে সকল মানুষ এই রহস্য জানে না, আর জানে না বলেই তাদেরকে সুযোগ দিতে হয়, কেননা সুযোগ পেলে হয়তো মানুষ তার জীবনসমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে একদিন না একদিন।

১১। বেদান্তের পঠনপাঠন ও বিচার-সম্বন্ধেও অধিকারী নির্ণয় করা হয়েছে। 'বেদান্তসার'-গ্রন্থে সদানন্দযোগীন্দ্র প্রথমেই বলেছেন: "অধিকারী তু বিধিবৎ অধীতবেদ-বেদাঙ্গত্বেন আপাততঃ অধিগতাখিলঃ বেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তো-পাসনানুষ্ঠানেন নির্গত নিখিলকল্মষতয়া নিতান্ত-নির্মল-স্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা"। অর্থাৎ বেদান্তবিচারের অধিকারী হবেন একান্ত নির্মলচিত্তসম্পন্ন মানুষ ও চারটি সাধনসম্পন্ন, সুতরাং যে সে সাধারণ লোক বেদান্তের অধিকারী হ'তে পারে না

॥ স্মৃতি : দশ ॥

[পূর্বকথা : শ্রদ্ধেয় স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (৩য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬, পৃ ৩৩৮-৩৯)-গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত মঠ ও মিশনের প্রতীকের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। মঠ ও মিশনের প্রতীকের কল্পনা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় থাকাকালে আনুমানিক ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসেরও পূর্বে। তখন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও আমেরিকায় ছিলেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ লিখেছেন: "তারপর মঠ-মিশনের প্রতীকের কথা। এখানেও একদিকে আমরা যেমন পাই একাধারে ভাব-রাশির একত্র সমাবেশের ও ভাবের দ্যোতক প্রতীক কল্পনার ক্ষমতা, অপরদিকে তেমনি পাই শিল্পসুলভ গভীর অনুভূতি ও রূপায়ণচাতুর্য। প্রতীকটির অর্থ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বামীজী ২৫শে জুলাই (১৯০০ নিউ ইয়র্ক-ত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন: 'সূর্য=জ্ঞান; তরঙ্গায়িত জল=কর্ম; পদ্ম=প্রেম; সর্প=যোগ; হংস=আত্মা; উক্তিটি=হংস (অর্থাৎ পরমাত্মা) আমাদিগকে উহা প্রেরণ করুন (তন্নো হংস: প্রচোদয়াৎ)। এটি হৃৎসরোবর। কল্পনাটি তোমার কেমন লাগে? যাহোক, হংস যেন তোমায় এ'সমস্ত দিয়ে পরিপূর্ণ করেন'। কল্পনাটি তখন সবেমাত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, ইহার প্রমাণ পাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত ২৫শে জুলাই-এর পত্রে: 'বলি হাঁস কেমন?' অর্থাৎ তুরীয়ানন্দ পূর্বে এই প্রতীক দেখেন নাই। প্রতীকটি ঐকালে রচিত হইলেও জনসাধারণে প্রচারিত হইতে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। স্বামীজীকেই প্রথমাবস্থায় উহা ব্যাখ্যা করিতে হইত। এই ভাবে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তিনি মেরীকে লিখিয়াছিলেন: 'মিশনের শীলমোহরে সাপটি হ'ল রহস্যবিদ্যার (যোগের) প্রতীক; সূর্য জ্ঞানের; তরঙ্গায়িত জল কর্মের; পদ্ম প্রেমের; সকলের মাঝখানে হল আত্মার প্রতীক'।

'প্রতীকটির শিল্পের দিক আলোকিত হইয়াছিল আরও পরে স্বামীজী যখন ভারতে প্রত্যাবর্তনান্তর বেলুড় মঠে বাস করিতেছিলেন। সেই কালে একদিন কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রণদাপ্রসাদ দাসগুপ্ত মহাশয় মঠে আসিলে স্বামীজী তাঁর সহিত শিল্পকলার আলোচনা আরম্ভ করিলেন ও স্বীয় মতপ্রকাশ-ব্যপদেশে বলিলেন

'মানুষ যে জিনিসটি তৈরী করে, তাতে কোন একটা আইডিয়া (মনোভাব) প্রকাশ করার নামই আর্ট (শিল্প) ···'। ক্রমে মা কালীর ছবির কথা উঠিল ও স্বামীজী স্বরচিত 'কালী দি মাদার'-এর কথা তুলিয়া বলিলেন: 'আপনি ঐ ভাবটা একখানা ছবিতে প্রকাশ করতে পারেন কি?' অতঃপর কবিতাটি আনাইয়া স্বয়ং পাঠ করিলেন।···অতপর (পৃ: ৩৪০) স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের শীলমোহরের ছবিটি আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইলেন ও অনুরোধ-ক্রমে উহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দিলেন। রণদাবাবু চিত্রটির ঐরূপ অর্থ শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন···(শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী-লিখিত 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থ এবং 'বাণী ও রচনা', ৯/১৮৬—৯২ দ্রঃ)]'

এ' থেকে বোঝা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ মঠ ও মিশনের প্রতীকটির পরিকল্পনা আমেরিকায় থাকার সময়েই (১৯০০—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে) করেছিলেন—য'দও প্রতীকটির পূর্ণরূপ দিয়েছিলেন বেলুড় মঠে (ভারতে) প্রত্যাবর্তনের পর। আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মুখে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রতীকটির সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছিল তার কথা শুনেছিলাম এবং তারই হুবহু ঘটনার কথা এই 'মন ও মানুষ'-গ্রন্থে আলোচনা করেছি। তবে একথা বেশ বোঝা যায় যে, আমেরিকায় থাকাকালেই স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের মধ্যে প্রতীক সম্বন্ধে আলোচনাটি হয়েছিল। আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মুখে শোনার পর আলোচনাংশটি লিপিবদ্ধ করেছি, সুতরাং ঐ আলোচনাটিকে কেউ ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে যেন না ভাবেন যে, একজন অন্যজনের প্রতীকটি-সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী অভেদানন্দকে যে নিবিড়তম ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন ও একান্ত ভালবাসার সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে চিরদিন বর্তমান ছিল ঠিক সেই ভাবে ও দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতেই ঐ প্রতীক-সম্পর্কে আলোচনাটি হয়েছিল উভয়ের মধ্যে, কোন্‌টি ঠিক ও সঙ্গত এবং কোন্‌টি অঠিক ও অসঙ্গত এ'সবের কোন প্রশ্নের অবকাশই ঐ আলোচনার মধ্যে ছিল না বা নাই। আলোচনাটি নিছক দু'জন অন্তরঙ্গ-গুরুভ্রাতার মধ্যে সহজ সরল ভালোবাসাপূর্ণ আলোচনা। অবশ্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পরে স্বপ্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মঠ ও আশ্রম'-এর প্রতীক স্বাধীন-স্বতন্ত্রভাবেই পরিকল্পনা ও অঙ্কন করিয়েছিলেন বামাবর্ত-স্বস্তিক প্রভৃতির সংযোজন ক'রে]

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বল্লেন : 'স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমার (অভেদানন্দের) আলোচনা হয়েছিল মঠ ও মিশনের প্রতীক নিয়ে আমেরিকায় থাকাকালে। বেলুড় মঠ ও মিশনের প্রতীকের ডিজাইন (নক্সা) নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে। প্রতীকের চারদিকে একটি সাপ (কুণ্ডলিনী) ফণা ধ'রে মুখে তার লেজ দিয়ে গোলাকার বৃত্ত রচনা করেছে। বৃত্তটি অনন্তের (infinity) চিহ্ন—যদিও স্বামীজী (বিবেকানন্দ)-পরিকল্পিত প্রতীকটিতে সাপ যে'ভাবে বৃত্ত রচনা করেছে তাতে ঠিক অসাম্প্রদায়িকতার ভাব প্রকাশ পায় না, কারণ সাপ যদি নিজের লেজকে মুখ দিয়ে গ্রাস না ক'রে ফণা ধরে থাকে তবে তা' অনন্ত ও অসাম্প্রদায়িক ভাবের পরিচায়ক হয় না। এ'কথা উল্লেখ করেই আমি স্বামীজীকে (বিবেকানন্দকে) বলি যে, তুমি যে এম্‌ব্লেমটির (প্রতীকটির) কথা ভেবেছ তাতে মঠ ও মিশনের মতবাদ ও আদর্শ যে সার্বভৌমিক, অসাম্প্রদায়িক ও অনন্ত ভাবের প্রকাশক তা' ঠিক বোঝায় না। এর উত্তরে স্বামীজী (বিবেকানন্দ) বলেছিলেন : 'কেন ?' আমি তখন স্বামীজীকে বলি : 'তোমার পরিকল্পিত নক্সায় সাপটি ফণা ধরে থাকায় ঠিকভাবে অখণ্ড ভাবের প্রকাশ হয়নি। জলরাশি কর্ম-চাঞ্চল্যের, পত্রযুক্ত পদ্ম প্রেম ও ভক্তির, হংস যোগের ও দেদীপ্যমান সূর্য জ্ঞানের প্রকাশক—এ'গুলি ঠিক আছে। এতে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের সমন্বয়কল্পনা ঠিকই বজায় আছে। প্রতীক সঙ্ঘের ও সঙ্ঘনিয়ামক শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের ও আদর্শের প্রতিভূ ও প্রকাশক, কিন্তু তোমার পরিকল্পিত প্রতীকে সেই সার্বভৌমিক ভাবের ঠিক প্রকাশ হচ্ছে না ব'লে আমার মনে হয়। স্বামীজী ঘাড় নেড়ে আমার কথায় তখন সম্মতি জানিয়ে বলেন : 'তুমি ঠিকই বলেছ। তবে কি জানো, বর্তমানে কাজ চালানোর জন্য এটাই এখন করেছি, ভবিষ্যতে সংশোধন ক'রে নিলেই হবে। এটা সম্ভবত ১৯০০ —১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের কথা হবে। আনুমানিক ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সুতরাং নানান কাজের ঝঞ্ঝাটের ভিতর সেই পরিকল্পিত প্রতীকের আর সংশোধন করেন নি ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর।[১০]

তারপর মহারাজ বল্লেন: 'পরে একদিন আমার পরিকল্পিত প্রতীকের নক্সাটি[১১] স্বামীজীকে (বিবেকানন্দকে) দেখিয়েছিলাম। আমার সংশোধিত প্রতীকটিতে ছিল সাপ তার নিজের লেজকে নিজেই সম্পূর্ণরূপে গ্রাস ক'রে বৃত্ত অর্থাৎ সার্কেল (circle) রচনা করেছে। থিয়োজোফিষ্টরাও তাঁদের সঙ্ঘের প্রতীকের এই ভাব গ্রহণ করেছেন। প্রতীকের মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের চিহ্নস্বরূপ আছে সূর্য, পদ্ম, হংস ও তরঙ্গায়িত জলরাশি। সূর্যের মধ্যে ওঙ্কার ও সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে আছে বৈদিক বামাবর্ত-স্বস্তিক—পরমকল্যাণের নিদর্শন।[১২] স্বস্তিকের

১০। পূর্বেই বলেছি যে, কেহ ভাবাবেগের বশে যেন মনে না করেন যে, স্বামী অভেদানন্দ তাঁর প্রাণতুল্য গুরুভ্রাতার (বিবেকানন্দের) মতের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। আমরা সাধারণ বুদ্ধিজীবি মানুষ, অন্তরের সঙ্গে যাঁকে মহান্‌ ও পরমশ্রদ্ধাস্পদ ব'লে স্বীকার করি, তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথাকে বিচার না ক'রেই কল্পনার বশে অনেক সময়ে বিরূপ একটি সিদ্ধান্ত ক'রে বসি। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যে স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) একান্ত অনুগত ছিলেন, অন্তরের শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে যে তিনি ভালবাসতেন—তা তাঁর লেখা 'Vivekananda and His Work'-গ্রন্থটি পড়লেই বুঝতে পারা যায়। এ'গ্রন্থে সেই প্রসঙ্গেরও উল্লেখ করেছি। স্বামী বিবেকানন্দকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ছায়ার মতোই অনুসরণ করতেন, অফুরন্ত শ্রদ্ধা ছিল স্বামী অভেদানন্দের অন্তরে তাঁর চিরশ্রদ্ধাস্পদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি।

১১। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ-কর্তৃক সংশোধিত প্রতীকটি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ও আশ্রমে আজও ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে।

১২। এখানে উল্লেখযোগ্য যে হিন্দুদের স্বস্তিক মঙ্গলভাবের চিহ্নবিশেষ। স্বস্তিক তিন রকমের—দক্ষিণাবর্ত, বামাবর্ত ও নন্দ্যাবর্ত। দক্ষিণাবর্ত কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্ম, ধর্মসঙ্ঘ বা ধর্মবিশ্বাসকে নির্দেশ করে। দক্ষিণাবর্ত-স্বস্তিক এজন্য কোন একটি সম্প্রদায় বিশেষে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বামাবর্ত-স্বস্তিক অসাম্প্রদায়িক এবং উদার-অনন্ত ধর্মের, ধর্মসঙ্ঘের, ধর্মসম্প্রদায়ের প্রকাশক ও চিহ্নবিশেষ, আর নন্দ্যাবর্ত-স্বস্তিক যেকোন মাঙ্গলিক-কর্মে ব্যবহৃত হয়। জার্মান রাষ্ট্রনায়ক

উপর চন্দ্র ও তারকাবিন্দু। তারকাটি আবার পাঁচ কোণবিশিষ্ট (pentatonic)। পাঁচটি কোণবিশিষ্ট প্রতিকৃতির মধ্যে তারকার উপরের কোণটি পুরুষের মাথা, নীচে দু'দিকের দু'টি কোণ দুটি হাতের ও নীচেকার দু'টি কোণ দু'টি পায়ের নিদর্শন। চন্দ্র ও তারকাকে সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি বলা যেতে পারে। তন্ত্রে এ'দুটি লিঙ্গ-যোনি তথা শিব-শক্তির প্রতীক। পুনরায় চন্দ্র ইজিপ্টের হোরাসের মাতা আইসিসের প্রতিচ্ছবি। আইসিসকে প্রকৃতিদেবী (Nature)-রূপেও কল্পনা করা হয়। চন্দ্র ও তাবকা ইসলামধর্মেরও প্রতীক। চন্দ্র ও তারকাকে ইসলামধর্মীরা মসজিদের চূড়ায় ও তাঁদের পতাকার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।[১৩] তবে ইসলামধর্মে চন্দ্র ও তারকা আসলে বেদ ও তন্ত্র থেকে নেওয়া মনে হয়: এ'কথা ইসলামধর্মীরা সম্ভবতঃ স্বীকার করেন না। এ'থেকে প্রমাণ করা কঠিন হবে না যে, পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল বেদ'।

নিম্নে স্বামী অভেদানন্দের পরিকল্পিত প্রতীকের চিত্র দেওয়া হ'ল :
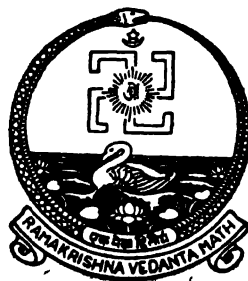
হিটলার দক্ষিণাবর্ত-স্বস্তিক ব্যবহার করতেন নিজেকে আর্যগোষ্ঠীভুক্ত বলে দাবী ক'রে। দক্ষিণদিক থেকে বামদিকে পাক খেয়ে প্রসারিত (যেমন দক্ষিণাবর্ত। বামাবর্ত-স্বস্তিক বামদিক থেকে দক্ষিণদিকে পাক খেয়ে প্রসারিত। বামাবর্ত-স্বস্তিক স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠের ও আশ্রমের প্রতীকে ব্যবহার করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের অসাম্প্রদায়িক অনন্ত ধর্মমত ও ধর্মাদর্শকে প্রকাশ করার জন্ত।

১৩। 'The crescent moon was the symbol of Isis and emblematic of the Hindu *yoni*, the productive power of the

মহারাজ বল্লেন : 'খ্রীষ্টানদের ক্রুশ বা ক্রশের (Cross) মর্মকথাও তাই। আমার 'ওয়ার্ড য়্যাণ্ড ক্রশ ইন এন্‌সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া' ও 'নেশাসিটি অব্‌ সিমবলস্‌' (বক্তৃতা) দু'টো পড়বে, তাতে এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। প্রাচীন ইজিপ্টবাসীরা তাউ-ক্রশের (Tou-Cross) প্রচলন করেন—যা দেখতে অনেকটা ইংরেজী 'টি' (T)-এর মতো। অনেকের মতে খ্রীষ্টানদের ক্রুশ বা ক্রশ (Cross) ইজিপ্টের প্রতীক 'ক্রাকস্‌-আন্‌সাটা'-র অনুকরণে সৃষ্টি। আমার (অভেদানন্দের) মতে ক্রুশ বা ক্রশ (Cross) ও ক্রাকস্‌-আন্‌সাটা দু'টিই বৈদিক স্বস্তিক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ক্রাকস্‌-আন্‌সাটা প্রথমে—না ক্রশ প্রথমে সে'কথা ঐতিহাসিকদের আলোচনার বিষয়'।

'মোটকথা আমার (স্বামী অভেদানন্দের) সংশোধিত প্রতীকে অসাম্প্রদায়িকতার ও অখণ্ড সার্বভৌমিকতার ভাব পরিপূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। আমি এই সংশোধিত প্রতীকটি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, সোসাইটি ও আশ্রমের প্রতীক (Emblem) হিসাবে গ্রহণ করেছি যেকথা বলেছি'।

আমরা সকলে নীরব। কিছুক্ষণ পরে আমাদের মধ্যে থেকে একজন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আপনার মতবাদের ও ভাবের সাদৃশ্য অনেকাংশে পাওয়া যায়। তেজস্বিতা, সাহসিকতা, স্বাধীন মনোবৃত্তি, পাণ্ডিত্য, স্পষ্টবাদিতা,

mother Nature. This crescent has now become the symbol of the Mohammedans, it is placed on the top of mosques and toms as well as on the banner of the Mohammedans. The five pointed stars which they place on the top of the crescent is the pentacle. This is the symbol of *Purusha*, the male principle.'—*Path of Realization* (1946), p. 85. 'ক্রশ'-সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় Crooks-লিখিত Swastik-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কষ্টসহিষ্ণুতা, ঔদার্য প্রভৃতি গুণের বিকাশ আপনাদের উভয়ের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি। ভালবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধন দু'জনের মধ্যে চিরদিন ছিল। কিন্তু উভয়ের লেখার মধ্যে যুক্তির ভিন্নতাও আবার লক্ষ্য করেছি কোন কোন সময়ে। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন যেন কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়। প্রবল ঘুর্ণিবায়ুর তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে নিমেষের মধ্যে তিনি সমগ্র বিশ্বের বুকে এক তাণ্ডবলীলার আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন ও সেই আলোড়নের মধ্যে পেয়েছিল বিশ্বের মানুষ অভিনব রহস্যময় এক পথের সন্ধান। বহুদিনের জড়তার ও সুপ্তিরও হয়েছিল জাগরণ বিবেকানন্দের দিব্যচেতনায়। বিরাট বিশ্বের বক্ষস্থল বিদীর্ণ ক'রে শীতল সলিলসিঞ্চন দিয়ে বিবেকানন্দ করলেন উর্বর ও ফলপ্রসু বসুন্ধরাকে, আর আপনি বপন করলেন তার উপর বীজ ধীর ও শান্ত প্রযত্ন দিয়ে, গড়ে তুল্লেন সমগ্র ধর্মক্ষেত্রকে বিচারশীল ও শান্তিকামী মানুষের বাসের উপযোগী ক'রে। আপনার ভিতর পাই তাই আমরা সৃজনশীল বা গঠনমূলক এক দিব্যশক্তি ও প্রেরণা। আপনার লেখার ছত্রে ছত্রে আছে যুক্তিতর্কপূর্ণ চিন্তা ও সাধনার ধারাবাহিক সোপান। সরল অথচ অতলস্পর্শী তাদের ভাব এবং আশা ও চিরসম্ভাবনার তারা দীপ্ত দীপশিখা! তাই স্বামী বিবেকানন্দ যেন লীলাচঞ্চল নৃত্যশীল নটরাজ ও আপনি নৃত্যের সমন্বয়সাধনকারী গঠনশক্তি! দু'জনে শিব ও শক্তির মিলনমূর্তি'!

স্বামীজী মহারাজ আমাদের কথাগুলি শুনে শান্ত-শিষ্ট ছোট্ট শিশুর মতো একটু হাসলেন। আমাদের মধ্যে থেকে তখন একজন প্রশ্ন করলেন কাশীপুরে শক্তিসঞ্চারের কথা নিয়ে। তিনি বল্লেন: 'মহারাজ, কাশীপুরের বাগানে স্বামীজীর শক্তি নাকি আপনার ভিতর সঞ্চারিত হয়েছিল? আপনি ছিলেন ভক্তিপথের পথিক, কিন্তু স্বামীজী (বিবেকানন্দ) শক্তি সঞ্চার ক'রে আপনাকে নাকি জ্ঞানপথের অধিকারী করেছিলেন?'

স্বামীজী মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারপর গম্ভীরভাবে বল্লেন: 'হ্যাঁ, লীলাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) এ'কাহিনীটাই লিখেছেন। শরৎ মহারাজকে আমি (স্বামী সারদানন্দকে) ঐ ঘটনা যে সত্য নয়--তা লিখেছিলাম। তিনি ভুল সংশোধন করতে রাজী হ'য়ে আমাকে পত্রও দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ভুল থেকেই গেছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে। তা'ছাড়া আরো মজার কথা এই যে, শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গের দেখাদেখি পরবর্তী অনেক লেখকও অবলীলাক্রমে ঐ এক ভ্রান্ত ঘটনাটিই তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ ক'রে চলেছেন অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে'।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'সত্যকারের ঘটনাটি তাহলে কি মহারাজ?' স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'শরৎ মহারাজ যখন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' লেখেন, তখন আমি ছিলাম আমেরিকায়। স্বামীজী (বিবেকানন্দ) শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ও আদর্শ প্রচার করতে গেলেন আমেরিকায়, আমি ও শশী মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) দু'জনে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবনের বহু ঘটনাবলী সংগ্রহ ক'রে খাতায় লিখতে আরম্ভ করলাম। এ'খবর বোধ হয় অনেকেই জানে না। ইচ্ছা ছিল তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) একটি জীবনী লিখবো দু'জনে। তাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীর ভাবানুযায়ী উপনিষৎ, গীতা, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ প্রভৃতি থেকে বহু শ্লোক এবং অংশও একটি খাতায় সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই সংকল্প কাজে আর পরিণত হ'য়ে ওঠেনি, কারণ হঠাৎ স্বামীজী (বিবেকানন্দ) আমায় ডেকে পা'ঠালেন ওদেশে (পাশ্চাত্যদেশে)' গিয়ে তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য। শরৎ মহারাজ আমার পূর্বেই রওনা হ'য়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজীর ডাক এলে রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতি গুরুভাইয়েরা আনন্দে আমায় পাশ্চাত্যে যাওয়ার সম্মতি দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে ইংরেজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন যাত্রা করি। রাজা মহারাজ

(ব্রহ্মানন্দ), নিরঞ্জন স্বামী (নিরঞ্জনানন্দ), তুরীয়ানন্দ, শশী মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) প্রভৃতি সকলে কলকাতা আউটরাম-ঘাটে আমায় বিদায়সম্ভাষণ জানালেন। জন্মভূমি ও গুরুভাইদের ছেড়ে আজানা দেশে যাত্রা করার সময়ে চোখের জল সংবরণ করতে পারিনি। গুরুভাইদের চোখেও সে'দিন জল দেখেছিলাম, আর অনুভব করেছিলাম তাঁদের অফুরন্ত স্নেহ ও ভালবাসার কথা।'

'বিদেশে চলে যাওয়ার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী-লেখা খাতাগুলি আমি শশী মহারাজের (রামকৃষ্ণানন্দ) কাছেই রেখে যাই। গুরুদাস বর্মন তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী'-র প্রথম ভাগের ভূমিকায় এ'কথার উল্লেখ করেছেন'।[১৪]

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'যথার্থ শক্তিসঞ্চারের প্রসঙ্গ তো অনেকেই জানে না। আমি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সাক্ষাৎলাভ করি। অবশ্য সেই ঘটনার কথা তোমরা সকলেই জানো'।

'ছেলেবেলা থেকেই যোগশিক্ষা করার ইচ্ছা আমার অন্তরে ছিল, সেজন্য পায়েহেঁটে কাশীপুরের রাস্তা ধরে সোজা দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে উপস্থিত হই। গিয়ে শুনি শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নাই, কলকাতায় গেছেন। ওখানেই শশীর (শশী মহারাজ ও পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। পরের দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আমার দেখা হয়। রামলাল-দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমার কথা বলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন আমায় ডেকে পাঠান। তাঁর ঘরের পশ্চিমে গঙ্গার ধারের দিকে বারাণ্ডায় ডেকে নিয়ে আমায় দীক্ষা দেন। আমার জীবে (জিহ্বায়) মন্ত্র লিখে দিয়ে মা কালীর ধ্যান করতে বলেন এবং আমার নাভিদেশে হাত দিয়ে উর্ধদিকে (মস্তকে সহস্রারপদ্মের দিকে) কুণ্ডলিনী-

১৪। গুরুদাস বর্মণ-সংকলিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শক্তিকে জাগ্রত ক'রে আকর্ষণ করেন। মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনী-শক্তি মস্তকে সহস্রারে উঠতেই আমি সমাধিস্থ হয়ে পড়ি। বহুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এলে দেখি করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে আছেন। প্রশান্ত ও প্রসন্নোজ্জ্বল মূর্তি। তারপর মস্তকে সহস্রারপদ্ম থেকে দু'হাত দিয়ে কুণ্ডলিনীশক্তিকে নীচে মূলাধারে নামিয়ে নিয়ে এলেন। তখনই আবার আমার বাহ্যজগতে জ্ঞান ফিরে এলো'।

স্বামীজী মহারাজের মুখ তখন প্রদীপ্ত অথচ প্রসন্নোজ্জ্বল। তিনি গম্ভীর এবং ধীর ধীরে পুনরায় বল্লেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বলেছিলেন: 'তুই পূর্বজন্মে যোগী ছিলি। তোর যোগশিক্ষা করার ইচ্ছা ছিল—তা আমি জানতাম। এই তোর শেষজন্ম'।[৫১]

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'এর নাম যথার্থ শক্তিসঞ্চার--কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ হ'লে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি হয়। শিব-শক্তির সামরস্যজ্ঞান ও ব্রহ্মানুভূতি এককথা'।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'শ্রীশ্রীঠাকুর নাকি বলেছিলেন—এই তোর শেষজন্ম। একটু বাকী ছিল'।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'এ'কথা তো সাধারণের বোঝার ও জানার কথা নয়। এটি রহস্যময় ইঙ্গিতপূর্ণ কথা। আসল কথা এই যে, অবতারের সঙ্গে যুগে যুগে যাদের আসা তাঁদের আবার শেষজন্ম কি?'

আমরা সকলেই নিরব। স্বামীজী মহারাজ পুনরায় ব'লে চল্লেন: 'এটাই আমার মধ্যে করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের যথার্থ শক্তিসঞ্চার। আর তোমরা ঐ শিবরাত্রির দিন স্বামীজীর শক্তি-

৫১। 'এই শেষজন্ম'-প্রসঙ্গটি আমার 'বাণী ও বিচার'-গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি শ্রীম-লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-গ্রন্থের আলোচনাকে অনুসরণ ক'রে যে, অবতারের সঙ্গে যাঁরা আসেন সেই নিত্য-সিদ্ধদের মধ্যেও শেষজন্মতত্ত্ব জড়িত থাকে। এঁরা যুগে যুগে আসা অবতার-পুরুষের অন্তরঙ্গলীলাপার্ষদ।

সঞ্চারের কথা জানতে চাইছো—যেটা ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। আমি ও স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন দু'জনে দক্ষিণেশ্বরে পাশাপাশি বসে শিবরাত্রির দিন উপবাস ক'রে সারারাত্রি ধ্যান করছিলাম—ঠিক সেই সময়ে আমাদের পাশে কেউই ছিল না। কিছু দূরে ছিল নিরঞ্জন ও গোপাল-দাদা। শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) কিন্তু সেই সময়ে সেখানে ছিল না। শরৎ মনে হয় কারু কাছ থেকে শুনে ঘটনাটি লিখেছে—যেটা ঠিক নয়। যাইহোক, বলি—তবে শোন ঐ ঘটনার কথা'।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'আমেরিকা থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে একেবারে ফিরে আসার পর একদিন লীলাপ্রসঙ্গে শক্তিসঞ্চারের ঘটনাটি পড়ে আমিও অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। শরৎ মহারাজ যে যথার্থ ঘটনা নিজে না দেখেই লিখেছেন তা' বেশ বুঝতে পারলাম। কাশীপুরের বাগানে শিবরাত্রির দিন রাত্রে স্বামীজী ও আমি যখন পাশাপাশি বসে ধ্যান করছিলাম ঠিক সেই সময়ে শরৎ মহারাজ সেখানে ছিলেন না, ছিলেন কিছু দূরে নিরঞ্জন স্বামী (নিরঞ্জনানন্দ) ও গোপাল-দাদা (অদ্বৈতানন্দ)। তাঁরা ছিলেন অন্যদিকে, কাজেই তারাও আমাদের ঠিক দেখতে পাননি। তাই শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গে ঘটনাটি পড়ে আমি শরৎ মহারাজকে তৎক্ষণাৎ ঘটনার কথা লিখে পাঠাই। শরৎ মহারাজ তখন বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধনে) থাকেন। বই সংশোধন করার পূর্বে আমি 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় ভুল-সংশোধন করার জন্য তাঁকে (সারদানন্দকে) অনুরোধ করেছিলাম। আমার চিঠির উত্তরে শরৎ মহারাজ যে পোষ্টকার্ডটি দিয়েছিলেন তা' এখনো আমার কাছেই আছে।[১৬]

১৬। শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত শিবরাত্রির ঘটনা ইং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে ঘটেছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীম লিখেছেন ইং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল। ঘটনাটি কাশীপুর-বাগানে ঘটে। ১৭।৮।১৯২৫ তারিখে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে লিখিত স্বামী সারদানন্দ মহারাজের পত্রটির হুবহু প্রতিলিপি এখানে দেওয়া হ'ল :

শরৎ মহারাজ যে পত্রখানি লিখেছিলেন তাতে পরবর্তী সংস্করণে তিনি ভুল সংশোধন ক'রে দেবেন ব'লে লিখেছিলেন। আমিও শরৎ মহারাজের কথায় নিশ্চিন্ত ছিলাম। তারপর লীলাপ্রসঙ্গের পরবর্তী সংস্করণও কিছুদিন পরে ছাপানো হ'ল, কিন্তু দেখি—যে ভুল ছিল সেই ভুলই র'য়ে গেছে, বইয়ে সংশোধন করা আর হয়নি'।[১৭]

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণং

উদ্বোধন-আফিস
১নং মুখার্জ্জির লেন, বাগবাজার
কলিকাতা
১৭—৮—'২৫

"প্রিয় অভেদানন্দ,

"তোমার পত্র পাইলাম। বই খুলিয়া দেখিলাম আমারই ভুল হইয়াছে। আগামী সংস্করণে উহা সংশোধন করিয়া দিব। উদ্বোধনে ছাপাইবার কথা লিখিয়াছ, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। অতি অল্প-সংখ্যক লোকই পুস্তক কিনিয়াছে ও কিনিবে। সুতরাং এ' সংস্করণে যে ভুল রহিয়া গেল তাহার আর কোনও উপায় নাই। আমার ভালবাসা প্রীতি-সম্ভাষণাদি জানিবে। আশা করি তোমার শরীর ভালই আছে। আমি একরূপ ভাল আছি, কিন্তু গোলাপ-মার শরীর খুবই খারাপ। Heart-এর অসুখ। কখন যে কি হবে বলা যায় না। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীসারদানন্দ"।

১৭। স্বামী সারদানন্দ: 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ,' সাধকভাব, পৃঃ ৮-১০

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্তর্গত 'অদ্বৈত আশ্রম' (৫, ডিহি এণ্টালি রোড, কলিকাতা ৭০০০১৪) থেকে প্রকাশিত '*The Life of Swami Vivekananda* by His Eastern and Western Disciples-গ্রন্থের বর্তমান Revised and Enlarged (2nd Edition, August 1379) সংস্করণে (১ম ভাগ, ১৬৭ পৃষ্ঠায়) কিছুটা সংশোধন করা হয়েছে এবং ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হয়েছে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ-লিখিত 'আমার জীবনকথা' আত্মজীবনী থেকে অংশ। ঐ ইংরাজী অনুবাদটি এখানে দেওয়া হ'ল:'

'Swami Abhedananda (Kali) narrates this same in his autobiography. The gist of his acascou Onis ows: flont

তারপর মহারাজকে তামাক দিয়ে গেলেন তাঁর সেবক। স্বামীজী মহারাজ তামাক খেতে খেতে বল্লেন : 'শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গে লেখা আছে যে, কাশীপুরের বাগানে স্বামীজী আমাকে ধ্যান করার সময় বল্লেন : 'আমায় ছুঁয়ে থাকতো'। আমি ছুঁলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'কি অনুভব কর্‌ছিস' ? আমি বলেছিলাম : 'ইলেক্‌ট্রিক-ব্যাটারি ধরলে যেমন শক্‌ (shock) লাগে—তেমনি। তারপরআমি গভীরভাবে ধ্যানস্থ হ'য়ে পড়ি। শ্রীশ্রীঠাকুর সে'কথা শুনে স্বামীজীকে (বিবেকানন্দকে) তিরস্কার ক'রে বলেছিলেন : 'কিরে, একটু জম্‌তে না জম্‌তেই খরচ ? ওর (কালীর) ভেতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা করলি বল্‌ দিকিনি ? ওর সব ভাবই নষ্ট ক'রে দিলি। ছ'মাসের গর্ভ যেন নষ্ট হ'য়ে গেল'। তারপর ডানদিকে একটু হেলে রিভল্‌ভিং-বুক্‌কেস থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের 'সাধকভাব' বইখানি টেনে নিয়ে বল্লেন : 'এই দেখো—বইয়ে এই লেখা আছে' (স্বামীজী মহারাজ পড়তে লাগলেন : তারপর লেখা আছে')—

'ফলে দেখা গেল অভেদানন্দ যে'ভাব সহায়ে পূর্বধর্মজীবনে অগ্রসর হইতেছিল তাহার তো একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবার অদ্বৈতভাব ঠিক ঠিক ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায়

the Shivaratri night, when Naren and I were meditating, Naren's body suddenly began to shake. He asked me to put my hand on his thigh and see it I felt anything When I put my hand there, I felt as though I had touched an electric battery, and as though a magnetic current were causing a violent tremor in his body. Gradually this current became so strong that my hand too began to shake. Naren did not infuse any power into me on this occasion, he only thought that he could do so. In order to disabuse Narendra of this illusion the Master said to him later, 'This is the time to gain power not to spend it"

এখানে স্বামী সারদানন্দ-লিখিত বিবরণ ও স্বামী অভেদানন্দ-লিখিত বিবরণ দু'টিকেই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

বেদান্তের দোহাই দিয়া সে কখন কখন সদাচারবিরোধী অনুষ্ঠান সকল করিয়া ফেলিতে লাগিল'।

তারপর মহারাজ বল্লেন: 'কিন্তু আসল ঘটনাটি হ'ল: শিবরাত্রির দিন স্বামীজী, আমি, নিরঞ্জন স্বামী, গোপাল-দা প্রভৃতি সকলে উপবাস করি ও চারপ্রহরে চারবার শিবপূজা, ধ্যান ধারণা ইত্যাদিতে সারারাত্রি কাটাই। স্বামীজী ও আমি পাশপাশি বসে ধ্যান করছিলাম। স্বামীজী (বিবেকানন্দ) একবার ধ্যানের পর আমায় বল্লেন: 'আমার শরীরে খুব একটা জোর কারেন্ট্ (current) বইছে। পরমহংসদেব যে শক্তিসঞ্চারের কথা বলেন, দ্যাখ্‌তো—সেটা এই শক্তি কিনা?' আমি তাঁর ডানহাতের কনুইয়ের কাছে ও ডান-উরুতে আমার ডান হাতটি দিয়ে দেখি সত্যিই স্বামীজীর সর্বশরীর কাঁপছে। স্বামীজী (বিবেকানন্দ) আমায় জিজ্ঞাসা করলেন: 'কি ফিল্ (feel—অনুভব) করছিস?' আমি বল্লুম: 'খুব জোর একটা ভাইব্রেসন (vibration—কম্পন)। কিন্তু আমার তখন মনে হয়েছিল যে, সেটা কুণ্ডলীনীশক্তির জাগরণ। বাস্, এই পর্যন্ত। এর বেশী আর কোন ঘটনাই ঘটেনি'।'

॥ স্মৃতি ঃ এগারো ॥

আমরা তখন দার্জিলিঙে আমাদের রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে। সন্ধ্যার আকাশ বেশ পরিষ্কার। তুষার-ধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার আশেপাশে পেঁজা-তুলোর মতো উড়ো-উড়ো কিছু-কিছু সাদামেঘ। অস্তগামী সূর্যের রক্তরাগ তার উপর পড়ে অপূর্ব এক শোভা সৃষ্টি করেছি।। তার উপর কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশে বরফের উপর রঙের খেলা অতীব সুন্দর। পাহাড়ের বুকে এদিকে-সেদিকে চিড়, ভূর্জপত্র প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী যেন রাত্রির প্রতীক্ষায় নির্বাক ও নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। পাহাড়ের চারদিকে সাজানো বন্যগোলাপ, ডালিয়া প্রভৃতি অসংখ্য রঙের ও রকমের ফুল। তারা মানুষের যত্ন ও ভালবাসার কোন প্রত্যাশা রাখে না, নির্জনে ও অযত্নে প্রকৃতির বুকেই দেয় তাদের গন্ধ ঢেলে, একমাত্র প্রকৃতিই রক্ষা করে তাদের আদর ও মর্যাদা!

অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হ'য়ে এলো। পাহাড়ের বুকে চারদিকের ঘরগুলিতে ধীরে ধীরে আলো জ্বলে উঠলো। আশ্রমের ঠাকুরঘরে আরাত্রিকের ঘণ্টাও বেজে উঠলো। আমরা সকলে মন্দিরে গিয়ে স্তোত্রপাঠে যোগ দিলাম। আরাত্রিক শেষ হ'তে বাজলো প্রায় আটটা। তারপর চলে এলাম স্বামীজী মহারাজের আফিস-ঘরের দিকে। তাঁর আফিস-ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখি দরজাটি বন্ধ ক'রে নিবিষ্ট মনে তিনি কি একখানা বই পড়ছেন। দরজা ঠেলে ভিতরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের বল্লেন: 'এই যে, ক্যামন লাগছে তোমাদের দার্জিলিঙ?'

আমরা বল্লাম: 'মহারাজ, ভালই লাগছে, তবে ঠাণ্ডাটা পড়েছে কিছু বেশী'।

স্বামীজী মহারাজ একটু হেসে বল্লেন : 'তবুও এ'টা বৈশাখমাস, শীতকালে এলে তো একেবারে জমে বরফ হ'য়ে যেতে'।

গেষ্টরুমের দু'পাশে সাজানো বেতের চেয়ার। আমরা তাতে গিয়ে বসলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন একজন আগন্তুক, স্বামীজী মহারাজকে তিনি দেখতে এসেছেন কলকাতা থেকে। দার্জিলিঙে এসে চাঁদমারীতে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তিনি উঠেছেন ও বৈকালে এসেছেন আশ্রম দেখতে। আমরা তাঁর পরিচয় দিলে স্বামীজী মহারাজ শুনে বল্লেন : 'বেশ, বেশ, বসুন। তা—মশায়ের কি কাজ করা হয়?' আগন্তুক ভদ্রলোক হাতজোড় করে বল্লেন : 'আপনি আর আমাদের 'মহাশয়' বলবেন না। বয়সও আমার অত্যন্ত ছোট। তা'ছাড়া আপনারা মহাপুরুষ—আমাদের শ্রদ্ধেয় ও চির প্রণম্য'।

স্বামীজী মহারাজ হেসে বল্লেন : 'তা বেশ! তবে কারু বয়স কম হ'লে যে তার প্রতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করায় আপত্তি আছে তা কেবল এখানেই (ভারতবর্ষেই) দেখছি। সামাজিক আচারের মধ্যে শিষ্টাচার প্রদর্শন ও শিষ্টসম্ভাষণ হ'ল অন্যতম। কাকেও 'তুমি' বা 'তুই' বল্লে যে তার প্রতি অসম্মান দেখানো হয় এমন কথা আমি বলছি না, কেননা মনের ভাব নিয়েই কথা। মা, বাবা যখন তাঁদের ছেলেকে 'তুই' বা 'তুমি' বলেন, তখন তাদের মধ্যে পুত্রস্নেহের অনাবিল ভাবই লুকোনো থাকে। আবার মনিব যখন চাকরকে 'তুই' বা 'তুমি' বলেন তখন তার ভিতর থাকে শ্রেষ্ঠত্বের ও আভিজাত্যের অভিমান। একজন অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা বড় মানে সে মর্যাদায় ও সম্মানে বড়। এর মধ্যে কিন্তু যথার্থ স্নেহ ও ভালবাসার ভাব এতটুকুও থাকে না, থাকে বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব। সাধুভাবকে বজায় রাখার জন্য সমাজে শিষ্টাচারের প্রচলন আছে। সভ্যতার ভাবও মেশানো এ'সবের মধ্যে। শিষ্টাচার বলতে মোটামুটি বোঝায় প্রত্যেকের প্রাপ্ত

যথাযোগ্য সাধু ব্যবহার।[১] শিষ্টাচার কিনা শিষ্ট-আচরণ বা সদাচরণ। তাই বয়সে, মর্যাদায় বা গুণে একটু ছোট হ'লেই যে অসম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করতে হবে এমন কোন কথা নাই, না করাটাই বরং দোষের কথা'।

তখন আমাদের মধ্যে একজন স্বামীজী মহারাজকে প্রশ্ন করলেন: 'কেন মহারাজ, 'তুমি' বা 'তুই'-শব্দ ব্যবহার করলে কি কাকেও হেয়জ্ঞান বা অবজ্ঞা করা হয়?'

স্বামীজী মহারাজ: 'সে তো আমি বল্লামই। ভাব অর্থাৎ মনোভাব যদি ভাল থাকে তবে অবজ্ঞা করা বোঝাবে কেন, কিন্তু সাধারণতঃ একজন মানুষ আর একজন মানুষকে যখন 'তুই' বা 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করে তখন তার মনের অবচেতন-স্তরে লুকানো থাকে এক শ্রেষ্ঠত্বের ভাব। আর তার সঙ্গে মশানো থাকে কিছুটা অহংকারের ভাব বা অভিমান, অর্থাৎ সে যে সম্মানে ও মর্যাদায় অপরের চেয়ে বড়, সমকক্ষ নয়—এই ভাব বা অভিমান থাকে। আসলে কি জানো? আত্মাভিমান জিনিসটা ভাল নয়। অভিমান থেকে অহংকার আসে, আর অহংকার এলে ভাল-মন্দ-জ্ঞান লোপ পায়। গীতায় আছে 'অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'।

গীতায় (২ ৬২-৬৩) শ্রীকৃষ্ণ একথাই বলেছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

১। সংহিতাকার মনু বলেছেন যে, সমাজে আচার বা শিষ্টাচারই ধর্মের প্রথম অর্থাৎ প্রাথমিক প্রকাশ। আচার বলতে ব্যবহার, আচরণ। পুত্র পিতার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে ও মাতার সঙ্গে কি ব্যবহার করবে, একজন মানুষ সংসারে অপরাপরের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে, সমাজের সকলের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করবে—এরই নাম আচার। এই আচার বা ব্যবহার ধর্মানুষ্ঠানের প্রথম সোপান। আচার তাই পারস্পরিক সাধু-ব্যবহার।

ক্রোধাদ্ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

ভাল-মন্দের জ্ঞান লোপ পায় কখন্?—যখন বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। বিচারবুদ্ধিই মানুষকে সৎপথে ও কল্যাণের পথে চালিয়ে নিয়ে যায়। এজন্য 'রাগ' বলতে আসক্তি এবং 'দ্বেষ' বলতেনিরাসক্তি। কিছু চাওয়া ও না-চাওয়া কোনটাই না থাকলে তবে মানুষ জীবনে শান্তি পায়—'আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি',। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে জয় (বশীভূত) ক'রে আত্মস্থ হতে পারেন একমাত্র তিনিই প্রসাদ বা আত্মপ্রসন্নতা-রূপ শান্তি লাভ করেন। তখন আর 'অহং'-অভিমান-রূপ মনের অহংকারবৃত্তি থাকে না।

অহং-অভিমানের নামই আত্মাভিমান। এখানে 'আত্মা' বলতে 'সেল্ফ' (self) নয়, ইগো (ego) বোঝায়। ইগো অর্থে দেহের প্রতি 'আমি' বা মমত্ববোধ,—যার নাম জীবাত্মা পরমাত্মা অর্থে নয়। শরীর আত্মা থেকে পৃথক, শরীর অনিত্য ও নশ্বর, আর আত্মা নিত্য ও অবনিশ্বর এই জ্ঞানের অভাব হয় অহংকারে। তাই অনিত্য বস্তুকে নিত্য ব'লে মনে করা বা জ্ঞান করার নাম ভ্রমজ্ঞান। ভ্রমজ্ঞানের অপর নাম অহংজ্ঞান বা অহংকার। অহংকার অর্থে ছোট বা কাঁচা-আমি, আর বড় বা পাকা-আমির নাম অবিনশ্বর আত্মা। 'কাঁচা-আমি-রূপ ইগো বা দেহাত্মজ্ঞানকে ঠিকভাবে জানতে বা বুঝতে হ'লে আত্মবিশ্লেষণ করতে হয়। এই বিশ্লেষণ করার নাম সেল্ফ-অ্যানালিসিস্ বা সাইকোঅ্যানালিসিস্। সাইকো (psycho) অর্থে আত্মা বা মন সাইকো-এ্যানালিসিসে (মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে) এ'গুলি ধরা পড়ে। তাই নিজের মধ্যে অভিমানের ভাবকে না জাগানোই ভাল।'

'ভগবান সকলের মধ্যেই আছেন মহাপ্রাণরূপে—চৈতন্যরূপে। তাছাড়া বিবেক, বুদ্ধি, বিচারশক্তি কার মধ্যে নাই বলো? তাই

নিজেদের স্বরূপ শুদ্ধআত্মাকে যারা জানে না, তারাই দুর্বল। ও শক্তিহীন। তারা একজনের চেয়ে অপরকে ছোট বা বড় ব'লে ভাবে। জ্ঞানীরা তাই শিষ্টাচারের প্রবর্তন করেছেন সমাজের মঙ্গলের জন্য। আমাকে, তোমাকে ও সকলকে নিয়েই তো সমাজ। ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই উভয় মানুষের কল্যাণ সমাজবাসীর কাম্য। পূর্বেই বলেছি যে, মনু তাই বল্লেন—আচারই ধর্ম। আচার কিনা শিষ্টাচার। আচার প্রকাশ পায় আচরণ বা ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। কাকেও হয়তো কটুকথা বল্লে—কি মিষ্টিকথা বল্লে—এ'সব নিয়ে কথা নয়, কথা হ'ল মনের ভাব নিয়ে। আমরা বাইরে যে ভাষা ব্যবহার করি তা' আমাদের অন্তরের ভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। কোন-কিছু করার বা বলার পূর্বে আমরা মনে তার চিন্তা করি প্রথমে, তারপর মুখরূপ যন্ত্র দিয়ে তাকে বাইরে প্রকাশ করি। বেদান্তও বলে যে, বাইরের জগৎ মনেরই বিকাশ মাত্র। আচার্য শঙ্কর প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন : 'চরাচরম্ ভাতি মনোবিলাসম্'। তাই অন্তরের ভাব ভাল হ'লে বাইরের কথাবার্তা এবং আচরণও ভাল হয়। এর বিপরীতভাবে বলা যায় যে, বাইরের কথাবার্তা ও আচরণ ভাল হ'লে অন্তরের ভাব ভাল হয়। সাইকোলজিতে (মনোবিজ্ঞানে) এই জিনিষটিকে বলা হয়েছে থট্ এ্যাণ্ড স্পিচ্ (thought and speech), অথবা আইডিয়াজ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডস্ (ideas and words)। অন্তরের চিন্তা বা আইডিয়াটাই (ভাবটাই) বাইরে প্রকাশ পায় স্পিচ্ (কথা) বা ওয়ার্ডের (শব্দের) আকারে। দার্শনিক ভর্তৃহরি তাঁর 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা'-য় এ'সব নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। ভাবের সঙ্গে কথার নিত্যসম্বন্ধ। দর্শনকাররা ভাব ও কথাকে[২] তাই শিব-শক্তি বা পার্বতী-পরমেশ্বর বলেছেন। ভারতবর্ষে সকল কিছুকেই আধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখা হয়, কারণ আধ্যাত্মিকতাই ভারতের বৈশিষ্ট্য'।

২। বেশীরভাগ সময়ে ভাব ও কথায় পরিবর্তে শব্দ ও অর্থের তুলনা করা হয়। শব্দ ও অর্থ শিব ও শক্তির মতো—দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে থাকে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে স্বামীজী মহারাজ পুনরায় বল্লেন: 'কথা ও ভাষার দিকে তাই সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয়, কারণ কথা ও ভাষা ভাবের অভিব্যক্তি ব'লে ভাষার সারল্য ও স্বচ্ছতা ভাবের মাধুর্যকে আরো বৃদ্ধি করে। শিষ্টাচার বা শিষ্ট-আচরণেরও কতকগুলি উপাদান বা উপকরণ আছে, যেমন সাধুভাষা, কল্যাণ-চিন্তা ও চেষ্টা, পরোপকার করা, স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন প্রভৃতি। এই উপকরণ-গুলি মানুষের অন্তরের ভাবকে সমৃদ্ধ করে। পাশ্চাত্যের মানুষ শিষ্টাচারকে যথেষ্ট মূল্য দেয়। পাশ্চত্যদেশে গুড-কানডাক্ট (good conduct) ethical philosophy-র (নৈতিক দর্শনের) পর্যায়ে পড়ে। ভারতে মহামতি মনুও আচার বা সাধু-আচরণকে ধর্মের প্রাথমিক স্তব বা সোপান বলেছেন। পাশ্চাত্যে যোগ্য ও গুণী ব্যক্তির সম্মান বিশেষভাবে আছে। ওদেশের লোকেরা তাই যতটুকুসম্ভব সম্মানসূচক ব্যবহার করতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না। নারাজাতির প্রতি সম্মান দেখানো কে পাশ্চাত্যবাশীরা কর্তব্য কর্ম ব'লে মনে করে। আমাদের দেশেও যে করে না—তা নয়। কিন্তু অনেকেই আবার দেখেছি যে, শিষ্টাচারকে অবশ্যপালনীয় ব'লে মনে করে না। ভারতবর্ষই তো একমাত্র দেশ—যেখানে নারীজাতির প্রতি সম্মান যথার্থভাবে দেওযা হয়েছে। নারীজাতি মাতৃজাতি। বেদে ও তন্ত্রে এঁদের আদ্যাশক্তি বলা হযেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর নিজের সহধর্মিণীকে জগন্মাতা[৩] ব'লে পূজা করেছিলেন। কিন্তু আজকাল সেই আদর্শের প্রতি সম্মান দেওয়াকে কেউ কর্তব্য কর্ম ব'লে মনে করে না। তার পরিবর্তে ভোগ ও স্বার্থই-বরং আমাদের যথাসর্বস্ব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মনুর উপদেশ এখন ভেসেই গেছে। এ'দিক থেকে বরং সত্যকারের ভারতীয আদর্শ বজায় রেখেছে পাশ্চাত্যের লোকেরা।

৩। ফলহারিণী-কালীপূজার দিন শ্রীশ্রীমা-কে শ্রীশ্রীঠাকুর ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরীরূপে পূজা করেছিলেন।

নারীজাতির প্রতি ওদের আচরণ সর্বদাই মর্যাদা ও সম্ভ্রমপূর্ণ। সর্বত্রই মেয়েদের ওরা আগে আসন ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে ঐসবের বালাই নেই। আজকাল এদেশে মেয়েরা শিক্ষালাভ ক'রে স্বাধীনতার মর্যাদা কিছুটা বুঝেছে ও বাড়িয়েছে, কাজেই যথেচ্ছাচারিতার যুগ ক্রমশই অবসান হয়ে আসছে মনে হয়। বৈদিক যুগে সমাজে নারীদের পুরুষদের মতোই সমান অধিকার ও মর্যাদা ছিল। ব্রাহ্মণযুগে স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা সেই সব অধিকার লোপ ক'রে দিয়েছিল। এর কারণ আর কিছু নয়, বাহ্মণ্যযুগে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ক্ষমতা ও আধিপত্যকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। ঈশ্বর যেমন পুরুষদের সৃষ্টি করিয়াছেন, মেয়েদেরও তেমনি। জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা ও অধ্যবসায় উভয় জাতিরই সমান। কাজেই সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার উভয়েরই থাকা উচিত। সংসারেও পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে, নইলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। ক্রমশই সমাজের অসংখ্য দোষ ত্রুটির প্রতিচ্ছবি যেন আমাদের চোখের সামনে জ্বলন্ত হ'য়ে উঠেছে। সমাজের নগ্ন ও মলিন মূর্তি চিন্তা করলে অন্তর বেদনাতুর ও চঞ্চল হয়ে ওঠে'।

স্বামীজী মহারাজ বললেন : 'সমাজের সকল-কিছুকে আবার নূতন ক'রে তৈরী করতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা দেখাবে। শুধু তাই নয়, পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদের প্রতিও আমাদের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি সর্বদাই প্রসারিত থাকা উচিত। অন্তরের সুপ্ত দেব-শক্তিকে ও গুণকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবে একমাত্র মানুষই তার পারস্পরিক সহযোগিতা, দৃষ্টি ও কর্ম দিয়ে, সেজন্য দৈবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা দুর্বলতার চিহ্ন। মানুষের সঙ্গে মানুষ ভাল ব্যবহার করবে—তার অর্থ একজন অপরের আত্মস্বরূপের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাবে। অবশ্য কেউ পরিচিত হ'লে

আদবকায়দার কোন বালাই থাকে না। আমিও আমার কোন কোন শিষ্যদের বলি 'তুই' বা 'তুমি'। এটা অবশ্য স্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টি অনুসারে। তবে আপনি এসেছেন আমাদের মঠে অতিথি হিসেবে, সুতরাং আপনাকে যত্ন করা ও সম্মান দেখানো আমাদের কর্তব্য'।

আগন্তুক ভদ্রলোকটির অবস্থা তখন সত্যই শোচনীয়। স্বামীজী মহারাজের একান্ত সৌজন্য, ভালবাসা ও সম্মান-প্রদর্শনের ভাব দেখে শুধু তাঁর কেন—সকলেই আমরা বিমুগ্ধ ও বিস্মিত। আগন্তুক ভদ্রলোকটি তখন একটু শশব্যস্ত হয়ে স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মহারাজ সস্নেহে তাঁকে বাধা দিয়ে বল্লেন : 'থাক্ থাক্, আপনারা ভক্তলোক, বসুন, প্রাণের বিনিময়টাই আসল। দার্জিলিঙ-আশ্রম দেখে আপনার কেমন লাগলো বলুন ?'

পূর্বেই বলেছি যে, আগন্তুক ভদ্রলোক দার্জিলিঙ-বেদান্ত-আশ্রমে[৪] এসেছেন স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করতে। ভদ্রলোকটি সম্ভ্রমের সঙ্গে আসন গ্রহণ ক'রে হাতজোড় ক'রে বল্লেন : 'একদিন বৈকালে এসে সমস্ত আশ্রমটি ঘুরে দেখেছি। বড়ই শান্তিপূর্ণ। চারিদিকের পরিবেশ ও দৃশ্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের দিব্যভাবপূর্ণ শান্ত নীরবতা প্রাণের সকল দুঃখ-দৈন্য যেন দূর ক'রে দেয়'।

স্বামীজী মহারাজ সেই কথা শুনে প্রসন্ন মুখে বল্লেন : 'এরই জন্য তো এতদূরে এই পাহাড়ের উপর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা! শ্রীশ্রীঠাকুরের এখানে দিব্য-আবির্ভাব। যে যেখান থেকেই আসুন না কেন—শান্তি ও আনন্দ তিনি পাবেনই এখানে। সহর থেকে স্থানটা একটু দূরে ও নীচে হওয়ায় নির্জনতা সদা-সর্বক্ষণই

৪। দার্জিলিঙে আশ্রমটি রেলওয়ে-ষ্টেশনের একেবারে নীচে ষ্টেশনের নীচে রাস্তা (সিঁড়ি) আছে আশ্রমে যাওয়ার জন্য।

পাওয়া যায়। সাধু ও ভক্তেরা এখানে এসে বিশ্রাম করবেন, প্রাণে শান্তি পাবেন। মোটকথা সকলের শান্তির জন্যই এই আশ্রম'।

ভদ্রলোক একজন চিত্রশিল্পী। কলকতা গভর্ণমেণ্ট-আর্ট-স্কুল থেকে পাশ করার পর দশ-বারো বছর ধরে ছবি-আঁকা নিয়ে ডুবে আছেন। আর্ট বা শিল্প-সম্বন্ধে পড়াশোনা তাঁর যথেষ্ট। স্বামীজী মহারাজ তাঁর পরিচয় পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন। তিনি বল্লেন: 'আপনি তো মশায় একজন গুণীলোক। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করাই আপনার কাজ। তবে উপভোগ নিজে করলেই তো হবে না, অপরকেও তা' করাতে হবে। ঠিক ঠিক আর্টিষ্টের (শিল্পীর) লক্ষণই হ'ল যে, নিজে সৌন্দর্য উপলব্ধি ক'রে শিল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবেন সেই সৌন্দর্যকে অপরের সার্থক-উপভোগের জন্য। শিল্পে শিল্পী নিজে আত্মহারা হন, আর অপরেও যাতে শিল্পে আত্মহারা হন তার চেষ্টা করবেন। অনন্তের অজানা ভাব ও সৌন্দর্য বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়েই অভিব্যক্ত হয়। শিল্পের সাধনা জাগ্রত করে শিল্পের ভিতর পবিত্র শান্তি ও চেতনাকে এবং তাই দিয়ে শিল্পী অনুভব করেন প্রকৃতির ভাব ও অপরূপ সৌন্দর্যকে তাঁর অনুভূতি দিয়ে এবং তিনি তা প্রকাশও করেন সর্বসাধারণের কাছে। তাই শিল্পী শিল্পের পরিবেশক মাত্র। সেজন্যই সেই পরিবেশনের পিছনে শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রাণপাত পরিশ্রম বা সাধনা থাকা চাই'।

কিছুক্ষণ চুপ করার পর স্বামীজী মহারাজ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন: 'আপনার থাকা হয় কি কলকাতায়'?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন: 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

স্বামীজী মহারাজ: 'তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনি আমাদের কলকাতার বেদান্ত-মঠে গেছেন?'

ভদ্রলোক: 'আজ্ঞে না'।

স্বামীজী মহারাজ: 'সে কি? কলকাতায় আশ্রম করলাম আপনাদের জন্যই। কলকাতা থেকে দিন দিন পায়ে হেঁটে বা গাড়ী

ক'রে তো আর বেলুড়-মঠে যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলাম। উত্তর-কলকাতা হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাস্থল। ওই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়েই তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেশব বাবুর বাড়ীতে যেতেন। যদিও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের চেহারা তখন ছিল ভিন্ন রকমের। সিমলায় রামচন্দ্র দত্ত ও সুরেশ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রায়ই যাতায়াত ছিল। ব্রাহ্মসমাজে, ঠনঠনের কালীবাড়ী ও কখনো কখনো গুহদের কালীবাড়ীতেও তিনি যেতেন। গুহদের কালীবাড়ীতে কষ্টিপাথরে তৈরী কালীদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবচরণ গুহ ৩০শে ফাল্গুন ষোড়শী সংক্রান্তিতিথিতে। দেবীর নাম 'নিস্তারিনী কালীমাতা'। গুহদের কালীবাড়ী কলকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে পাঁচ মিনিটের ব্যবধান। শ্রীরামকৃষ্ণের পূণ্য-পদধূলিতে বিশেষ ক'রে উত্তর-কলকাতার পথঘাটের ধূলিকণা চিরপবিত্র। আমি তাই উত্তর-কলকাতাকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠ ও মন্দির স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করলাম, নইলে কলকাতার আশেপাশে বা কিছু দূরে স্থানতো পেয়েছিলাম প্রচুর। কিন্তু তাতে আমার উদ্দেশ্য সাধন হতো না। আমেরিকা থেকে ফেরার পর (১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে) কলকাতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে বিশেষ ক'রে কিছু একটা করার বাসনা জেগেছিল। ভাল একটা ইউনিভার্সিটি (বিশ্ববিদ্যালয়) ও সর্বভারতীয় সন্ন্যাসী-সংঘ[৫] গড়ে তোলারও প্রবল ইচ্ছা ছিল মনে।

৫। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যে সমস্ত জনহিতকর কাজ আরম্ভ করার মনস্থ করছিলেন তাদের মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ছাড়া সর্ব-ভারতীয় সাধু বা সন্ন্যাসী-সংঘ প্রতিষ্ঠা করাও ছিল অন্যতম কাজ। ভারতে সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান ও আলাপ-আলোচনার সাহায্যে ঐক্য ও ভালবাসার একটি সম্পর্ক গড়ে তোলাই ছিল তাঁর ঐ সংঘ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

আর ইচ্ছা ছিল পাহাড়ের উপর নির্জন স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার। করুণাময় ঠাকুর অবশ্য সেই আশা আমার পূর্ণ করেছেন। কলকাতার মঠ বা আশ্রমের কথাও তাই। কলকাতার বুকে একটি সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা তো আপনাদের জন্যই। আপনাদের মতো গুণী ও ভক্ত লোকদের সেখানে সর্বদাই সমাগম হবে এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাধনা, আধ্যাত্মিকতা, সেবা—এই সকলগুলির কেন্দ্রস্থল হবে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, তবেই তো বহুদিনের বাসনা আমার সফল হবে'।[৬]

আমরা ভক্তের দল শান্তশিষ্টভাবে শুনেই যাচ্ছি স্বামীজী মহারাজের কথা। তাঁর ভাববিহ্বল ও প্রাণস্পর্শী কথা শোনার অবসরে একটি মাত্র প্রশ্নও জাগেনি তখন আমাদের মনে, কেবল শোনারই হয়েছিল আকুল-আগ্রহ। স্বামীজী মহারাজ ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে আবার বললেন : 'কলকাতার মঠে(রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে) যাবেন। আপনি আর্টিষ্ট (শিল্পী)। পেন্টিংসের (চিত্রশিল্পের) একটি শ্রেষ্ঠ অবদান ঐ বেদান্ত মঠের মন্দিরেই আছে। অবদানটি

সার্বভৌমিক মতবাদ ও ভাবধারার ভিত্তিতে যাতে অখণ্ড একটি সন্ন্যাসী-সংঘ গ'ড়ে ওঠে, সকলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ মনোভাব নষ্ট হ'য়ে সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়—এই ছিল ঐ সংঘ গড়ে তোলার পিছনে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানা বাধাবিপত্তির জন্য সেই মহতী ইচ্ছা কাজে পরিণত হ'য়ে ওঠেনি।

৬। ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিটে (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্থায়ী জমি কেনার পূর্বে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সিমলা ষ্ট্রিটে স্বর্গত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীটি কিনে সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ স্থাপন করতে মনস্থ করেছিলেন ও সেজন্য তিনি আবেদন-পত্র (Appeal) ছাপিয়ে বিশেষভাবে চেষ্টাও করেছিলেন। আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ডঃ পি. সি. রায়, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তদানীন্তন প্রখ্যাতনামা বহু ভদ্রলোক। মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয় তখন কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের সভাপতি। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁকেও

অষ্ট্রিয়ার (প্রাগের) একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ (Frant Dvo´rak)-অঙ্কিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীসারদাদেবীর হু'টি লাইফ-সাইজ অয়েল-পেন্টিংস্ (তৈলচিত্র)। ছবির প্রশংসা আমি আর কি করবো। ছবি-হু'টি দেখার জন্য নানান স্থান ও দেশ থেকে শিল্পীরা এসেছেন

রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীটি কেনার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু নানান কারণে সে'কাজ অবশ্য সফল হয় নি।

তাছাড়া এখানে এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ লিখিত *History of Ramakrishna Math and Mission* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত কিছুটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করি, স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ লিখেছেন :

"Swami Abhedananda, who left the United States for good on July 27, 1921, stoped at Honolulu to attend the Pan-Pacific Educational Conference as a delegate, on August 11. From there he arrived at Calcutta on November 10 via Japan and Burma. He was heartily welcomed by the brotherhood at Belur, as also by the general public of Calcutta and other places. His visit to Jamshedpur on January 10, 1922, was very successful, and so was his lecture tour in East Bengal in the company of Swami Shivananda. They reached Dacca on February 14 and Mymensing on February 24. At the latter place they laid the foundation of a temple of Shri RamaKrishna. Then they returned singly to the bed-side of Swami Brahmananda, who was about to take his final leave"......

"In the meantime he planned a long tour of Kashmir and Tibet, on which he started soon after his visit to Shillong. He returned to Calcutta on December 11, 1922. Reinstated now in his Trusteeship and hence membership of the Governing Body (of the Belur Math), he tried to persuade his colleagues to shift at least the Mission Headquarters to Calcutta, where it could be in more effective touch with the public, and where he could live and be more useful in the way he had trained himself in the west. As the Governing Body could not accede to his request, he decided to live in Calcutta all by himself from February 20, 1923, when he leased premises no. 48B Mechhua-

ও আসেন। তাঁরা দেখে শতমুখে প্রশংসা ক'রে গেছেন। ফ্রম দি আর্টিষ্টিক ভিউপয়েন্ট (শিল্পের দিক থেকে) ঐ দু'টি ছবির সত্যিই তুলনা নাই। সুতরাং আর্টিষ্ট (চিত্রশিল্পী) হিসাবে আপনার ঐ ছবি-দু'টি দেখা উচিত'।

ভদ্রলোক সর্বান্তঃকরণে সম্মতি জানিয়ে বল্লেন যে, এবার কলকাতা গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ঐ দু'টি ছবি নিশ্চয়ই তিনি দেখবেন।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অয়েলপেন্টিঙ-দু'টি এঁকেছেন প্রাগের বিদগ্ধ চিত্রশিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক্। তিনি ছিলেন আকুমার-ব্রহ্মচারী। জীবনের শেষদিন-পর্যন্ত তিনি ব্রহ্মচারীর মতোই জীবনযাপন ক'রে গেছেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন, নিজে হাতে রান্না ক'রে খেতেন, আর নিয়মিতভাবে ধ্যান, জপ ও গীতা পাঠ করতেন। ম্যাক্স-মূলার-এর 'লাইফ য়্যাণ্ড সেইঙস্

bazar Street. That was the prelude to more drastic steps. On May I he changed to 11 Eden Hospital Road, where as his Bengali biographer notes (Jivan-Katha, p. 474), he started the Vedanta Society, working along his own lines. As yet it was not a split. The Third General Report of the Mission, published in 1925, lists the Ramkrishna Vedanta Society at Calcutta among those centres about which it is written, "They are as yet but loosely connected with the Ramakrishana Order, but there is a prospect of their being recognised centres of the Order some day." As yet Swami Abhedananda himself maintained the best of friendly relations with the monks of the Belur Math and and its branches, who, in their turn, paid him frequent visits. Besides, he continued to be a Trustee of the Math and (Belur Math), therefore, a member of the Governing Body of the Mission till the last day, though with advancing age and preoccupation with the works of the Society, it became increasingly dificult for him to go to Belur to attend the (Governing Body's) meetings" (pp. 250-261).

অব রামকৃষ্ণ' পড়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন পরমভক্ত হ'য়ে পড়েন। অবশ্য তাঁর ভক্ত হওয়ার পিছনে বেশ একটা চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশ আছে - যা সত্যই সুন্দর এবং আশ্চর্য রকমের'।

উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'সেটা কি মহারাজ?' তিনি বল্লেন: 'ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ একদিন স্বপ্নে কোন এক সাধু-মহাপুরুষের মূর্তি দেখেছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছিল he must be an Indian Saint (তিনি নিশ্চয়ই একজন ভারতীয় মহাত্মা হবেন)। কিন্তু ভারতীয় মহাত্মা যে সত্যকারের কে তা' তিনি বহুদিন জানতে পারেন নি। কিছুদিন পরে হঠাৎ ম্যাক্স-মুল'যের লেখা 'লাইফ এ্যাণ্ড সেইঙস্ অব্ রামকৃষ্ণ' (শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও বাণী) তাঁর হাতে এলো। বইখানা খুলতেই একেবারে গোড়ার দিকে শ্রীরাকৃষ্ণদেবের ছবি দেখে তিনি চম্‌কে উঠে বল্লেন: 'এই তো সেই মাহাত্মা—যাঁকে আমি স্বপ্নে দেখেছি'। সমস্ত শরীর তাঁর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। জানতে পারলেন যে, তিনিই সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ এবং সেই ভারতীয় মহাপুরুষই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমগ্র জীবনী ও বাণীগুলি অতিশয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি পড়তে লাগলেন, একবার নয়, অনেকবারই, আর সেইদিন থেকে তাঁর ধ্যানের সামগ্রী হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি এবং জীবনের একমাত্র সহায়-সম্বল হ'ল প্রাণদীপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি প্রমাণ সাইজের (বড় আকারের) অয়েলপেন্টিঙ (তৈলচিত্র) আঁকতে ইচ্ছা করলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পূর্ব থেকে শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দ) সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা ও আলাপ-পরিচয় হয় লণ্ডনে। প্রাগে (Prague) যখন আমি যাই, তখন তিনি (ফ্রাঙ্ক ডোরাক্) সেখানে ছিলেন না। তাঁর ভগ্নী হেলেনা ডোরাকের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হ'ল। ফ্রাঙ্ক ডোরাক্

তখন থেকে আমায় নিয়মিতভাবে চিঠিপত্র লিখতে ও সাধন-ভজন বিষয়ে উপদেশ নিতে থাকেন। পরে তাঁর ভগ্নির কাছ থেকে আমার খবর পেয়ে একবার লিখে পাঠালেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁর অত্যন্ত ভালো লাগে। তাঁর নাম জপ ও ধ্যান কিভাবে করতে হয় লিখে পাঠালে তিনি কৃতজ্ঞ হবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম কেমন ক'রে জপ এবং তাঁর মূর্তি কিভাবে ধ্যান করতে হয় আমি সমস্ত লিখে পাঠালাম। তিনিও আমার নির্দেশ মতো নিয়মিতভাবে জপ-ধ্যান করতেন'।[৭]

'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি ছবি (তৈলচিত্র) আঁকার একান্ত ইচ্ছা নিয়ে ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ শরৎ মহারাজকে ও আমাকে লিখে পাঠালেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নানান রকম পশ্চারের (posture—ভঙ্গিমার) ছবি (ফটো) পাঠিয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য। যে তিন রকম পশ্চারের (ভঙ্গিমার) ছবি পাওয়া যায়, শরৎ মহারাজ তাঁকে তাই পঠিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিন রকমের তিনটি ছাড়া আর কোন ছবি নাই—যেমন একটি সামাধিস্থ বসা ছবি, একটি কেশববাবুর[৮] বাড়ীতে দাঁড়ানো ও অপরটি থামে হাত দেওয়া ধুতিপরা ও কোঁচাটি ঘাড়ে-ফেলা-পশ্চারের (ভঙ্গিমার) ছবি। এই তিন রকমের মাত্র ফটো তোলা হয়েছিল। ফ্র্যাঙ্ক ডোবাক্ আমায় চিঠি লিখে তা' জানান। প্রথমে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাষ্ট্ (bust—মস্তক থেকে বক্ষঃস্থল পর্যন্ত আধাখানা শরীরের) ছবি আঁকেন ও শরৎ মহারাজকে সে'টি উপহার-রূপে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু

৭। বলা বাহুল্য যে, ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক্ স্বামী অভেদানন্দকে দীক্ষাগুরু বলে' নিঃসংশয়ে স্বীকার করেছিলেন। ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক্ স্বামী অভেদানন্দকে যে-সকল চিঠীপত্র লিখেছিলেন সেগুলিতে স্পষ্টই তিনি স্বীকার করেছেন যে স্বামী অভেদানন্দই তাঁর অধ্যাত্মসাধনার পদপ্রদর্শক। স্বামী অভেদানন্দকে লেখা ফ্র্যাঙ্ক ডোরাকের মূল্যবান কতকগুলি পত্র সংগৃহীত আছে।

৮। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

তাতে তিনি সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি। তিনি আবার তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভিন্ন ভিন্ন পশ্চারের (ভঙ্গিমার) ফটো (আলোকচিত্র) চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ভাল ক'রে ফুল-ফিগারের (সম্পূর্ণ আকৃতির) একটি ছবি (তৈলচিত্র) আকার জন্য। শরৎ মহারাজ তিন রকম পশ্চারের (ভঙ্গিমা) ফটোই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন'।

আমাদের ভিতর থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন : 'তিন রকম ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর কোন পশ্চারের ফটো নাই কেন মহারাজ' ?

স্বামীজী মহারাজ : 'এর কথা আমি পরে বলবো মনে করিয়ে দিও। এখন যা বলছি শোন। ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ তিন রকমের ফটো পেয়ে কেশববাবুর বাড়ীতে হাততোলা সমাধিস্থ ছবিটাই পছন্দ করেন। কিন্তু ঐ ছবিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখদু'টি খোলা না থাকায় তিনি একটু চিন্তিত হয়েছিলেন। তাঁর মতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চোখ-খোলা থাকলে মুখের এক্স্‌প্রেসন্ (expression—ভাব) আরও ভাল ও প্রাণবন্ত হয়। তাই দিবারাত্র চিন্তা করতে লাগলেন চোখ-দু'টি খোলা থাকলে মুখের এক্সপ্রেসন (ভাব) কিরকম হয়। শিল্পের বা আর্টের দিক থেকে এ'কথা সত্য যে, রেখার সামান্য একটু অদল-বদল হ'লে চিত্রে কত-কিছু ভাবের পরিবর্তন হ'তে পারে। তাই চিন্তার বিষয় ছিল বিদগ্ধ শিল্পীর পক্ষে! একান্ত অভিনিবেশের সঙ্গে ও গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে একদিন ডোরাক বাহ্যিক জ্ঞান প্রায় হারিয়ে ফেলেন! ঐ অবস্থায় তিনি একটি ভিসন্ (vision—অলৌকিক দর্শন) দেখেন। তিনি ভাবচক্ষে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমোজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মূর্তি! শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসন্নঘন মুখ থেকে যেন স্নিগ্ধ-কিরণছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। ভাবচক্ষে শিল্পী দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চোখ-দু'টি খোলা এবং অফুরন্ত প্রেম ও করুণার ভাব তাতে মাখানো, অথচ একান্ত উদাসীন ও ব্রহ্মনিবদ্ধ

।ছল দৃ'ষ্টি। নিরাবিল আনন্দের ভাব ও পবিত্র উন্মাদনা নিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তুলি নিয়ে ছবিখানির মুখ আঁকতে লাগলেন। মুখের ভাবকে হুবহু ফুটিয়ে তুল্লেন যেমনটি দেখেছিলেন তাঁর দিব্যদর্শনে। তেজোময় জ্যোতিঃসমুদ্রের মাঝখানে ফুটিয়ে তুল্লেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ-চাওয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রসন্ন মুখটি। শিল্পীর সুপ্তস্বপ্ন জাগ্রত হ'য়ে উঠলো তখন আশা ও অফুরন্ত আনন্দের সার্থকতা নিয়ে'।

'ছবি-আঁকা প্রায় শেষ হওয়ার পূর্বে আমাকে ডোরাক্ একদিন চিঠি লিখে পাঠালেন শ্রীশ্রীঠাকুরের গেরুয়া-কাপড়ের রঙ্ কিরকম হবে জানার জন্য। চিঠি পেয়ে আমি আমার সিল্কের গেরুয়া-পাগ্ড়ি থেকে সামান্য একটু অংশ ছিঁড়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম। ছবিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাপড়ের রঙ্ হুবহু তিনি আমার পাঠানো গেরুয়া-পাগ্ড়ির নমুনা অনুযায়ী দিয়েছেন'।

আমাদের মধ্য থেকে সেই শিল্পী ভদ্রলোক এতক্ষণ পরে বল্লেন: 'অতি-অপূর্ব ঘটনা মহারাজ'।

স্বামীজী মহারাজ: 'অতি অপূর্ব ঘটনা তো বটেই। ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ ছিলেন শুদ্ধ ও পবিত্র আধারের মানুষ। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মতো তিনি জীবনযাপন করতেন, স্বভাবও ছিল সরল ও নির্মল, সেজন্যই শ্রীশ্রীঠাকুরের এ'ধরনের অতুলনীয় ছবি আঁকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ছবির প্রাণবন্ত মূর্তিতে ঈশ্বরীয় ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। ডোরাকের বন্ধু প্রাগের অন্যতম বিখ্যাত শিল্পী লোকা-র (Mr. Nloka) সঙ্গেও আমার বিশেষ পরিচয় ছিল'।

আমাদের মধ্য থেকে একজন তখন বল্লে: 'ছবিটি সত্যই লাইফ-লাইক্ (lifelike—জীবন্ত) হয়েছে। বামহস্তের আঙ্গুলগুলি পর্যন্ত এমনই নিখুঁৎভাবে আঁকা—যেন শরীর থেকে তারা সম্পূর্ণ পৃথক হ'য়ে ফুটে উঠেছে'।

স্বামীজী মহারাজ: 'হ্যাঁ, ওখানেই তো শিল্পীর অসামান্য কৃতিত্ব। যতদূর সম্ভব অরিজিন্যাল (original—মৌলিক) ক'রে ফুটিয়ে তোলাতেই ছবির—বিশেষ ক'রে অয়েল-পেন্টিঙ্-এর (তৈলচিত্রের) বৈশিষ্ট্য। শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ছবিরও তুলনা নাই। অপরূপ মূর্তির বিকাশ এবং লাবণ্যপূর্ণ শ্রীশ্রীমার অঙ্গসৌষ্ঠব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি-আঁকা শেষ ক'রে ডোরাক্ শ্রীশ্রীমার ছবিটি (তৈলচিত্র) এঁকেছিলেন। শ্রীশ্রীমার যে ফটোটি তিনি পছন্দ করেছিলেন তাতে মুখ ও চোখের দৃষ্টি ছিল ডানপাশের দিকে ফেরানো। তিনি ছবি-আঁকার সময়ে মুখটিকে সাম্‌নের দিকে ক'রে নিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমার ছবি-আঁকার পূর্বে অবশ্য স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) মাথায় পাগ্‌ড়ীবাঁধা একখানি বাষ্ট্ (bust) অয়েল-পেন্টিঙ্-ও (তৈলচিত্র) তিনি এঁকেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের সকল সন্তানদের এক একখানা ছবি আঁকেন। কিন্তু তা' আর হ'য়ে ওঠেনি, কারণ অসময়ে তাঁকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তবে আমার তিনখানি ছোট সস্‌পেন্টিঙ যে তিনি এঁকেছিলেন সে'তিনটি আমার কাছে আছে'। এই তিনখানির ভেতর দু'হাতে প্রণাম করা ছবিটি অন্যতম'।[৯]

শিল্পী ভদ্রলোক বল্লেন: 'মহারাজ, ধৃষ্টতা মাপ করবেন। শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ছবিটির এক্সপ্রেসন (ভাব) আরও সুন্দর, আরও সফ্ট (soft) ও লাবণ্যপূর্ণ। আপনার অভিমত এ' সম্বন্ধে শুনতে ইচ্ছা হয়'।

স্বামীজী মহারাজ: 'আর্টের (শিল্পের) দিক থেকে আমিও বলি যে, শ্রীশ্রীমার ছবি শ্রীশ্রীঠাকুরের চেয়েও রসোত্তীর্ণ। এটি

৯। বাকী দু'টি ছবির ভিতর একটি স্বামী অভেদানন্দের ইংরেজী 'ট্রু সাইকোলজি' বইয়ের গোড়ার দিকে ব্লক ক'রে ছাপা হয়েছে ও অপর দু'টি দেওয়াএখনো অপ্রকাশিত।

স্বামী অভেদানন্দ   শিল্পী : ফ্রাঙ্ক্ ডোরাঃ

Frant Dvora'k

প্রাগের বিদগ্ধ শিল্পী ফ্রাঙ্ক্‌ ডোবাক্‌

(পিছনে শিশু যীশুর ছবি)

শ্রদ্ধেয়া হেলেনা ডোরাক্‌

(ফ্রাঙ্ক ডোরাকের মধ্যম-ভগ্নি)

ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্ ও তাঁর ভগ্নি হেলেন। ডোরাক্ (ষ্টুডিওতে আসীন)

24. Riegrovo nab.
Prague Jan 16th 1914.

Reverend Swami!

Your esteemed card I have with much pleasure received and I thank you heartily for your kind lines and your good wishes to me. Also I thank you for the list of lectures, which I am sorry I cannot come to attend — but please you, if they are printed, not to forgett to have them send to me for I like to buy all your works. It would be great happiness for me, if I could come and stay near to you, but I do not know yet, how the things will turn out for me, for it would cost me lots of money as it is very expensive and here I have not much chance to

make so much as to undertake such travel. If I would sell some of my work then that would be easy and I would be ready right of to go Especialy if the large picture of the Last Supper would be sold, then not only to America, I would go to India! India is now talk of the day. Since Rabindranath Tagore received the Nobles price, newspapers and people are interrested about the wonderful Land; we attend the lectures about, and see it in Biograph with its beautiful Cities and life there. And myself having the happiness of knowing the ~~&~~ most blessed and noble Souls of that Land, I would be most enthusiasti[c] to be able to go there! But alas! the

money obstacles! ... - even for this financial reason the Book "My Master with Sayings of Sri Ramakrishna" is not yet published, which Mrs. Moudrá has translated. - I have received a letter from Swami Saradananda with thanks for the painted portrait of Blessed Lord Sri Ramakrishna which I have sendet to him - and Swami writes to me that he likes the picture and will give it in the room of Blessed Mother Sarada Devi; which gives me immence pleasure. -

I am writing in same time to Mrs. Faulkner for the adress of Miss Bowles and will send it right of to you -

I am very sorry Vedanta Schools could not exist here in Europe. People

are interested, and they love yours and Swami Vivekananda's books but as Mrs. Rands wrote not long ago we are all so scattered.—

Please reverend Swami accept my best wishes to you and my profound respect and believe me to be

Yours most devoted

Frant Dvořák

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্ কর্তৃক স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত পত্রের প্রতিলিপি।
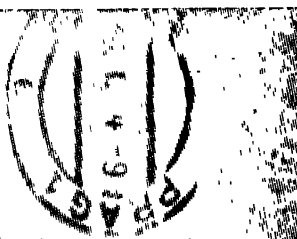
Reverend Swami Abhedânanda
Vedanta Ashrama
West Cornwall. Conn
U. S. America

ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্ (Frant Dvora'k)-কর্তৃক স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত পত্রের খামের উপরে লেখা ঠিকানা।

24. Riegrovo nábř.
Prague July 24th 1914

Reverend Swami:

Please accept my thanks for your kind thoughts of me. I was delighted to receive your postal card from June 4th. In thought I am daily with you and my wish is to be able to come near you, but my chances are small as yet. — I keep correspondance with Reverend Swami Saradananda and I promissed to him to paint a picture of the Blessed Mother Sarada Devi and I am only waiting for the Photographs from India for this purpose and then I shall right of start the work. — Swami Saradananda has been very kind to me, obtaining for me a finger print with blessings and love of Holy Mother Sarada Devi, on the Photograph of the Blessed Lord Sri Ramakrishna what makes me very happy. — In same time

I am sending to you three Photographs taken from the Drawing of the Blessed Lord which you have seen in London. Swami Saradananda asked me to have it photographed for him and I am now waiting to hear how he likes it. — I am allways working very hard, for I cannot finde a easy way to express myself in my painting and I accomplish comparatively very little of work, though I am doing it with love and without stop from early morning until night I cannot awake in me the power to be able to work more spiritualy, and yet I am surrounded with most beautiful books of such uplifting ideas. Just now I am reading the teaching of Bahaism - it is so beautiful! But

I feel allways same man, as thought I would have a unpenetrable crust on me which does not admit any light to go through. Yet I trust that all will come allright one day and I will surmount the obstacles, though they are many and difficult to overcome.

Thanking you for you good wishes and love to me, I beg you Reverend Swami, to accept the expression of my admiration, love and great respect and believe me please to remain Your devouted

Frant Dvořák

* ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই প্রাগ থেকে স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত ফ্রাঙ্ক্ ডোবাকের পত্রের প্রতিলিপি।

24 Riegrovo nabr.
Prague March. 4. 1928

Your Holiness!

Your very kind letter so anxiously expected, I had great pleasure to receive few days ago. It is a great relief to one, that the picture is already safely in Your hands, and my dear brother's wish fulfilled. It makes me very happy that You and Your friends like and admire the picture! My beloved brother would be so pleased that he succeeded to make You pleasure! — I am very sorry you had so much difficulties with the Customs departement. — I wanted to pay the duty here, but on Post office they said, there will be no duty at all since the picture is painted on Canvas and not on Silk! The price I had to put, otherwise they would not take it. So I put the smallest and did what they advised. Fortunately that you succeeded to get it for less.

than what at first they asked. - I have sended eight of 75. roupies on the address of Your Society through one of our Bank and hope you will gett it very soon and without trouble. Please accept it kindly from me, as I would not like You to have expenses with the picture, it will be enough to gett the frame! - The photo. reproductions of Holy Mother's picture, I will mail in about two days - This week I am going to speak with a lady writter Mrs P. Kondrić will ask her if she would undertake to translate Your book „How to be a Yogi" and the „Gospel of Ramakrishna", I have this books, and if I am not mistaken I have nearly all Your books - for my dear brother bought in London all he could gett, from Your work and Swami Vivikananda But non I have from Swami Saradananda, except the one which he kindly send to my

brother in Bengali languaage, to which unfortuna-
tely we did not understood - nor do I know any-
body who could understand - Two professors of
our University know Sanskrit, but that would
not help me. But we heard already here in
Prague Your language when Rabindranath
Tagore was lecturing, he read his poems in
that beautiful and melodious languaage
and everybody was enthusiastic. He was
already twice in Prague. The people are begining
to take more and more interest about
Your country and Your moovements, but mostly
are known R. Tagore and Ghandi. - The other
day, wrote me a friend of ours, that in Switzerland
he talked with Romain Rolland, the famous
writer, who is great admirateur also of Sri
Rama Krishna and his teaching and our
friend was so pleased to be able to tell him,
that he had opportunity to see in my brother.

Studio the drawing of the Blessed Lord - and the sketches of Your Holiness and of hearing so much about you from my dear brother.

Please accept many thanks for every kindness and blessings for my dear brother and myself, with many best wishes

I remain Your Holiness

Very Respectfuly Yours

Helena Dvořák

* ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা মার্চ তারিখে ফ্রাঙ্ক্ ডোরাকের ভগ্নি হেলেনা ডোরাক্-কর্তৃক স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত পত্রের প্রতিলিপি।

ফ্রাঙ্ক্ ডোরাকের (Frant Dvora'k) ভগ্নি হেলেনা ডোরাক্-কর্তৃক লিখিত পত্রের খামের প্রতিলিপি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

(প্রাগের বিদগ্ধ শিল্পী ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্-অঙ্কিত)

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

(শিল্পী ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্-অঙ্কিত)

শিল্পীর শ্রেষ্ঠ অবদান। এতে কলার-কম্বিনেশন্-এর (colour-combination—রঙ্ বা বর্ণ-সংমিশ্রণের) তুলনা নেই। ঠিকই বলেছেন যে, লাবণ্য, কমনীয়তা ও সফটনেস্-এর (softness—কোমলতার) সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও স্বর্গীয় ভাবের অভিব্যক্তি শ্রীশ্রীমার ছবিতে সুপরিস্ফুট। অফুরন্ত ভালবাসা, করুণা ও মাতৃত্বের পূর্ণবিকাশ ছবিতে প্রতিফলিত। শ্রীশ্রীমা নবযৌবনসম্পন্না। নারীত্বের সকল-কিছু সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ছবিটিতে মূর্ত ও জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। সর্বদা প্রসন্নতা ও ক্ষমাসুন্দর ভাব মুখে ও চোখে সুস্পষ্ট। শ্রীশ্রীমার স্তোত্রে আমি তাই লিখেছি—

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্॥
স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান্ সগুণী করোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্॥

রসরাজ অমৃতলাল বসু 'স্নেহেন বধ্নাসি'-লাইনটি পড়ে একদিন অশ্রুছলছল-নেত্রে আমায় বলেছিলেন: 'কালী মহারাজ, শ্রীশ্রীমার উদ্দেশ্যে রচিত আপনার এই লাইনক'টি চিরদিনের জন্য পৃথিবীতে সবার কাছে অমর হ'য়ে থাকবে। অপূর্ব এই কথা যে, করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা আমাদের সকল দোষকে সকল সময়ে গুণরূপে গ্রহণ করতেন—'সগুণী করোষি'। অহেতুকী ছিল তাঁর কৃপা। চিরক্ষমাসুন্দরমূর্তি ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদা, সে'জন্য পাপী-তাপী আমরা তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাওয়ার অধিকার পেয়েছিলাম।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে স্বামীজী মহারাজ ধীরভাবে পুনরায় বল্লেন: 'আমার কি ভাব জানো? শ্রীশ্রীমার কেন, সমস্ত দেবী-মূর্তিই নবযৌবনসম্পন্না হওয়া উচিত। প্রাচীন ছবিতে এবং ভাস্কর্যে দেখবে দেবীমূর্তিতে সর্বদাই নবযৌবন-রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বুড়ো, অসুখে জর্জরিত, রোগে বা মৃত্যুশয্যায় শায়িত—দেবদেবীদের এই ধরনের ছবি আঁকা বা প্রতিকৃতি তৈরী করা মোটেই উচিত নয়। শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধেও তাই। ফ্র্যাঙ্ক ডোরাকের আঁকা শ্রীশ্রীমার ছবিতে দেবীভাব ও স্বর্গীয় সুষমা সুপরিস্ফুট। অপূর্ব লাবণ্য ও অনাবিল আনন্দপূর্ণ স্নিগ্ধতা সমগ্র ছবিখানিতে মাখানো রয়েছে। ছবিটির সত্যই তুলনা নাই'।

আমাদের মধ্যে থেকে একজন হঠাৎ তখন বলে উঠলো: 'অনেককে বলতে শুনেছি যে, শ্রীশ্রীমার ছবি নাকি একটু ওয়েষ্টারনাইজড্—(Westernised বা বিলেতী ভাবাপন্ন হয়েছে)'।

স্বামীজী মহারাজ: 'হ্যাঁ, শ্রীশ্রীমার ছবিতে (প্রতিকৃতিতে) প্রাচ্যের পরিবর্তে পাশ্চাত্যের নারীত্বের ভাব ফুটে উঠেছে—এটাই তাদের বলার উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি-সম্বন্ধেও আমি ওরকম কত-কিছু মন্তব্য ও সমালোচনা শুনেছি। সাধারণ মানুষ কেন, বিশিষ্ট আর্টিষ্টদের মধ্যেও রুচি ও মতের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সকল শিল্পীর ও লোকের দৃষ্টিভঙ্গী সমান নয়। তবে যে-কোন আর্টের (শিল্পের) মধ্যে একটা নিজস্ব ভঙ্গী ও ধারা বজায় থাকা উচিত। যিনি আর্টিষ্ট (শিল্পী) হবেন, তাঁর সকল-কিছু সংকীর্ণ ও সম্প্রদায়িক ভাবের উর্ধে থাকা উচিত। তাঁর কাছে টেকনিক (technique—শিল্পকৌশল বা অঙ্কনশৈলী) ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু কলাসৌন্দর্যের ভিতর এদেশ-ওদেশ জাতিবিচারের কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। শিল্পী সৌন্দর্যের সাধক, শিল্পকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের আসনে বসানোই তাঁর কাজ। The

combination of light and shade-ই (আলো-ছায়ার সংমিশ্রনই) কেবল ছবি, প্রতিকৃতি বা চিত্র নয়, তাতে সঞ্জীবতা ও সচলপ্রাণের পরিচয় থাকা উচিৎ। শিল্পীমাত্রের মধ্যে তাই নিজস্ব একটি দৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে insight and inspiration (অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবের উদ্দীপনা) থাকা প্রয়োজন। শিল্পী সাধক, শিল্প তাঁর সাধনা। শিল্পীর মধ্যে কল্পনাশক্তি বিশেষভাবে প্রবল থাকে। কল্পনার বা চিন্তার মধ্যে প্রথমেই শিল্পী সকল জিনিসের ডিজাইন (design—ছাঁচ, নক্সা) ও আদর্শ সৃষ্টি করেন, তারপর তুলির স্পর্শে তাকে রেখায় ও রঙে বাইরে প্রকাশ করেন। সাবজেকটিভটা পরিণত হয় অবজেকটিভে, অথবা বলতে পারো আইডিয়ালিজম্ পরিশেষে রিয়ালিজম্ হ'য়ে দাঁড়ায়। তবে ছবি আইডিয়ালিষ্টিক (আদর্শ) ও রিয়ালিষ্টিক (বাস্তব) তু'রকমই আছে। গ্রীসিয়ান আর্ট (গ্রীসীয়-শিল্প) নিছক রিয়ালিষ্টিক (বস্তুনিষ্ঠ), কেননা গ্রীসীয় শিল্পীর মন ও শিল্পদৃষ্টি ছিল কেবল বাইরের অঙ্গসৌষ্ঠবের ও সৌন্দর্যের দিকে নিবদ্ধ। সুদৃঢ় সুঠাম শরীর, সবল মাংশপেশীযুক্ত অঙ্গ, সুদীর্ঘ নাসা ও আয়ত চক্ষু প্রভৃতি ছিল গ্রীসীয় শিল্পীদের অভিমতে শিল্পের সৌন্দর্যের নিদর্শন। মোটকথা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সৌন্দর্যের ছিলেন তাঁরা উপাসক। এ্যাপোলো, ডায়ানা প্রভৃতির ছবি দেখলেই তা' বুঝতে পারা যায়। ভারতীয় শিল্পের আদর্শ এ'সব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় শিল্পের সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য। ভারতের শিল্পী তাই জড়শরীরের চেয়ে মনকে বা ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে চান তাঁর শিল্পের ভিতরে।[১০]

১০। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যমভ্রাতা প্রজ্ঞাচক্ষুষ্মান মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় (মহিমবাবু) তাঁর 'শিল্পপ্রসঙ্গ' (১৮৯৭-গ্রন্থে গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট-সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন : "গ্রীক-প্রতীকে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই দ্রড়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, সুঠাম ও পূর্ণাঙ্গ শারীরিক শক্তি যেন পরিস্ফুট হইতেছে যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব করিতে সর্বদাই

আসলে শিল্পী ভাবেরই প্রধানপূজারী। উদাহরণ যেমন, বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্তি। ভারতীয় শিল্পীরা বুদ্ধের অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন না। হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ এ'সব মোটামুটিভাবে খোদাই করলেও বুদ্ধের শান্ত-সমাহিত ধ্যানঘন স্তিমিত মূর্তিকেই তাঁরা বিশেষভাবে পরিস্ফুট করতে চান শিল্পে। তাই বুদ্ধের মূর্তি দেখলে মনে হয় যে, বাইরের জগতের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে অন্তরের শান্তি ও আনন্দের সন্ধানেই বুদ্ধদেব নিজেকে গভীরভাবে ডুবিয়ে

প্রস্তুত। কিন্তু উচ্চাঙ্গের মনোভাব-পরিচায়ক বিশেষ-কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। ভারতীয় প্রতীকের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ধ্যানের উচ্চস্তরের মনোভাব নানাপ্রকারে ব্যক্ত করা। সেই ভাব ও আদর্শ-অনুযায়ী দৈহিকভঙ্গী বা পরিবর্তন দর্শান হইয়া থাকে। মন উর্ধতনস্তরে উঠিলে দেহ কিরূপ সূক্ষ্ম, কৃষ বা অন্যভাবের হয় তাহাই দর্শান হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রীকদিগের প্রতিকৃতিতে ভারতীয় মনোভাব-বিষয়ক কোনও লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে গ্রীসশিল্প হইল দেহীভাব-দর্শানো। দেহের সুদৃঢ়, স্ফীত মাংসপেশী, হস্তাদির বলপ্রকাশক অধিষ্ঠানসকল প্রদর্শন করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য। ভারতীয়েরা মনের উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আবহমানকাল হইতে কার্য করিয়া আসিতেছেন। গ্রীক ও হেলেনিজরা শরীর রক্ষা, শরীরচর্চা শরীরের সৌষ্ঠব ও শরীরের উন্নতির বিষয় লক্ষ্য করিয়া কার্য করিয়াছেন। এইজন্য দর্শনশাস্ত্রে উভয়েরই বিশেষ পার্থক্য আছে। ভারতীয়েরা অন্তর্নিহিত ভাব অবলম্বন করিলেন, গ্রীকেরা বাহ্যিক আবরণ বা দেহকে গ্রহণ করিলেন" (পৃঃ ১৮)।

পুনরায় মিশরীয় ও ভারতীয় শিল্পের স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্যের কথা উল্লেখ ক'রে শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'শিল্পপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের টীকায় আছে: "মিশরীয় শিল্পে দেবদেবীর মূর্তি ক্ষুদ্রকায়, কয়েক ইঞ্চির মধ্যেই সীমিত। ভারতীয় শিল্পে দেবদেবীর মূর্তিই মুখ্যতঃ বিরাট রূপ পাইয়াছে। ** মিশরীয় শিল্প আবার ভারতীয় শিল্পের আদর্শের সহিত বহু মিলি ও বিদ্যমান। পুঞ্জচিত্র-রচনাকৌশল, রেখাধর্ম, আলোছায়ার বৈপরত্যহীন সমতল রঙের ব্যবহার-পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দান, ভঙ্গিমা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ভারতীয় শিল্পের সহিত বহু মিলও আছে" (পৃঃ ১৬)।

দিয়েছেন। যোগাসনে অর্থাৎ বদ্ধপদ্মাসনে, ভূমিস্পর্শমুদ্রাযুক্ত হস্ত, মুদ্রিত চক্ষু, প্রসন্ন ও কল্যাণসুন্দর মূর্তি—এ'সমস্তই ভগবান বুদ্ধের আত্মকাম ও আত্মতৃপ্তির ভাবকে সমুজ্জ্বল ক'রে তুলেছে'!

স্বামীজী মহারাজের সেবক তখন তামাক দিয়ে গেলেন। নলটি মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে তামাক খেতে খেতে তিনি পূর্বেকার প্রসঙ্গের অনুসরণ ক'রে বল্লেন: 'বিশেষ ক'রে দেবদেবী ও মহামানবদের ছবি আঁকতে, কিংবা মূর্তি তৈরী করতে গেলে তাতে দেবত্বের ভাব ও অপার্থিব স্বর্গীয় সুষমা ফুটিয়ে তোলা উচিত। শিল্পের জগতে ইষ্ট ও ওয়েষ্ট (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)—এ'ধরনের কোন কথা, প্রশ্ন বা বিভাগ থাকা উচিত নয়। তবে টেকনিকের (অঙ্কনশৈলীর) মধ্যে ভেদ থাকতে পারে। মানুষের রুচি বিচিত্র। শিল্পীও মানুষ, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর ভিতর রুচির বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক। টেকনিক বা অঙ্কনশৈলী শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সৃষ্টি হয়। দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ রুচি বা প্রবৃত্তি। মানুষমাত্রেই তার ইচ্ছার বশবর্তী। মানুষ তার নিজের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির অনুসারে সকল জিনিস ভাঙে ও গড়ে। সকল সৃষ্টির মূলে তাই ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি থাকে। শুধু মানুষ কেন, স্রষ্টা ঈশ্বরও অপরূপ বিশ্ব সৃষ্টি করেন তাঁর কল্যাণী ইচ্ছার ইঙ্গিতে। সাইকোলজিষ্টরা (মনোবৈজ্ঞানিকরা) ইচ্ছাকে তাই সকল কার্যের কারণ বলেন। শ্রেণী বা জাতি-হিসাবে মানুষ এক ও অখণ্ড ব'লে পরিচিত হলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশ, জলবায়ু, সামাজিক পরিবেশ ও ভৌগলিক পরিস্থিতি-অনুযায়ী মানুষের রুচি, প্রবৃত্তি, ভাষা ও ভাষার উচ্চারণ বিচিত্র হওয়া স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের শিল্পী যে-রুচি ও মনোভাব নিয়ে ছবি আঁকেন, জাপানী শিল্পী ঠিক সেই একই রুচি ও ভাবকে নিয়ে ছবি আঁকেন না। পাশ্চাত্য শিল্পীর রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী আবার তাঁদের থেকে ভিন্ন। তবে দৃষ্টিভঙ্গী শিল্পীর নিজস্ব রুচি থেকেই গড়ে ওঠে। উদাহরণ

যেমন, গৌতম-বুদ্ধের ছবি ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্পীরা এঁকেছেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। গান্ধারশিল্প মথুরাশিল্পকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে নি, তাই মথুরাশিল্প অন্যান্য শিল্প থেকে একটু পৃথক। অমরাবতীর শিল্পবৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ভারতীয়, গান্ধারের প্রভাব তাতে নেই বল্লেও চলে। বৌদ্ধযুগে অজন্তা ও বারহুতের শিল্পচাতুর্য্যের মধ্যেও হুবহু মিল পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্যেও তাই। পাশ্চাত্য স্থাপত্যে গথিকের সঙ্গে সারাসেনিকের ঠিক মিল নাই। Man thinks and does everything in his own image (মানুষ প্রত্যেক জিনিসই নিজের অনুরূপ চিন্তা ও কাজ করে)। এ'রকম হওয়াটাই বরং স্বাভাবিক। বাঙলাদেশের শিল্পী দেবীমূর্তি আঁকলে দেবীর মুখের ভাব, গড়ন ও পোষাকপরিচ্ছদ সবই বাঙ্গালী মেয়েদের মতো করবে। জাপানী-শিল্পী ছবি আঁকলে ফুটিয়ে তুলবে তার নিজের দেশের ও সমাজের রুচি ও বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্যের শিল্পীরা আঁকবে তাদের সমাজের আচার-ব্যবহার ও রুচির দিকে নজর রেখে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছবিতে ও মূর্তিতে তাই নাক, মুখ, চোখ, কাণ, শরীরের হাবভাব, গায়ের রঙ ও গঠন, পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতির মধ্যে ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে দেখা যায়। একই সরস্বতী, দুর্গা ও গণেশের ছবি ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্পীদের হাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের দেবদেবীগুলির গড়নের মধ্যেও পার্থক্য আছে অনেক। ধর্মের ও বিশ্বাসের ভেদেও শিল্পে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়। তা'ছাড়া মোগল, রাজপুত, কাঙড়া-উপত্যকা প্রভৃতির শিল্পবিকাশের মধ্যেও অঙ্কনপদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন।

'সৃষ্টিতেই বৈচিত্র্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এঁরা এক ও অদ্বিতীয় হ'লেও তাদের বিকাশে ও বর্ণনায় বৈচিত্র্য আছে। শিল্প ও শিল্প-প্রতিভা তেমনি এক হ'লেও বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন শিল্পীর রুচিতে ও দৃষ্টিভেদে শিল্পে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীশ্রীমার

ছবিকে তাই যাঁরা ওয়েষ্টান´ইজড (Westernised) বলেন, তাঁরা নিজ নিজ রুচির সীমিত গণ্ডীকে লক্ষ্য ক'রে এবং দেশ ও সমাজের ভিন্নতার মাপকাটিকে ধরেই মন্তব্য করেন। ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ যথার্থ ধ্যানী শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই শ্রীশ্রীমার অপরূপ ছবি এঁকেছেন। শিল্পী আসলে স্বভাবসৌন্দর্য্যের সাধক সেকথা বলেছি। তাই পৃথিবীর মাটিতে বাস করলেও ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ অপাথিব রাজ্যের অধিবাসী, ছিলেন। তাই তাঁর নিজস্ব কোন সমাজ, জাতি বা বর্ণ ছিল না, বরং নিরপেক্ষ ও উদার মন নিয়েই তিনি 'সুন্দর'-এর সাধনা করেছিলেন সমগ্র জীবন ধরে। শিল্পে স্বর্গীয় সুষমা সৃষ্টি করাই ছিল ডোরাকের জীবনের সাধনা। রস ও ভাবের পরিবেশকরূপে নির্দ্বন্দ্ব মনে শিল্প সৃষ্টি করেছেন ডোরাক্ নিজেকে ও শিল্পপ্রেমিককে ভাবলোকে লোকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ফ্রাঙ্ক ডোরাকের শিল্পসৃষ্টি তাই রসোত্তীর্ণ ছিল। তাই তিনি শ্রীশ্রীমার এ'ধরনের জীবন্ত কমনীয় ও লাবণ্যময়ী প্রতিকৃতি আঁকতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমার সমগ্র জীবনের আলেখ্য তাই তিনি এঁকেছেন বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের সমন্বয় সাধন ক'রে। অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অনাগত ভবিষ্যতের দিকেও ডোরাক্ তাঁর সৌন্দর্যসেবী মনকে ও দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছিলেন, তাই পরিপূর্ণ হয়েছে তাঁর সংকল্প ও সাধনা। আবার বলা যায় যে, শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ তিন লোককে অতিক্রম ক'রে তুরীয়লোকে শিল্পপ্রেমিককে পৌঁছে দেবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর তৈলচিত্র এঁকেছিলেন'।

'তবে কি জানো ?—সাধারণ মানুষ চায় বাস্তবের পূজা। সে বাইরের জগতে গাছপালা,ঘর-বাড়ীযেমনটি দেখে, তেমনটিই দেখতে চায় তার নকল-করা প্রতিকৃতির ভিতর, এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে মেজাজ যায় বিগড়ে, আর তাই ফটো বা ফটোর হুবহু নকলছবি হয়

তার কাছে সমাদরের বস্তু। ফটো হ'ল কোন-কিছুর কয়েক সেকেণ্ডের একটি রিপ্রোডাকশন (পুনর্প্রতিফলন) বা রিপ্রেজেণ্টেশন (প্রতিচ্ছবি) মাত্র। কাজেই কোন মানুষের ফটোর অর্থ হ'ল সেই মানুষটির হাবভাব, অভিব্যক্তি এক বা কয়েক সেকেণ্ডে যা ছিল—ঠিক তারই প্রতিফলন ও প্রতিচ্ছবি, তার পূর্বেকার বা পরেকার কোন-কিছুর খবর সে দিতে পারে না। তাই শিল্পবিকাশের দিক থেকে ফটো (আলোকচিত্র) একান্তই ইম্পার্‌ফেক্ট (অসম্পূর্ণ)'।

'প্রকৃতপক্ষে এক বা কয়েক সেকেণ্ডে মাত্র মানুষের একটা গোটা বা অখণ্ড জীবনের ইতিহাস কখনো জানা যায় না, এবং আঁকাও সুকঠিন। প্রতিসেকেণ্ডে পার্থিব সকল-কিছুরই যেমন পরিবর্তন হয়, মানুষের দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুও তেমনি প্রতিমুহূর্তে রূপান্তরিত হয়। এখন যে শরীর সাম্‌নে দেখছ, একঘণ্টা পরে দেখবে ঠিক সেই শরীর আর নাই। আজ যে চেহারা যেমনটি দেখছ, কাল তার পরিবর্তন অবশ্যই দেখবে। প্রতি সাত বৎসর অন্তর মানুষের দেহের সকল-কিছুর পরিবর্তন মানুষের চোখে ধরা পড়ে। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের তথা ভাব, ধারণা, ব্যক্তিত্ব এবং স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে তোলা ফটোতে একটি গোটা বা সম্পূর্ণ মানুষ-সম্বন্ধে আর কতটুকু তোমরা জ্ঞান লাভ করবে বলো! তারপর আবার লাইট এ্যাণ্ড শেডের (আলো ও ছায়ার) খেলা। আমিও ফটো তোলাতে একজন এক্সপার্ট (পাকালোক) ছিলাম। ফটো তুলে নিজেই প্রিণ্ট্ ও এন্‌লার্জ (আকারে বড়) করতাম। তাই জানি যে, এক্সপোজারের (প্রতিবিম্ব-গ্রহণক্ষম ফলকাদি আলোকে অনাবৃতকরণের) উপর ফটোর অদৃষ্ট ও সাফল্য নির্ভর করে! কাজেই ফটো অর্থাৎ নকল-ছবি যথার্থ স্বরূপের পরিচয় না দিয়ে বরং ছায়ারই প্রতিকৃতি ও আলেয়া সৃষ্টি করে'।

'ভাবধর্মী বা Idealist শিল্পীরা তাই ঠিক তেমনটিভাবে রিয়ালিষ্টিক ছবি আঁকেন না, তাঁরা আইডিয়ালাইজড্ ফরম্‌কে (ভাবমূর্তিকে) বাইরে পরিস্ফুট করেন। শিল্প দু'রকম : রিয়ালিষ্টিক ও আইডিয়ালিষ্টিক (বাস্তব ও আন্তর অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিক ও ভাব-প্রকাশক) ! তবে অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে কোন-কিছুকে আইডিয়ালাইজ করা যায় না। শিল্পী তাই ভাবুক ও ধ্যানলোকের সাধক। শিল্পও শিল্পীর ধ্যানের পরিণতি। শিল্পী অতীন্দ্রিয় লোকের মানুষ। শিল্পী কোন মানুষের ছবি আঁকেন মানে সে সেই মানুষের সমগ্র জীবনকে ধ্যাননেত্রে প্রথমে নিরীক্ষণ করেন ও পরে তার প্রতিফলন করেন বাইরে। অয়েলপেন্টিংও (তৈলচিত্র) তাই মানুষের আকৃতি ও গঠনের সঙ্গে হুবহু না মিলতে পারে, কিন্তু তার সমষ্টিরূপের ও পূর্ণ-অভিব্যক্তির পরিচয় দান করে'।

'শিল্পের সম্বন্ধে আমার যা ধারণা সেই সম্বন্ধে এবার বলি। শিল্পে ভাব ও রূপ পরস্পরে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কেননা ভাব না থাকলে কোন চিত্রের যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। প্রকৃতির সকল গড়নের বা সৃষ্টির একটা ভাব বা idea আছে। আবার সকল ভাবেরই একটা রূপ বা form আছে। সেজন্যই idea and form-এর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক। শিল্পীও কোন-কিছুর রূপ দান করেন বহির্জগতে তাঁর অন্তরের ভাবকে অপেক্ষা ক'রে। ভাবই হ'ল নিজস্ব ও অন্তরের, আর রূপ ভাবের অনুযায়ী বাইরের প্রকৃতি। তাই ভাবের উপাসক idealist, আর রূপের উপাসক realist ; কিন্তু শিল্পের সার্থকসৃষ্টিতে idealism ও realism—দুটোর মিলন না হ'লে সার্থকতার রূপ ও আনন্দ সৃষ্টি হয় না। আঙ্গিক বা technique-কের মধ্যেও ভাব বা idea-র প্রেরণা ও প্রলেপ থাকে—যাতে ক'রে আঙ্গিকের প্রাণোচ্ছলতা ও জীবনরস মূর্ত হয়ে ওঠে প্রতিফলনের মধ্যেও'।

তারপর স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'আসল কথা কি জানো—শিল্পী কোন ছবি আঁকেন তার ভাব ও রূপকে নিজের উপর আরোপ ক'রে প্রথমে, তারপর সেই ভাব ও রূপের সঙ্গে নিজে এক ও অভিন্ন হয়ে যান তন্ময়তাকে নিয়ে, আর তবেই ছবি-আঁকা হয় তাঁর সার্থকতায় পরিপূর্ণ'।

'তারপর রস নিয়ে কথা। রসের পরিচয় অলঙ্কারশাস্ত্রে আছে। মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে আটটি রসের পরিচয় দিয়েছেন। পরে নয় রস ও তারপর দশ রসের কল্পনা করা হয়েছে। বৈষ্ণবরা বাৎসল্যরসকে দশম রস বলেছেন। শৃঙ্গাররসের কথা বলেছেন ভরত নাট্যশাস্ত্রে। পরেকার রসশাস্ত্রীরা ও আলঙ্কারিকরা নবম রস-রূপে শম বা শান্তরসের কথা বলেছেন'।

'শিল্পক্ষেত্রে শিল্পীদের রস নিয়েই কারবার। শৃঙ্গারকে আদিরস বলেছেন ভরত। আদিরসে সৃষ্টি হয়। আবার আদিরস নির্বেদ ও বৈরাগ্য সৃষ্টি করে। রসস্বরূপ ঈশ্বর আদিরস-শৃঙ্গারের সাহায্যে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর আদিকবি, কেননা সমগ্র বিশ্ব তাঁর সার্থক রচনা বা সৃষ্টি। আদিকবি ঈশ্বর যেমন বিশ্বের ভাল ও মন্দ সকল-কিছুই গ্রহণ করেন, তেমনি শিল্পক্ষেত্রে করেন শিল্পীরা। শিল্পীরা সৌন্দর্যের পূজারী, কিন্তু শিল্পীদের সৌন্দর্যদৃষ্টি আলোক ও অন্ধকার—এ'দু'য়ের উপরই সমান ও সমাদর। শিল্পী কোনদিন তাই বাদসাদ দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেন না। ভাল ও মন্দ বাছাবাছি ক'রে শিল্প সৃষ্টি করলে সৌন্দর্য্যের জগৎ অচল ও পঙ্গু হয়ে যায়। Art-এ তাই কোন-কিছুর ban (বাদ) নাই। পাশ্চাত্যের সৌন্দর্য্যসেবীদের অভিমতও তাই। Aesthetic-এর রাজ্যে আলো-ছায়ার একই মূল্য। শিল্পীর দরবারে তাই উচু-নীচু ব'লে কোন-কিছু নাই। শিল্পী স্রষ্টা, তাই তাঁর কাছে সৃষ্টির জগতে রস ও সৌন্দর্যেরই মান বেশী। শিল্পী সার্থক ভাবদৃষ্টি নিয়ে যে বস্তুই আঁকুন না কেন, শিল্পের মধ্যেই তা গণ্য

হবে, সুতরাং তা অমর হয়ে থাকবে শিল্পীর দরবারে। সাধারণ মানুষ চিরদিনই শিল্পের তত্ত্ব থেকে দূরে থাকে, কেননা শিল্পতত্ত্বের অন্তরে তারা প্রবেশ করতে পারে না। তারা সর্বদাই থাকে বাইরে, আর বাইরে থাকে ব'লে শিল্পের ভাবের ও রসের সন্ধানও তারা ঠিকমতো দিতে পারে না। সেজন্য শিল্পক্ষেত্রে তারা অপাঙক্তেয়। তাই শিল্প ও শিল্পতত্ত্ব বোঝার জন্য শিক্ষা ও প্রস্তুতি চাই, নইলে তত্ত্বসৌন্দর্য্য তাদের কাছে অজ্ঞাত হয়েই থাকে চিরদিন'।

স্বামীজী মহারাজ তারপর বল্লেন: 'আর্ট বা শিল্প উন্মোচন করে প্রকৃতির অন্তরে নিহিত সুপ্ত সৌন্দর্য্যতত্ত্বকে। 'সুন্দর'-এর প্রকৃত অর্থ Aesthetic নয়, 'সত্যং শিবং সুন্দরং'-রূপ ঈশ্বরের অফুরন্ত স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যের মহিমার জন্যই শিল্প। শিল্পে তাই অনুশীলিত হয় প্রকৃতির অব্যক্ত এবং ঈশ্বরের অপার্থিব তত্ত্ব ও রহস্য —যা সাধারণ মানুষের কাছে চিরদিন অজ্ঞাত ও আবৃত থাকে। শিল্পের আবরণকে উন্মোচিত ক'রে শিল্পী সন্ধান দেন আন্তর-সত্যকে। রহস্যময় তত্ত্বকে জিজ্ঞাসু মানুষের কাছে জানিয়ে দেয় তাই শিল্প। অন্তত ভারতীয় শিল্পের তত্ত্বকথা ও মর্মকথাই তাই। চিত্রশিল্পী তুলির সাহায্যে কালিতে ও রঙে অব্যক্ত সুন্দরের রূপ ও মাধুর্য্যকে তাই ব্যক্ত বা প্রকাশ করে, আর অব্যক্তকে ব্যক্ত বা প্রকাশ করে বলেই শিল্পী। শিল্পী সেজন্য প্রকৃতি ও সুন্দরের উপাসক'।

আমরা স্বামীজী মহারাজের কথার পর আনন্দকুমার স্বামী, ই. বি. হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকদের কথা উত্থাপন ক'রে বল্লাম—

১ম—৩য় শতকে কেন—প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব ১ম থেকে ৬ষ্ঠ-৭ম শতক পর্যন্ত 'অজন্তা'-প্রস্তরগুহাচিত্রের প্রতিফলন বিশ্বে এক বিস্ময়ের বিষয়। অজন্তার গুহাপ্রাচীরচিত্রে অবলোকিতেশ্বরের জন্মবিবরণ (জাতকের বিভিন্ন চিত্র) অঙ্কিত

আছে এবং ভারতীয় শিল্পসৌন্দর্য্যের জগতে এটি এক অত্যাশ্চর্য অবদান ও সম্পদ। অজন্তার পরেই বাগগুহার চিত্র (ফ্রেস্কো) উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন গুহায় অঙ্কিত বিচিত্র রঙে অঙ্কিত চিত্রসুষমা ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মহিমাই প্রচার করে'।

ভারতবর্ষে আনন্দকুমার স্বামী, ই. বি. হ্যাভেল প্রভৃতি ছাড়া বহু পাশ্চাত্যশিল্পসেবীরাও ভারতীয় শিল্পসম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। পরবর্তী যুগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রভৃতি চিত্রশিল্পীদের অবদান ভারতীয় শিল্পভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। মাননীয় ই. বি হ্যাভেল তাঁর A Handbook of Indian Art-গ্রন্থে ভারতের শিল্পকলার বহু তথ্যই পরিবেশন করেছেন। হ্যাভেল Sculpture & Painting, Ideal of Indian Art প্রভৃতি গ্রন্থে ভারতীয় শিল্পরহস্যের মর্ম উদ্ঘাটন করেছেন।

হ্যাভেল, কুমার স্বামী প্রকৃতি বিদগ্ধ শিল্পসমালোচকদের কথা শুনে স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'হ্যা, আমি আগ্রহের সঙ্গে হ্যাভেল, কুমার-স্বামী, ফারগুস্ন, বার্জেস প্রভৃতি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পী-মনীষীদের শিল্পের কিছু কিছু গ্রন্থ পড়েছি ও মুগ্ধ হয়েছি শিল্পসৌন্দর্যপূর্ণ প্রাচীন ভারতের শিল্পরুচি ও শিল্পদৃষ্টির কথা জেনে। সত্যই বলেছ যে, অজন্তা, বাগ, অমরবতী প্রভৃতির প্রস্তরগুহার শিল্প-ভাস্কর্যের সুষমা ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করেছে। সমগ্র বিশ্বে অজন্তা প্রভৃতি গুহামন্দিরে চিত্রিত অবলোকিতেশ্বরের বিভিন্ন জন্মের বা জীবনের 'জাতক'-চিত্র বিশ্বে এক বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে'।

তারপর স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'একথা সত্য যে, একটি মানুষের জীবন হ'ল a sum-total of events that build up a history of his whole life (ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সমষ্টি—যা সমগ্র জীবনের ইতিহাস গঠন করে)। মোটকথা জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাপারম্পর্যকে সাজালে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয় তাই

হ'ল বাইরের দিক থেকে অন্ততঃ গোটা একটি মানুষের জীবন। শিল্পী যখন ছবি আঁকেন, তখন মানুষের ঐ সমগ্র জীবনের ইতিহাসটাই তিনি রঙ ও তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন; তাতে সেই মানুষটির সঙ্গে তার ছবি হুবহু মিললো কি-না তা তিনি খতিয়ে দেখেন না। এমন কি শিল্পী মানসচক্ষে ভিস্যুয়ালাইজ (প্রত্যক্ষ) করেন অনন্ত অনাগত জীবন, সেজন্যই শিল্পজগতে তিনি যথার্থ শিল্পীর সম্মান লাভ করেন। র‍্যাফেল ম্যাডোনার কি অদ্ভুত ছবিই না এঁকে গেছেন! ম্যাডোনাকে অর্থাৎ ম্যাডোনার সমগ্র জীবন-ইতিহাসকে রাফেল ভাবচক্ষে নিরীক্ষণ করেছিলেন। ঐ একটি ছবির জন্য রাফেল চিরদিন অমর হ'য়ে থাকবেন পৃথিবীতে'।

'ফ্রাঙ্ক ডোরাকও তাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর তৈলচিত্রই তাঁকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে জগতে। শ্রীশ্রীমার ছবিকে (তৈলচিত্রকে) তিনি আইডিয়ালাইজড (ভাবসমৃদ্ধ ও জীবন্ত) করেছেন। শ্রীশ্রীমার সমগ্র জীবন ও মহিমা ভাবচক্ষে দর্শন ক'রে তিনি তাঁর অয়েলপেন্টিঙটি (তৈলচিত্রটি) এঁকেছিলেন। শ্রীশ্রীমার ছবিখানিকে এ্যাপ্রিসিয়েট করতে (বুঝতে) গেলে তাই শিল্পী ডোরাকের অন্তরের ধ্যানঘন আপার্থিব ভাবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। সাধারণ লোক হাত, পা, মুখ, চোখ, গায়ের রঙ মিললো কি-না এই সব নিয়েই ছবির বা শিল্পের বিচার করে, কিন্তু শিল্পসৌন্দর্যের জগতে ঐসব বিচারের মূল্য নিতান্তই নগণ্য'।

'শ্রীশ্রীমার ছবিতে মানুষীভাবের পরিবর্তে দেবীভাব সুপরিস্ফুট। পূর্বেই বলেছি যে, শ্রীমা নবযৌবনসম্পন্না, জগদ্ধাত্রীরূপিণী ও পবিত্রতার জীবন্ত মূর্তি। তাই তাঁর ছবি আঁকতে গেলে শিল্পীকে অপার্থিব রাজ্যের অধিবাসী হ'তে হবে'।

বন্ধু ভদ্রলোকটি এতক্ষণ বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে শুনছিলেন মহারাজের কথা! স্বামীজী মহারাজের প্রসঙ্গ শেষ হ'লে তাঁর যেন চমক

ভাঙলো। তিনি জিজ্ঞাসু-মন নিয়ে স্বামীজী মহারাজকে বল্লেন: 'স্বামীজী, এখন বলুন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিন রকম পশ্চারের (অবস্থার) ছবি কি কি'।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'তখন সবেমাত্র প্রথম কোডাক-ক্যামেরা মার্কেটে (বাজারে) বেরিয়েছে। বরানগরের অবিনাশ একটি নূতন ক্যামেরা কিনেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) নিজের ছবি কাকেও কোনদিন তুলতে দিতেন না। ভবনাথ[১১] অবিনাশকে ডেকে এনেছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি তোলার জন্য দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে 'বাইরের রকের ওপর বসে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়লেন। সেই সুযোগে অবিনাশ তাড়াতাড়ি ক্যামেরা ফিট ক'রে নিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের যে-ধ্যানস্থ-বসা ছবি এখন পূজো করা হয়—ওটা ঐ সময়েরই তোলা। কিন্তু ঘটনাটা হ'ল এই যে, পাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি ভেঙে গেলে তিনি জানতে পারেন তাঁর ছবি তোলা হচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ক্যামেরা থেকে বার করার সময়ে প্লেটখানা (নেগেটিভ কাচখানি) হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। সৌভাগ্যের বিষয় ভেঙেছিল ঠিক উপরের (মাথার) দিকে। কাজেই প্লেটের উপরের দিকটা পরে অর্ধ-গোলাকার ক'রে কেটে নিয়ে তা' থেকে আর একটি নেগেটিভ করা হয়। তাই প্রিন্ট্-করা ছবিতে দেখবে যে, ছবির মাথার দিকে অর্ধচন্দ্রাকার একটা কালো দাগ আছে। সেটা অর্ধেক গোল ক'রে কাটা নেগেটিভের দাগ'।

'শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ ছবি কিন্তু ঠিক পারফেক্ট (নিখুঁত) হয়নি। তাড়াতাড়ি করার জন্য ছবিতে লাইট এ্যাণ্ড শেডের (আলোছায়ার)

১১। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থশিষ্য ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' ভবনাথ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

যথেষ্ট গোলমাল হয়েছিল। ওতে ঠোট-দু'টো বেশ পুরু হ'য়ে গেছে। মনে হয় যেন একটি দাঁতও নেই। কিন্তু আমরা দেখেছি তাঁর ঠোট মোটেই পুরু, কিংবা দাঁতও ভাঙা ছিল না। তাই আমেরিকা থেকে ফিরে এসে কলকাতায় একজন আর্টিষ্টকে নিজে ইনস্ট্রাকশন (নির্দেশ) দিয়ে রিটাচ্ (আর একবার তুলি লাগিয়ে সংশোধন) করিয়ে নিয়েছি। অরিজিন্যাল ফটো (আসল ছবি) আমার নোটবইয়ের ভিতর[১২] ছিল, তা' থেকেই সংশোধন করেছি! এর কপি আমাদের মঠে (কলিকাতা, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে) পাওয়া যায়'।[১৩]

'শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বিতীয় ছবি তোলা হয় রাধাবাজারে (কলিকাতা) একটি ফটোগ্রাফারের দোকানে। আমি ও লাটু মহারাজ তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সুরেশ মিত্র মহাশয় অনেক অনুরোধ ক'রে সেবার ফটো তোলার জন্য তাঁকে (শ্রীশ্রীঠাকুরকে) সম্মত করিয়েছিলেন।

১২। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই অরিজিন্যাল ফটো (আসল ছবি) আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছে দেখেছি। অনেক দিনের পুরাতন বলে ঐ ফটোগ্রাফটা একটু অস্পষ্ট (fade) হ'য়ে গিছলো।

১৩। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরী করা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ছবি-সম্বন্ধে অনেকে মন্তব্য ক'রে বলেন 'ঠাকুরের এই ফটো ঠিক হয় নি'। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবিতকালেই এ'ধরনের মন্তব্য আমরা শুনেছি ও তাঁকে জানালে তিনি বলেছিলেন : "লোকে স্বাধীনভাবে অনেক মন্তব্যই করতে পারে, কিন্তু তাদেরকে কিছু বলার আমার অধিকার নেই। স্বচক্ষে যাঁকে দিনরাত দেখেছি, যাঁর সেবা করার সৌভাগ্য হ'য়েছে, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের কিছু-না-কিছু মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কোন ঠোটই তাঁর বিন্দুমাত্র পুরু ছিল না, বা একটি দাঁতও ভাঙা ছিল না শ্রীশ্রীঠাকুরের ঠোটদু'টি ছিল সুন্দর ও পাতলা। অবিনাশের ফটোগ্রাফীর কাজ খুব ভাল জানা ছিল না, তাই লাইট এ্যাণ্ড সেডের গোলমাল হয়েছিল ছবিটিতে। আমি নিজের চোখে যে'রকম দেখেছি, সেইরকম তৈরী করিয়ে নিয়েছি, এতে অপরাধ কি বলো? আমার কথায় বিশ্বাস হয় মেনে নেবে, নইলে নেবে না, যে ছবি ভালো লাগে তাকেই পূজো করবে, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। তবে যতদূর সম্ভব ছবি ঠিক ঠিক হয়, ততই ভাল"।

ঠাকুরের সঙ্গে আমরা দু'জনে ঘোড়ার গাড়ী ক'রে রাধাবাজারে যাই। ঠাকুরের পাশে যে থামটা দেখতে পাও, ওটা আর্টিফিসিয়াল (নকল)। তিনি বার্ণিশ-করা চটিজুতো পায়ে দিয়ে কোঁচা খুলে কাপড়ের খুঁটটি কাঁধের উপর দিয়েছিলেন। গায়ে ছিল একটা কাল-রঙের হাফকোট। থামের উপর হাত দিয়ে দাঁড়াতেই তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন'।

'অপর ছবিটি এর পরেই কেশববাবুর (নববিধান-ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা কেবশচন্দ্র সেনের বাড়ীতে(কমল-কুটিরে) তোলা হয়। কোমরে কাপড় বাঁধা, এক হাত উপরে, আর এক হাত বুকের কাছে।[১৪] এই তিন রকম পশ্চার (ভঙ্গিমার) ছাড়া আর কোন ধরনের ছবি ঠাকুরের নেই''।

আমাদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'ফ্রাঙ্ক-ডোরাক্ নাকি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি ধ্যানমূর্তির ছবিও এঁকেছিলেন?'

স্বামীজী মহারাজ: 'হ্যাঁ, এঁকেছিলেন। তাঁর আঁকা শ্রীশ্রীঠাকুরের ওই ধ্যানমূর্তির ছবি আমাদের কলকাতার মঠে আছে। সেটা এ্যানাটমিক্যালি ডিভালাপ (শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণ বিকাশ) ক'রে দেখানো। ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীরের সকল

১৪। অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণের হাত দু'টির ভঙ্গিমার নানান রকমের ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। তাঁরা বলেন—ওটি এক ধরনের মুদ্রা। যে হাতটি ওপরের দিকে আছে, তাতে ইঙ্গিত করেছেন—ব্রহ্মই সত্য, আর বুকের উপর হাতটিতে ইঙ্গিত করেছেন—এই জগৎটা কিছুই নয়, মিথ্যা। আমরা স্বামীজী মহারাজ কেন, কোন শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানের মুখে বা তাঁদের লেখায় এই ব্যাখ্যান কখনো শুনিনি। মনে হয়, হাতের ঐ ভঙ্গিমা বা মুদ্রার ব্যাখ্যা একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবই জানতেন, কাজেই ওই ব্যাপারে আমাদের নিজেদের সকল ব্যাখ্যা ত্যাগ করাই ভাল। তাছাড়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলতেন যে, অনন্তভাবময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধির সময়ে মুখে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ পেতো এবং তাদের অর্থ এক শ্রীশ্রীঠাকুরই জানতেন মনে হয়'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিল্পী : ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ চিত্রে পূর্ণবিকশিত ক'রে দেখিয়েছেন। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি পূর্ণবিকশিত হয় তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি কেমন হয়—এটা দেখানোই ছিল ঐ ছবিটির উদ্দেশ্য'। এই ছবির প্রতিকৃতিও ডোরাকের স্টুডিওতে ছিল। সেই স্টুডিওর ছবিও এখানে দেওয়া হ'ল।

সে'দিন স্বামীজী মহারাজের সন্ধ্যায় চা-পানের একটু বিলম্ব হয়েছিল। তখন ঘড়িতে বেজেছে প্রায় ন'টা। পুরো-একঘণ্টা কথাবার্তার ভিতর দিয়ে কিভাবে আমাদের সময় কাটলো তা আমরা জানি না। স্বামীজী মহারাজের সেবক আর একবার দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে ইঙ্গিত জানালেন চা-পানের আয়োজন সব প্রস্তুত। স্বামীজী মহারাজও শুনে শশব্যস্তে বল্লেন : 'হ্যাঁ, যাচ্ছি'। তিনি আলোয়ানটি ধীরে ধীরে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ও ভিতরে যাবার সময়ে বল্লেন : 'তোমরা বসো, আমি এখুনি আবার আসছি'। আমরা তাঁর পুনরায় আসার প্রতীক্ষায় তাই সেখানে বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

॥ স্মৃতি : বারো ॥

স্বামীজী মহারাজ তাঁর বিশ্রাম-ঘরে চলে যাওয়ার পর আমাদের সকলের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ ছবির প্রসঙ্গই চলতে লাগলো কিছুক্ষণ ধরে। বন্ধু ভদ্রলোকটি বল্লেন: 'অয়েল-পেন্টিঙ ও ফটোগ্রাফী-সম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজের জ্ঞান অদ্ভুত ও অপরিসীম। প্রতিভার বিকাশ ও প্রদীপ্তি মানুষের সঙ্গে কথা কইলেই বোঝা যায়'। এরই মধ্যে স্বামীজী মহারাজ এসে হাজির হলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'মহারাজ এত তাড়াতাড়ি এলেন যে?' মহারাজ হেসে বল্লেন: 'ভাবলাম ব্রজের গোপীরা ব্যাকুল হ'য়ে শ্যামচাঁদের জন্যে বসে আছে, সুতরাং দর্শনটা শীঘ্র দেওয়াই ভাল। তা'ছাড়া আমারও তো একটা common sense (সাধারণ জ্ঞান) আছে'! স্বামীজী মহারাজের কথা শুনে আমাদের মধ্যে বিরাট হাসির একটা রোল উঠলো। এরই মধ্যে মহারাজের মধ্যে ভাবের একটু বেশ পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি হঠাৎ গম্ভীরভাবে বল্লেন: 'এই common sense-ই (সাধারণ জাগতিক জ্ঞানই) শেষে Divine Sense-এ (পারমাথিক জ্ঞানে) পরিণত হয়। আবার যে' লোককে তোমরা অতিসাধারণ লোক ব'লে মনে করো, পরে সেই লোকই হয়তো অসাধারণ একজন দিব্যমানুষে পরিণত হয়'—a common man becomes a God-man'.

আমরা বল্লাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ'। স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'হাঁ তো, কিন্তু সত্যকারভাবে বুঝলে কতটুকু? এই জাগতিক' ঘটি-বাটির জ্ঞানই শেষে ব্রহ্মজ্ঞানে রূপায়িত হয়। যে জ্ঞান দিয়ে ঘটি-বাটি জানছো, আবার সেই জ্ঞান দিয়েই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতির আলোকে ব্রহ্মকে জানছো। জ্ঞান কি আর দু'টো? এক পার্থিব জ্ঞানই জগতে পারমাথিক জ্ঞানের আকারে প্রকাশ পায়। এটা ঠিক যে, কোন

বস্তুকে জানতে গেলে বৃত্তিজ্ঞানের প্রয়োজন। বৃত্তিজ্ঞান মানসিক-জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রেও জানবে প্রত্যক্ষানুভূতির জন্য বুদ্ধি বা বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বিচার একমাত্র উপায়। জ্ঞান দু'টো নয়। একই জ্ঞান কখনো বুদ্ধিবৃত্তি, আবার কখনো বুদ্ধিভাস্য ব্রহ্মজ্ঞান। বুদ্ধিবৃত্তির মধ্য থেকে বৃত্তিরূপ অজ্ঞান চলে গেলে বুদ্ধি আর থাকে না। তখন শুদ্ধজ্ঞান। মনের বৃত্তিই আসলে বৃত্তিজ্ঞান থেকে শুদ্ধজ্ঞানকে পৃথক করে। বৃত্তি অজ্ঞানের পরিণাম বা কার্য। তাই ব্রহ্মকে ব্রহ্মবৃত্তিজ্ঞান বলা যায় না। বৃত্তি কার্য বা চিন্তার ফল, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কোন কর্মের ফল নয়। সকল কর্মের নাশ হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান। তবে একজ্ঞানই সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। একজ্ঞান বলতে আধার বা অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান সে দিক থেকে অধিষ্ঠান (আধার) আবার অধিষ্ঠানও নয়. যে ব্যবহারিক জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে খাচ্ছ, চলছ, ফিরছ, কথা কইছ ও জগতের সবকিছু কাজ করছ, প্রকৃতপক্ষে সেটাই ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপে। তাই বিকারে বা বিরূপে জাগতিক জ্ঞান, আর অবিকারে বা স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞান। একই সমুদ্রের উপর নানান রকমের তরঙ্গ উঠছে, আসলে তারা সমুদ্রের জলেরই তরঙ্গ। তরঙ্গ জল থেকে ভিন্ন নয়। জলেরই তরঙ্গই জল। এই ভাবটি ঠিক ঠিক realize (অনুভব) করা তরঙ্গ, আবার দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একথাই বারবার বলেছেন'।

সকলে আমরা চুপ ক'রে বসে শুনছি। Common sense (সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান) যে Divine Sense (পারমার্থিক ব্রহ্মজ্ঞান)—এ'কথার মর্মটা আমরা ঠিক ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম না। পারাও সহজ নয়। স্বামীজী মহারাজ আমাদের মুখের ভাব দেখে তা বুঝেছিলেন, তাই তিনি আবার বল্লেন : 'কেবল কথা শুনে কিংবা বই পড়ে অধ্যাত্মতত্ত্ব অনুভব করা যায় না। জীবনে হাতেনাতে (practical) সাধনা চাই। 'সাধনা' অর্থে কৃচ্ছসাধন বা

গতানুগতিক আচার-অনুষ্ঠান নয়। যা দিয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান জাগ্রত হয়, তাকেই সাধনা বলে। ধর্মসাধনা বা আধ্যাত্মিক সাধনাও কর্ম, তবে এ' কর্ম দিয়ে কর্মের পারে যাওয়া যায়। বিচারবুদ্ধিও মনোবৃত্তি, তবে এই মনোবৃত্তির সাহায্যেই যথার্থ-জীবনতত্ত্ব নির্ধারিত হয়। ব্রহ্মই সত্য, আর সব-কিছু অসত্য—এই যথার্থ সত্যনির্ধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়েই হয়। সদানন্দ যতির 'বেদন্তসার'-গ্রন্থে এর বিচার আছে। বেদান্তসারে সদানন্দ-যতি এই বিচার সম্বন্ধে বলেছেন: "... নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাব....ব্রহ্মাস্মীতি ইতি অখণ্ডাকারকারিতা চিত্তবৃত্তিরুদেতি। সা তু চিৎবিম্বসহিতা সতী প্রত্যগভিন্নমজ্ঞাতং পরং ব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য তদগতাজ্ঞানমেব বাধতে।.. ব্রহ্মণ্য জ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতেতি। স্বয়ংপ্রকাশ নামন্বান্নাভাস-উপযুজ্যতে"। মন ও বুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মভাবনায় যে বৃত্তি সৃষ্টি হয়, সেই বৃত্তিরও নাশ হয়—যাকে একমাত্র অখণ্ডাকার ব্রহ্মচৈতন্য বলে। কেননা পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, তা আর কোন-কিছুর দ্বারা প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না'।

পরে আমাদের মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন: 'কি বলো, ছবি-আঁকাও যা, আর গান গাওয়াও তা। একটিতে রঙ দিয়ে মনের ভাবকে ফুটিয়ে তোলা হয় তুলির সাহায্যে, আর অপরটাতে সুর দিয়ে প্রকাশ করতে হয় ভগবানকে। দু'টো একই জিনিস—যদিও পদ্ধতি ও কর্ম বা প্রচেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন। দুটি বিদ্যার সাধক বা artist (শিল্পী) দু'জনেই'।

আমরা বল্লাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ'। বন্ধু ভদ্রলোকটি একটু উৎসাহিত হ'য়ে বল্লেন: 'আজ্ঞে, আপনি সঙ্গীত-সম্বন্ধেও তাহ'লে কিছু জানেন নিশ্চয়ই'। স্বামীজী মহারাজ হেসে বল্লেন: 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কি আর করি বলুন। মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, ওদেশে (পাশ্চাত্যদেশে) কাটিয়েছি অনেক দিন ধ'রে। অন্তরে জানার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট, সুযোগও পেয়েছিলাম অনেক, কাজেই বিচিত্র বিষয়ের কিছু-কিছু জ্ঞান বা

অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছি। অর্থাৎ something of every thing and every thing of something। শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বলেছিলেন : 'কালে তুই সব জান্‌বি। তাই তাঁরই কৃপায় যতটুকু জেনেছি আর কি! তিনি কৃপাময় আমাদের সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন'। তারপর বল্লেন : 'একস্মিন্‌ বিজ্ঞাতে, সর্ববিজ্ঞাতং ভবতি'।

তারপর সংগীতের প্রসঙ্গ চলতে লাগলো। কারু কোন বিষয় জানার বা শোনার আগ্রহ দেখলে স্বামীজী মহারাজ আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠতেন। একটির পর আর-একটি ঘটনা বা আলোচনা তিনি ছবি-আঁকার মতো ব'লে যেতেন, স্পষ্টই মনে হ'ত যেন চোখের সামনে সব-কিছু ঘট্‌ছে। কখনো গম্ভীর, কখনো সরস ও মধুর, কখনো বা হাস্যপূর্ণ রসিকতা, তবে সব-কিছুর মধ্যেই তাঁকে দেখা যেত আনন্দময় পুরুষ এবং সরল ও শিশু-ভোলানাথ!

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'কী আনন্দের দিনই না একদিন গেছে সঙ্গীতের আলোচনা ও অনুশীলন নিয়ে! স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) গাইতেন গুরুগম্ভীর সুরে ধ্রুপদগান, আর আমি তাঁর সঙ্গে কখনো কখনো পাখোয়াজ সঙ্গত করতাম। পাখোয়াজ বাজনা শিখেছিলাম তদানীন্তন সময়ে কলকাতার বিখ্যাত গোপাল মল্লিকের কাছে। প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী গোপাল মল্লিক মহাশয়ও স্বামীজীর (বিবেকানন্দের) সঙ্গে অনেক সময়ে বাজিয়েছেন শুনেছি। গোপাল বাবুর ছাত্রই তো প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী মুরারী বাবু। স্বামীজীর (বিবেকানন্দের) কণ্ঠস্বর ছিল বেশ মধুর, গম্ভীর ও উদাত্ত। আমি তাঁর কাছ থেকে কয়েকখানা ধ্রুপদগান শিক্ষা করেছিলাম। স্বামীজীর রচিত গান 'এক, রূপ অরূপ, নাম বরণ....' প্রভৃতি গান তাঁর কাছে শুনে শুনে গাইতেও পারতাম। স্বামীজী তদানীন্তন কালে প্রসিদ্ধ উস্তাদ বেণী অধিকারী, আহম্মদ খাঁ প্রভৃতির কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। Copy (নকল) করার শক্তি ছিল

আমারও অসাধারণ। সঙ্গীতশিক্ষার ক্ষেত্রে তাই আমি, শরৎ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি ছিলাম স্বামীজীর অনুচর। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারাদনন্দ) মিষ্টি সুরে গান করতে পারতেন। তবে তাঁর গলার volume (ওজন) ছিল একটু কম বা মিহি, কিন্তু ভারি মিষ্টি'।

আমাদেব মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলো তখন: 'মহাবাজ, সঙ্গীত-হিসাবে কোন দেশের সঙ্গীত ভাল ও scientific (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্পন্ন) ?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'ভাল ও scientific (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতিসম্পন্ন সকল দেশেরই সঙ্গীত। সকল দেশের সঙ্গীতেরই একটা ঐতিহ্য বা tradition আছে। Classical ও folk—ড়' রকম সঙ্গীত সকল দেশেই আছে। তবে প্রাচীনতার কথা নিয়ে সবাব মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে harmony-ই (স্বরসঙ্গতি) প্রধান, আর ভারতীয় সঙ্গীতে melody (রাগ) প্রধান। তবে harmony (স্বরসঙ্গতি) বা melody (রাগ) নিয়ে সঙ্গীত বড—কি ছোট তা' বিচার করা ঠিক হবে না। ক্রমবিকাশের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনতা এখন স্বীকৃত ও more scientific (আরও বিজ্ঞানসম্মত)। এই সে'দিনই তো একটি ইংরেজী পত্রিকায় দেখলাম যে, ফিলাডেল্‌ফিয়া সিম্‌ফনি-অর্কেষ্ট্রার (Philadelphia Symphony Orchestra) Conductor (পরিচালক) মিঃ লিওপোল্ড ষ্টোকোওয়াস্কি (Mr. Leopold Stokowski) পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেছেন যে, ভারতীয় সঙ্গীতে সুরছন্দের (musical rhythm) প্রকাশ এতই উন্নত যে তার সঙ্গে তুলনা করলে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরছন্দকে নিম্নস্তরের বলে মনে হয়।[১] তিনি আরও বলেছেন যে,

১। 'I find there are rhythms in India so highly developed that they make Western musical rhythms sound childish in comparison'.

ভারতে harmony-র(স্বরসঙ্গতির) প্রচলন এখনও বিশেষভাবে হয়নি বটে, কিন্তু তবুও আমি স্বীকার করি যে, সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্যে সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গীতবিষয়ে ভারতের কাছ থেকে এখনও অনেক-কিছু শেখার জিনিস আছে'।[২]

ক্রমে কথা উঠলো সঙ্গীতের উৎপত্তি বা সৃষ্টি-সম্বন্ধ নিয়ে। স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'অনেকের অভিমত যে, Greecian ও Indian music (গ্রীসীয় ও ভারতীয় সঙ্গীত) এই উভয় সঙ্গীতধারার মধ্যে অনেকটা মিল আছে, সেজন্য অনেকে বলেন ভারতীয় সঙ্গীত গ্রীকদের কাছ থেকে অনেক-কিছু ধার করেছে। কিন্তু এ'কথা মোটেই সত্য নয়। তোমরা আমার 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল' (ভারত ও তাহার সংস্কৃতি)-গ্রন্থ অবশ্যই পড়েছ। তাতে আমি স্পষ্টই দেখিয়েছি যে, শুধু সঙ্গীত কেন—দর্শন, ইতিহাস, ন্যায়, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ও ভারতের সাংস্কৃতিক সকল উপাদানই বিদেশ থেকে আমদানী করা নয়, ভারতেরই নিজস্ব জিনিস'।

আমাদের বন্ধু ভদ্রলোকটি 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল' বইখানির নাম এর পূর্বে শোনেন নি। স্বামীজী মহারাজ বইখানির নাম করতে তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে বইটি দেখতে চাইলেন। স্বামীজী মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে গ্রন্থটি আনতে বল্লেন। সে'টি আনা হ'লে ভদ্রলোককে বইটি দেখিয়ে মহারাজ বল্লেন : 'বইখানি এখানে (বেদান্ত মঠ) থেকে পরে কিনে নেবেন। একটা জায়গা থেকে পড়ছি শুনুন'। তিনি বইখানির পাতা খুলে পড়তে লাগলেন :

'The dawn of Aryan civilization broke for the first time on the horizon, not of Greece or Rome, not of Arabia or Persia, but of India which may

২। 'India has not yet begun to have harmony in music. * * Yet I find that in common all Western musicians, have much to learn in this matter from India.'

be called the motherland of Metaphysics, Philosophy, Logic, Astronomy, Science, Art, Music, and Medicine as well as of truly ethical science and religion.

'The Hindus first developed the science of music from the chanting of the Vedic hymns. The Sama-Veda was especially meant for music. And the scale with seven notes and three octaves was known in India centuries before the Greeks had it. Probably the Greeks learnt it from the Hindus. It will be interesting to you to know that Wagner was indebted to the Hindu science of music, especially for his principal idea of the 'leading motive,' and this is perhaps the reason why it is difficult for many Western people to understand Wagner's music. He became familiar with Eastern music through Latin translations, and his conversation on this subject with Schopenhauer is probably already familiar to you.'[৩]

৩। 'আর্য-সভ্যতার অরুণালোক ভারতের দিক্‌চক্রবালে উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রথমে, গ্রীসে রোমে আরবে বা পারস্তে নয়। ভারতবর্ষই সকল-কিছু অধ্যাত্মশাস্ত্র, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, সঙ্গীত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সত্যিকারের নৈতিক ধর্মের আদিভূমি।

'হিন্দুরাই প্রথমে বৈদিক ঋক্‌ছন্দ থেকে সঙ্গীতকলার বিকাশ সাধন করেছিলেন। বিশেষ ক'রে সামবেদ গানের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। গ্রীকদের বহুশত বৎসর পূর্বে সপ্তস্বর ও তিন গ্রামের প্রচলন ভারতবাসীরা জানতেন। সম্ভবতঃ গ্রীকরাই ভারতবর্ষের কাছ থেকে ঐ সমস্ত জিনিষ শিক্ষা করেছিলেন। তোমাদের একথা জেনে কৌতূহল হবে যে, পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্

স্বামীজী মহারাজ তারপর বল্লেন : 'পীথাগোরাস যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন—এ'কথা আমার মতো বেশীর ভাগ ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। পীথাগোরাস হিন্দুদের কাছ থেকে জ্যামিতি ও অঙ্কশাস্ত্র, জন্মান্তর ও পরলোকবাদ, নিরামিষ-আহার, পঞ্চভূতের তত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা করেছিলেন এবং গ্রীসে ফিরে গিয়ে সেখানকার লোকদের ভিতর (সমাজে) সে'গুলি প্রচার করেছিলেন। ইহুদীদের এসেনী (Essenes)-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সব ভাবধারার প্রচলন ছিল। মনে হয় এসেনীরা[৪] গ্রীকদের কাছ থেকে পরে ঐ সমস্ত ভাব গ্রহণ করেছিল। ইজিপ্ট ও গ্রীসের লোকরা চারটি ভূততত্ত্ব (উপাদান বা element) স্বীকার করতেন তবে আকাশতত্ত্বসম্বন্ধে তারা কিছু জানতো না। পরে হিন্দুদের কাছ থেকে ঐ দু'টি দেশ আকাশতত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিল'।

ইতিমধ্যে মহারাজকে তামাক দেওয়া হ'ল। তিনি তামাক খেতে খেতে হঠাৎ নিজেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে আসতেন পাগলিনী—তার প্রসঙ্গ তুল্লেন। তিনি বল্লেন : 'সঙ্গীতের প্রসঙ্গে মনে পড়ে আজ সেই পাগলিনীর কথা! আহা, কি অপূর্বই না ছিল তার ভাব ও ভক্তি! মধুর ছিল তার কণ্ঠস্বর! পাগলিনী কাশীপুরের

ওয়াগ্নারও হিন্দুসঙ্গীতের কাছে—বিশেষ ক'রে তাঁর 'লিভিঙ্ মোটিভ'-এর জন্ম ঋণী ছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ওয়াগ্নারের সঙ্গীতপদ্ধতির অনেক মিল আছে। এ'জন্য বোধহয়, পাশ্চাত্য সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের পক্ষে তাঁর সঙ্গীত তত সহজবোধ্য ছিল না। ওয়াগ্নার কয়েকটি ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের লাটিন অনুবাদ পড়েছিলেন এবং জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের সঙ্গে এ'সম্বন্ধে আলোচনাও করেছিলেন'।

Self-knowledge গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায়ও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

৪। এসেনীরা ঈশানীসম্প্রদায়। ঈশানী দেবী দুর্গার নাম। দেবী দুর্গা মহাশক্তি। এজন্ত এসেনীরা শক্তির উপাসক ছিলেন বলা যায়।

বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রায়ই আসতেন। ঠাকুর তাঁর গান শুনলে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়তেন'।

'ঐ প্রসঙ্গে মনে পড়ে একদিনের কথা! শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন পাগলিনীর ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন: 'ও (পাগলিনী) ঘরে এলে আমার ভয় হয়, পাছে বেসামাল হ'য়ে পড়ি। কি মধুর ওর গলা, ওর গান শুনলে আমার মন সমাধিসাগরে মগ্ন হয়ে যায়। ওকে বাগান থেকে বার ক'রে দে নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ)'। তারপর থেকে লাঠি নিয়ে পাগলিনীকে তাড়া করতো নিরঞ্জন মহারাজ। কিন্তু কে কার কথা শোনে। একবার ভয় দেখানোর জন্য কাশীপুর-থানায় তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশ অবশ্য ধমক দিয়ে পাগলিনীকে ছেড়ে দিলে, কিন্তু তার পরক্ষণেই দেখি যে, সে আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে এসে গান করতে লাগলো—

মা মা বলে আর ডাকিব না,
তারা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী. করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,
(না হয়) দ্বারে দ্বারে যাবো, ভিক্ষা মেগে খাবো,
মা বোলে তো আর কোলে যাবো না।

কী প্রাণস্পর্শী ছিল তার গান ও কণ্ঠস্বর! পাষাণও বুঝি গ'লে যেত তার গানে! গান শোনামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর একেবারে গভীর সমাধিস্থ হ'য়ে পড়তেন'।

পাগলিনী চলে যাওয়ার পরে স্বামীজী মহারাজ নিজেই সুর ক'রে সেই গানের শেষ কলিদু'টি গাইতে লাগলেন—

না হয়, দ্বারে দ্বারে যাবো, ভিক্ষা মেগে খাবো,
মা বোলে তো আর কোলে যাবো না।

ঐ দু'টি লাইন তিনি বারবার গাইতে লাগলেন। তাঁর চক্ষু

ক্রমশঃ অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী মহরাজ বল্লেন : 'সেই যে নিরঞ্জন একদিন পাগলিনীকে বিষম তাড়া করেছিল, তারপর থেকে আর কোনদিন কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সে আসেনি আহা, সেই সব দিনের স্মৃতি এখনো চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কী মধুর ছিল সেই দিনগুলি' !

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে স্বামীজী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলেন—যেন কত-শত পুরাতন স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে তখন ভেসে উঠ্ছিল! মুখ উজ্জ্বল ও চোখের চাহনি উদাস! সারা অফিস-ঘরটি নিস্তব্ধতায় ভরে উঠেছিল।

এ' সকল আলোচনা হচ্ছিল দার্জিলিঙ বেদান্ত আশ্রমে সেকথা পূর্বে বলেছি। আলোচনার সময়ে সমগ্র ঘরটি নিস্তব্ধ, কেবল দার্জিলিঙ-সহরের পাহাড়ের গায়ে চিড়গাছগুলিতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল তখনও তাদের চারণগান গেয়ে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। কিছু পূর্বে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। তাই চারদিকের গাছগুলোর পাতা থেকে ঝরা জলবিন্দুর টুপ্ টাপ্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তখন রাত্রি হবে সাড়ে আট কিংবা ন'টা।

আমরা সকলে নিস্তব্ধে কেবল স্বামীজী মহারাজের মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। ধ্যান অতি সহজ বস্তু এ'কথাই যেন তখন মনে হচ্ছিল, কেননা পাহাড়ের নিস্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে মনের নিস্তব্ধতা মিশে এক জমাট গম্ভীর ও শান্ত সমাহিত পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজী মহারাজ আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে গম্ভীরভাবে বল্লেন : 'গিরিশবাবু কিন্তু পাগলিনীকে ভুলতে পারেন নি। তিনি পাগলিনীর মধুর চরিত্র তাঁর 'বিল্বমঙ্গল'-নাটকে অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার অমর লেখনি দিয়ে পাগলিনীকে তিনি চিরস্মরণীয় ক'রে গেছেন! দুঃখের বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু 'বিল্বমঙ্গল'-নাটকটির অভিনয় দেখে যেতে পারেন নি!

গিরিশবাবুর লেখা 'চৈতন্যলীলা' (২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) ও 'প্রহ্লাদচরিত্র' (১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ খৃঃ) নাটকদুটির অভিনয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখেছিলেন।[৫] আমার বেশ মনে আছে যে, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। শুনেছি 'বিল্বমঙ্গল'-নাটক লেখা যে'দিন শেষ হয় সে'দিনই নাকি শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর যায়। গিরিশবাবু কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের চরিত্র 'বিল্বমঙ্গল', নসীরাম প্রভৃতি নাটকের ভিতর মহিমোজ্জ্বলভাবে ফুটিয়েছেন। একেই বলে গুরুর প্রতি শিষ্যের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কি চোখে গিরিশবাবু দেখতেন, কতখানি ভক্তি করতেন ও ভালবাসতেন—তা' মুখে বোঝানো যায় না! শুনেছি তিনি ভৈরবের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরও করুণা ক'রে তাঁর সকল-কিছু ভার গ্রহণ করেছিলেন'।

পাগলিনীর প্রসঙ্গের পর ক্রমশঃ মহারাজ নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের কথাই তখন কেবল বলতে লাগলেন। আমরা তাঁর কথা বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে শুনছিলাম। কি ভালবাসা ও আবেগপূর্ণ ভাব নিয়েই না তিনি গিরিশবাবু সম্বন্ধে বলছিলেন! প্রাণস্পর্শী ছিল তাঁর ভাষা ও ভাব! নিয়তই তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল গিরিশবাবুর কথা বলার সময়ে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বলতে লাগলেন: 'এখনো আমাদের

৫। 'চৈতন্যলীলা'-নাটক শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখেছিলেন ষ্টার-থিয়েটারে—যেটি বর্তমান বিধানসরণীতে অবস্থিত ষ্টার-থিয়েটার নয়। ঐ নাটকে বিনোদিনী দাসী গ্রহণ করেছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভূমিকা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'চৈতন্যলীলা'-অভিনয় দেখে শ্রীচৈতন্যের ভাবে আত্মহারা হয়ে সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং নটী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

স্বর্গত ভক্ত কৃষ্ণপদ ঘোষ নটী বিনোদিনীকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে নিয়ে গিছলেন সাহেবের বেশ পরিয়ে ছদ্মবেশে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ছিলেন শ্যামপুকুরে। তখনও বিনোদিনীকে শ্রীশ্রীঠাকুর আশীর্বাদ করেছিলেন এবং নটী বিনোদিনী ঐ আশীর্বাদ লাভ করে ধন্যা হয়েছিলেন।

দেশের লোক গিরিশবাবুকে ঠিক ঠিক ভাবে চিনতে পারেনি। গিরিশবাবু ছিলেন সারা বাঙালীজাতির গৌরব। কেবল বাঙালাদেশ কেন, সমগ্র ভারতে এতবড় original (নূতন সৃষ্টিশক্তিশালী খাঁটি) thinker (চিন্তাশীল) নাট্যকার জন্মায় নি বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙলা-সাহিত্যের জগতেও দান তাঁর অপরিসীম। তিনি নাট্যকার ও অভিনেতা দুইই ছিলেন। কথা-সাহিত্যেরও তিনি ছিলেন যাদুকর। বিশেষ ক'রে পৌরাণিক নাটক-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বহুমুখী ও নবনবউন্মেষশালিনী ছিল তাঁর প্রতিভা। তাঁর কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা ছিলেন দেবী সরস্বতী। Inner inspiration (অন্তরের প্রেরণা) নিয়ে তিনি মেতে যেতেন তাঁর লেখার মধ্যে। তিনি একই সঙ্গে তিনটি নাটকের প্লট তিনজন লেখককে মুখে মুখে বলে যেতেন। সঙ্গীতরচনাক্ষেত্রেও অবদান তাঁর যথেষ্ট। কি অসাধারণ ছিল মণীষা! কিন্তু দেশ তাঁর সেই প্রতিভার পূজো এখনো করতে শিখেনি ব'লে মনে হয়। কালে তাঁর যথার্থ আদর দেশে হবে আশা করি'।

আমাদের পাশে ছিলেন নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের একজন পরম-অনুরাগী ভক্ত। তিনি বল্লেন : 'মহারাজ, নাটক লেখার ভঙ্গী ছিল গিরিশচন্দ্রের অভিনব। তিনি নিজে কলম ধরতেন খুব কম সময়েই। ভাবের আলোড়নের মধ্যে এ'দিকে-ওদিকে পায়চারী করতেন, দু'তিন জন লেখক বসে থাকতেন তাঁর পাশে খাতা কলম নিয়ে, গিরিশচন্দ্র ব'লে যেতেন নদীপ্রবাহের মতো অনর্গল ভাষায় এক একজনের দিকে ফিরে, আর লিখে যেতেন তাঁরা সিদ্ধিদাতা গণেশের মতো, অথচ প্রত্যেকটি plot-এর (ঘটনার) বিষয়বস্তুর ভিতর এতটুকুও অসামঞ্জস্যের ভাব দেখা যেত না'।

তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন : 'অনন্যসাধারণ ছিল গিরিশবাবুর মনীষা। তিনি ছিলেন শুধু লেখক নয়, স্রষ্টা, সাধক, সংস্কারক—

অনেক কিছু। ভাবের তরঙ্গে সর্বদাই তিনি পাগলের মতো ডুবে থাকতেন। অনুবাদ করার শক্তি ও ছিল তাঁর অসাধারণ আর ছিল তাঁর স্মরণশক্তি সেক্সপিয়ারের লেখা 'ম্যাকবেথ'-এর অনুবাদই তার নিদর্শন! কত apt (সঠিক) ও correct (হুবহু ও শুদ্ধ) হয়েছে তাঁর অনুবাদ। যেমন ডাকিনীরা বলছে—

First Witch :

When shall we three meet again
In thunder, lightning, or in rain ?

Second Witch :

When the hurlyburly's done
When the battle's lost and won.

Third Witch :

That will be ere the set of sun.

First Witch :

Where the place ?

গিরিশবাবু এর অনুবাদ করেছেন

১ম ডাকিনী। দিদিলো, বল্ না আবার
মিলবো কবে তিন বোনে ?
যখন ঝর্‌বে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর,
চক্ চকাচক্ হান্‌বে চিকুর,
কড়্ কড়াকড়্ কড়াৎ কড়াৎ
ডাকবে যখন ঝন্‌ঝনে ?

২য় ডা। যখন বাধ্‌বে, মাত্‌বে, হার্‌বে,
জিন্‌বে, থাম্‌বে লড়াই রণ্‌রণে।

৩য় ডা। চিকিচিকি ঝিকিমিকি,
ডুবু ডুবু হবে চাকি,
লড়াই কি আর থাক্‌বে বাকী।

১ম ডা। কোন্‌খানে বোন্—কোন্‌খানে,
বোন কোন্‌খানে? ইত্যাদি

তৃতীয় দৃশ্যে আবার ডাকিনীরা বলছে—

First Witch :
Where hast thou been, sister ?
Second Witch :
Killing swine.
Third Witch :
Sister, where thou ?
First Witch :
A sailor's wife had chestnuts in her lap,
And munch'd, and munch'd, and munch'd :
—'*Give me*', quoth I ;
'*Aroint thee, witch !*' the rump-fed
ronyon cries, etc.

এর অনুবাদ যেমন—

১ম ডাকিনী। বোন্, কোথায় ছিলি বসে?
২য় ডা। কচি কচি শোরের ছানা চিবুচ্ছিলেম ক'সে।
৩য় ডা। তুই কোথায় ছিলি বোন্?
১ম ডা। শোন্ বলি তবে শোন্,—
এলো চুলে মাল্লার মেয়ে, ব'সে উদোম গায়,
ভোর কোঁচড়ে ছেঁচা বাদাম, চাকুম চাকুম খায়;

চাইতে গেলুম একটি মুঠো, পাড়াকুঁদুলী মাগী,
নাক্‌টা নেড়ে দিলে তেড়ে বলে 'দূর হ ঘাগী।'

—প্রভৃতি

'ম্যাক্‌বেথ'-নাটকের এ'রকম কত passage-এর (অংশের) উদাহরণই না পাশাপাশি দেখানো যেতে পারে—যাতে কোন্‌টি original (ঠিক ঠিক) ও সেক্সপীয়ারের নিজের লেখা, আর কোন্‌টি অনুবাদ তা' নির্ণয় করা দুঃসাধ্য! কী অদ্ভুতই না ছিল গিরিশবাবুর প্রতিভা ও অনুবাদ করার কৃতিত্ব!'

* * *

'আমেরিকায় থাকতে সেখানকার প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার অনেকবার হয়েছে। সুবিখ্যাত অভিনেতা জোসেফ জেফার্‌সনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একাধারে ছিলেন লেখক, বক্তা, অভিনেতা, আবার ভাল চিত্রকর। একবার গ্রীন-একারে (Green Acre) তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হ'ল নাটক-সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। তিনি 'Possibility of Drama', (নাটকের সম্ভাবনা) সম্বন্ধে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মিস্ ফার্‌মার সেই বক্তৃতার বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমাদের ফটোও তোলা হয়েছিল সেই সময়ে।

'আর একবার মিষ্টার ভ্যান্ হ্যাগেনের সঙ্গে এ্যাভিনিউ থিয়েটারে জোসেফ জেফার্‌সনের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। সে'দিন 'রাইভালস্' (Rivals) নামে একটি Comic-এ (প্রহসন-নাটকে) তিনি 'বন্ একার্স' এর (Bon Acres) অভিনয় করেছিলেন। খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল তাঁর অভিনয়। জেফার্‌সন ছিলেন একেবারে বদ্ধকালা, কাণে কিছুই শুনতে পেতেন না, অথচ play (অনিভয়) করতেন আশ্চর্য রকমের। ভগবান তাঁকে অসাধারণ রকমের শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন।

'একবারের কথা, বোধহয় ইংরেজী ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে হবে। আমি মিসেস্ কেপের সঙ্গে 'হার্লেম-অপেরা-হাউস'-এ (Harlem Opera House) সেক্সপীয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভিনিস্' দেখতে যাই। সে'দিন বিখ্যাত অভিনেতা মিষ্টার ম্যানস্ফিল্ড (Mr. Mansfield) সাইলকের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। অপূর্ব ছিল তার অভিনয়ের ভঙ্গী, আজও সেকথা স্পষ্টভাবে আমার মনে আছে।

'তবে আশ্চর্য হয়েছিলাম আমি এড্মণ্ড রাসেলের অভিনয় দেখে। 'ম্যাডিসন-স্কোয়ার-কনসার্ট-হল'-এ সে'দিন ছিল 'শকুন্তলা'-নাটকের অভিনয়। রাসেল অবতরণ করেছিলেন দুষ্মন্তের ভূমিকায়। দুষ্মন্তের ভূমিকাকে তিনি জীবন্ত ক'রে সৃষ্টি করেছিলেন। 'ওয়াল্ডার্ক্ থিয়েটার'-এ রাসেলের 'হ্যাম্লেট'-অভিনয়ও আমি দেখেছি। কি প্রতিভাবান অভিনেতাই না তিনি ছিলেন! তাঁর অভিনয় দেখে আমার সর্বদাই মনে পড়্ছিল নাট্যসম্রাট গিরিশবাবুর অভিনয়ের কথা। গিরিশবাবুর প্রতিভাকে এদেশে কেউ ঠিক চিন্লে না—এটাই আমার দুঃখ! 'বিল্বমঙ্গল' ও 'চৈতন্যলীলা' নাটক-দুটিতে গিরিশ-বাবুর অভিনয় আমি দেখেছি। তুলনা করলে নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, গিরিশবাবুর অভিনয়ের কোন কোন অংশ রাসেলের অভিনয়-নৈপুণ্যের চেয়ে সহস্রগুণে ভাল! কি inspired (ভাববিমুগ্ধ) হয়েই না গিরিশবাবু তাঁর ভূমিকাগুলির অভিনয় করতেন!

'গিরিশবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি আমায় বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। আমেরিকায় যখন ছিলাম, তখন রাবকনএে তিনি আমায় চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর শরীর যখন ইংরাজী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে, (১৩১৮ সালে) চলে গেল, তখন তাঁর স্পিরিটটা (প্রেতদেহ) আমি দেখেছিলাম। তিনি স্থূলশরীর (materialized body) ধারণ করে আমায় দেখা দিয়েছিলেন। দেখেছিলাম—গিরিশবাবু

আমারসামনে এসে চারদিকে মুখ ফিরিয়ে 'থু থু' শব্দ করতে লাগলেন, কিন্তু কোন কথা বল্লেন না। তারপর কুয়াসার মতো তিনি বাতাসে মিশিয়ে গেলেন। বুঝেছিলাম—গিরিশবাবু আর ইহজগতে নাই। পরে তাঁর মৃত্যুর সংবাদও পেয়েছিলাম। জগৎটা যে তাঁর কাছে অতিতুচ্ছ—এক কাণাকড়িও দাম নেই—এ' ইঙ্গিতই তিনি 'থু থু' শব্দ ক'রে বুঝিয়েছিলেন'।[১]

শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশবাবুর 'চৈতন্যলীলা'-'নাটকাভিনয় দেখে বিমুগ্ধ ও সমাধিস্থ হয়েছিলেন। অভিনেত্রী বিনোদিনী চৈতন্যের ভূমিকায় নেমেছিল। বিনোদিনী চৈতন্যের ভূমিকা অভিনয় করার পূর্বে সংযম-সাধন ও নিরামিষ আহার করতো। আমি আমেরিকায় থাকতে একটি অভিনেত্রীসম্বন্ধে ঠিক এই রকম জানতাম। মেয়েটি যীশুখৃষ্টের অভিনয় করতো। যীশুখৃষ্টের ভূমিকায় অভিনয় করার ছ'মাস পূর্ব থেকে সে শ্রদ্ধাসহকারে যীশুখৃষ্টের পবিত্র চিন্তা নিয়ে থাকতো। আমি দেখেছিলাম যে, মেয়েটি যখন যীশুখৃষ্টের ভূমিকায় প্লে (অভিনয়) করতো তখন সত্যই সে যীশুখৃষ্টের ভাবে তন্ময় হ'য়ে থাকতো।

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-প্রণীত 'তীর্থরেণু'-গ্রন্থে এ' প্রসঙ্গটি উল্লিখিত আছে।

॥ স্মৃতি : তেরো ॥

(প্রথমাংশ)

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় থাকাকালে সেখানকার বিভিন্ন স্থানের বিচিত্র ঘটনার কথা অনেককে অনেকবার বলেছিলেন। আমরা সেই সবেরও সামান্য-কিছু এখানে আভাস দেবার চেষ্টা করবো।

তখন আমরা ইডেন-হস্‌পিটাল-লেনের ভাড়াটে বাড়ী ছেড়ে ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের ভাড়াটে নূতন বাড়ীতে চলে এসেছি। রাত্রি ৮টা হবে। স্বামীজী মহারাজ পূর্বের মতোই অফিস-ঘরে এসে বস্‌লেন। ঘরে আরও ছ'সাত জন বাইরের ভদ্রলোক ছিলেন। স্বামীজী মহারাজ কোন এক আগন্তুক ভদ্রলোককে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন: 'এই যে, ক্যামন আছেন? এবার যে অনেক দিন পরে'।

ভদ্রলোক স্বামীজী মহারাজের একজন দীক্ষিত শিষ্য, জামসেদপুর থেকে দু'চারদিনের জন্য এসেছেন ছুটি নিয়ে। তিনি টাটা-ওয়ার্কস্‌-সপে কাজ করেন। স্বামীজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে সশব্যস্তে উত্তর দিলেন: 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, ছুটি পাওয়াই মুস্কিল। আপনার আশীর্বাদে ভাল আছি। আপনার শরীর ক্যামন আছে এখন?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'আমাদের আবার থাকা আর না-থাকা। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন যেমন রাখেন আর কি। তন্‌ মন্‌ ধন্‌ সবই তো তাঁর চরণে সঁপে দিয়ে এখন বসে আছি পাড়ি দেওয়ার জন্য। বুড়িছুঁয়ে[২] বসে আছি আর কি। এখন তাঁর যা ইচ্ছা, আমার নিজের কি আর বলুন'।

২। বুড়িছুঁয়ে বলার উদ্দেশ্য জীবনে তাঁর ঈশ্বর লাভ হয়েছে। এখন মুক্তিময় জীবন নিয়ে ঈশ্বরের লীলা ভোগ করছেন।

ভদ্রলোক নির্বাক। স্বামীজী চেয়ারে বসে একখানি চিঠি পড়ছিলেন। ভদ্রলোক স্থিরভাবে বসেছিলেন। তাঁর সেবক তামাক দিয়ে গেলেন। তিনি গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়ে তামাক খেতে খেতে আবার চিঠিটি পড়ছিলেন। আমরা কয়েকজন ঘরে প্রবেশ করবো—কি করবো না ভাবছি, ইতিমধ্যে তিনি আমাদের দেখে বল্লেন—'এসো'। আমরা তখন অফিস-ঘরে প্রবেশ ক'রে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালাম। তিনি নীচে মেঝেতে পাতা মাদুরে বসতে বল্লেন। আমরা বসলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: 'কি মনে ক'রে?' আমরা বল্লাম: 'মহারাজ, বিশেষ কোন কারণ নেই। আমরা দিন যেমন আসি—তেমনি আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি'।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'এই যে বল্লে কোন কারণ নাই। কিন্তু কোন কার্যই হয় না বা হতে পারে না কারণ না থাকলে। দিন প্রণাম করতে আসো—সেও একটা কারণ, আবার আজও এসেছো তার পিছনেও একটা কারণ আছে। কারণ-ছাড়া কোন কার্য হয় না—এ'কথা বলেছেন প্রাচীন মুনি সাংখ্যকার কপিল'।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'মহারাজ, মুনি কপিলের নিজের লেখা সাংখ্যদর্শন কি পাওয়া যায়?'

মহারাজ বল্লেন: না, তার নিজের লেখা বই পাওয়া যায় না। অবশ্য 'সাংখ্যসূত্র' নামে একটি গ্রন্থ তার নামে প্রচলিত আছে জানা যায়, কিন্তু তাও নাকি তাঁর শিষ্য পঞ্চশিখের লেখা। আমরা যে ৭২টি কারিকা দিয়ে সাংখ্যদর্শন এখন পড়ি সেটি রচনা করেছেন ঈশ্বরকৃষ্ণ—কপিলেরই একজন শিষ্য বা অনুগামী। ঐ ৭২টি কারিকার উপর 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' নামে ভাষ্য রচনা করেছেন বিদ্বান বাচস্পতি মিশ্র। বাচস্পতি মিশ্র মহাধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়,

বৈশেষিক, বেদান্ত প্রভৃতি ছ'টি দর্শনের উপরই তিনি মনীষাপূর্ণ ভাষ্য রচনা করেছেন। বাদরায়ণ-ব্যাস-রচিত ব্রহ্মসূত্রের উপর যে ভাষ্য রচিত হয়েছে তার নাম 'ভামতী'। শোনা যায়, বাচস্পতি মিশ্র তাঁর স্ত্রীর (ভামতীর) নামেই নাকি বেদান্তভাষ্যের নাম রেখেছিলেন 'ভামতী'।

স্বামীজী মহারাজ কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে চিঠিটি পড়ে টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছেন। তিনি আলোচনার পূর্বপ্রসঙ্গ তুলে আবার বল্লেন: 'ঠিকই কথা যে, কারণ-ছাড়া কোন কার্য হয় না। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন—

'অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণাভাবচ্চ সৎকার্যম্॥'

সাংখ্যকার কপিল সৎকার্যবাদী—এ'কথা তোমাদের পূর্বে বলেছি। সৎকার্য বলতে সৃষ্টির বা উৎপত্তির পূর্বেও কার্য সৎ অর্থাৎ কার্যের অস্তিত্ব ছিল, কেননা সদ্‌রূপ কারণ থেকেই সদ্‌রূপ কার্যের সৃষ্টি হয়। মোট-কথা কারণ সৎ, সুতরাং কার্যও সৎ, আর কার্য সেজন্যই কারণ থেকে অভিন্ন। বাচস্পতি মিশ্র এই সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন: "ইতশ্চ সৎকার্যমিত্যাহ কারণভাবাচ্চ, কার্যস্য কারণাত্মকত্বাৎ, ন হি কারণাভিন্নং কার্যং, কারণঞ্চ সদিতি কথং তদভিন্নং কার্যমসদ্‌ভবেৎ?"—অর্থাৎ কার্য সৎ, কেননা তার কারণ সৎ (থাকে)। সৎ থেকেই সতের সৃষ্টি বা উৎপত্তি। অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি হয় না, হ'লে অসৎকার্যরূপ মতবাদের সৃষ্টি হয়।'

আমরা বল্লাম: 'সাংখ্যকার কপিল যুক্তিনিষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে প্রথম ও অগ্রণী। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ সেকথা স্বীকার করেছেন একটু অন্যভাবে—'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ'।[১] মুনি কপিলকে শ্রীকৃষ্ণ

১। গীতা ১০।২৬

গীতায় নিজেরই স্বরূপ বলেছেন, তাতে ক'রে মুনি কপিল যে প্রাচীন ও প্রামাণিক ঋষি একথাই প্রমাণ হয়'।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'হ্যাঁ। তোমরা আমার Cosmic Evolution and Its Purpose-বইটা পড়বে। তাতে আমি বিজ্ঞানদৃষ্টির দিক থেকে বিচার ক'রে বলেছি যে, কপিলের সৃষ্টিতত্ত্বের ক্রম বা ধারা বৈজ্ঞানিক। যদিও তৈত্তিরীয়-উপনিষদে বিশ্বসৃষ্টির একটি ক্রমিকধারার উল্লেখ আছে, তবুও কপিলের বিচার বিজ্ঞান-সম্মত। আচার্য শঙ্কর ও পরবর্তী অন্যান্য বেদান্তের আচার্যেরা কপিলের সৃষ্টিতত্ত্বই গ্রহণ করেছেন নির্ভরযোগ্য ব'লে। Modern Science (আধুনিক বিজ্ঞান) বর্তমানে এ্যাটম্, মলিকিউল প্রভৃতির বিচার ক'রে শেষে কস্‌মিক-এনার্জী (Cosmic Energy) থেকে বিশ্বসৃষ্টির কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে। আমি আমার ঐ Cosmic Evolution and Its Purpose-গ্রন্থে কপিলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও বর্তমান বিজ্ঞানের সৃষ্টিরহস্য—এই দু'য়ের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের কথা বলেছি। ইংরাজী ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সি. ভি. রমণ যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন আমি তাঁকে এ'সকল সম্বন্ধে তাঁকে বলেছিলাম। তখন আমি দার্জিলিঙ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে ছিলাম। স্যর সি. ভি. রমণ সাংখ্যের দৃষ্টিতত্ত্ব ও বর্তমান বিজ্ঞানে উল্লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা আমার মুখে শুনে বিশেষ আনন্দিতহয়েছিলেন। তখন আমি তাঁকে আমার ঐ Cosmic Evolution and Its Purpose-পুস্তিকাটি উপহার দেই'।

আমরা বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে স্বামীজী মহারাজের কথা শুন্‌ছিলাম। স্বামীজী মহারাজ কিন্তু ব'লে যেতে লাগলেন অনর্গলভাবে। তিনি বল্লেন: 'সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ দু'টি প্রধান ও আদিতত্ত্ব। প্রকৃতি জড়া বা অচেতন, আর পুরুষ নিগু'ণ, চেতন, বহু ও বিভু অর্থে

সর্বব্যাপী। প্রকৃতি জড়া ও অচেতন ব'লে চেতন-পুরুষের সাহায্যে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এ' তিনটি প্রকৃতির গুণ। এ' তিনটি গুণ যখন একসঙ্গে সমানভাবে থাকে তখন প্রকৃতি নিজের রূপে ও স্বভাবে থাকে। তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থা। আর গুণগুলি পৃথক হলেই বিশ্বসৃষ্টি হয় পুরুষের সান্নিধ্য বা সাহায্য নিয়ে। গুণগুলির পৃথক হওয়ার নাম সাংখ্যকার বলেছেন 'গুণক্ষোভ'। গুণক্ষোভ অর্থাৎ প্রকৃতির অবয়বরূপ গুণগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হলেই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণতিনটি প্রকৃতির আভ্যন্তরিক ও অপরিচ্ছন্ন অবয়ব বলেই তাদের বিশ্বসৃষ্টির মূলকারণ বলা হয়, নইলে পুরুষ ও প্রকৃতি—পঙ্গু ও অন্ধের মতো দু'জনে মিলে বিশ্ব সৃষ্টি করেন।'

'নৈয়ায়িকরা পরমাণুকে বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলেছেন। পরমাণু আকারহীন অতিসূক্ষ্ম নিরবয়ব নিত্যবস্তু। একটি পরমাণু বিশ্বসৃষ্টি করতে অক্ষম ব'লে চারটি পরমাণু একত্র হ'য়ে অর্থাৎ চতুরণু জগৎ সৃষ্টি করে। চারটি অণু বা চতুরণু একত্রে বা পরস্পরে সমবেত হয় ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই। সাংখ্যের তন্মাত্র ও ন্যায়ের পরমাণু প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত, তবে মডার্ন সায়েন্সে যাকে এ্যাটম বলে, ন্যায়ের পরমাণু তা থেকেও অতিসূক্ষ্ম ও ভিন্ন। ন্যায়ের পরমাণু অবিভাজ্য, কিন্তু বিজ্ঞানের এ্যাটম পরে বিভক্ত হ'য়ে মলিকিউলে পরিণত হয়।[২]

২। স্যার জে. জে. থমসন এ্যাটমকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। স্যর জেমস্ জিন্স বলেছেন: "Then, just as the nineteenth century was drawing to a close, Sir J.J. Thomson and his followers began to break up the atom, which now proved to be no more uncuttable, and so no more entitled to the name of 'atom', than the molecule to which the name had previously been attached. They were only able to detach small fragments, and even now the complete break-up of the atom into its ultimate constituents has not been

মলিকিউলেরও পরে পরিবর্তন হয়েছিল, তখন নাম হয় ইলেকট্রন। তারপরে পজিটন, প্রোটন প্রভৃতি। কিন্তু ন্যায়ের এ্যাটম বা অণু চিরদিনই অবিভাজ্য (বিভক্তহীন) থেকে গেল। সেজন্য সংস্কৃত 'অণু'-শব্দের ইংরাজী কোনদিনই এ্যাটম নয়, অথচ এ্যাটম্ (Atom) ছাড়া এর আর কোন ইংরাজী প্রতিশব্দ নাই'।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'মহারাজ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কথা বলতেন। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কি কপিলের সাংখ্যমতে ?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'হ্যাঁ। সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে—

'মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারং ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥'

আদিকারণ প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধিসমষ্টি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র সাতটি, আর ষোলটি কার্য যেমন পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় ও মন। সুতরাং সাতটি সূক্ষ্মভূত কারণ। ষোলটি কার্য= মোট ৭+১৬+১ আদিকারণ প্রকৃতি=২৩+১=২৪টি তত্ত্ব'।

স্বামীজী মহারাজ অঙ্গুলিতে প্রত্যেকটির সংখ্যা রেখে গণনা ক'রে বল্লেন সাংখ্যমতে চতুর্বিংশতি অর্থাৎ চব্বিশটি তত্ত্ব। অপরাপর দার্শনিকরা চব্বিশের বেশী সংখ্যা বলেছেন'।

স্বামীজী মহারাজ পূর্বের মতো তামাক খেতে খেতে বলতে লাগলেন: 'সাংখ্যকার কপিল সাংখ্য বা জ্ঞানবাদী ছিলেন। 'সংখ্যা'-অর্থে জ্ঞান। কপিল সৎকার্যবাদ স্বীকার করেন। সৎকার্যবাদে

fully achieved. These fragments were found to be all precisely similar, and charged with negative electricity. They were accordingly named 'electrons"—vide *The Mysterious Universe* (1934), p. 45.

কার্য সৎ, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে কার্য সৎ থাকে ও আবার উৎপত্তির পরে কার্যরূপে সৎ একথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি দার্শনিকরা অসৎকার্যবাদী। অসৎকার্যবাদীদের মতে কার্য ছিল না সৃষ্টি বা উৎপত্তির পূর্বে, সুতরাং ছিল না—হ'ল বলতে সৃষ্টি হ'ল অসৎ থেকে সৎ-এর—যেমন ঘট বা যেকোন মাটির পাত্র সৃষ্টি হবার পূর্বে মাটির পাত্ররূপে ঘট ছিল না, ছিল মাটির আকারে, মাটি কিন্তু ঘট বা মাটির পাত্র নয়, সুতরাং অসৎরূপেই ছিল। অতএব ঘট বা মাটির পাত্র অসৎ থেকে সদ্রূপে সৃষ্টি হ'ল। নাগার্জুন প্রভৃতির শূন্য বা অসৎ নিরুপাখ্য বলতে অনির্বচনীয়, অর্থাৎ যাকে বিশেষ ক'রে নির্বাচন করা বা বলা যায় না। কিন্তু অসৎ অনির্বচনীয় হ'লে 'সৎ'-এর সৃষ্টিই বা কীভাবে হতে পারে? কণাদ ও গৌতমের মতে সৎকারণ পরমাণু থেকে অসৎকার্য দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি হয়, সুতরাং এঁদের মতেও সৎ ও অসতের মিলন বা ঐক্য সম্ভব নয়। কাজেই কারণ কোনদিনই কার্য থেকে অভিন্ন হতে পারে না, আর এ'থেকে সাংখ্যমত তাঁরা খণ্ডন করেন। সুতরাং তাঁদের কার্য যে সৎ—তাও সিদ্ধ হয় না, ফলে অসৎকার্যবাদই এসে যায়'।

আমরা 'হ্যাঁ' ও 'না'—দুইয়ের মাঝখানে পড়ে বেশ একটু সন্দেহ প্রকাশ করলাম। স্বামীজী মহারাজ তা বুঝলেন এবং বল্লেন: 'এ'সবের সিদ্ধান্ত করা হয় শূন্যবাদের দিক থেকে'।

তিনি পুনরায় বল্লেন: 'বৌদ্ধদার্শনিকদের মধ্যে চারটি সম্প্রদায় আছে—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকসম্প্রদায় শূন্যবাদী বা শূন্যতাবাদী। বৌদ্ধদার্শনিক নাগার্জুনও শূন্যবাদী বা শূন্যতাবাদী ছিলেন, কেননা অসদ্রূপ শূন্য বা শূন্যতা থেকেই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি—একথা তিনি বলেছেন। তাঁর মতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকৃত সত্তা নাই, সবই শূন্য—void বা

nothingness. যোগাচারীরা বিজ্ঞানবাদী, তাই তারা বাহ্যশূন্যতাবাদী। বিজ্ঞানবাদীরা বলে যে, বিজ্ঞানের একমাত্র সত্তা বা অস্তিত্ব আছে ভিতরে (মনে), সেজন্য মনের বাইরে বলতে বাহ্যজগতে কোন-কিছুর সত্তা নাই। সৌত্রান্তিকরা অনুমান বা অনুমেতাবাদী, অর্থাৎ সত্তা তারা অনুমান করে বাইরে বিজ্ঞানের সত্তা থাকার জন্য। বৈভাষিক-বৌদ্ধরাও বলে যে, বাহ্য বা বাইরের পদার্থের সত্তা নাই, স্থতরাং তারা প্রত্যক্ষতা স্বীকার করে না। মোটকথা চারটি বৌদ্ধসম্প্রদায়ই ক্ষণিকবিজ্ঞান স্বীকার করে। ক্ষণিকবিজ্ঞান বলতে বিজ্ঞানের বা জ্ঞানের স্থায়িত্ব ক্ষণিক বা একক্ষণমাত্র। তাদের মতে অস্তিত্বের বা সত্তার কথাও তাই—জ্ঞানের ও বাহ্যপদার্থের স্থায়িত্ব একক্ষণস্থায়ী—ক্ষণমাত্র। এরা একদিক থেকে অভাব (শূন্য) থেকে ভাবের (কার্যের) উৎপত্তি স্বীকার করে—'অভাবাদ্‌ভাবোৎপত্তিঃ'। শূন্যবাদীরা তাই নিজেদের মতকে সমর্থন করার জন্য বলে—'আসদেবেদমত্র আসীৎ'। কিন্তু বেদান্তের মতে এই অসৎ অব্যক্ত বা প্রকৃতি,—সত্তাহীন বস্তু নয়'।

স্বামীজী মহারাজ পুনরায় বল্লেন: 'একমাত্র অদ্বৈতবাদীরাই এক ও অখণ্ড একটি সৎ বা সত্তা স্বীকার করে। জগৎ বা বিশ্বপ্রপঞ্চকে তারা ব্রহ্মের বিবর্ত বলে। সেজন্য বিবর্ত ও বিকার এই দু'রকম পরিণামের কথা অদ্বৈতবাদীরা স্বীকার করেন। বিবর্ত হ'ল—'অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্তইত্যুদাহৃতঃ', আর বিকার—'সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীর্যতে'। বিবর্তমতে বস্তু যেমন তেমনই অবিকারী থাকে, তবে স্বরূপমাত্র আবৃত হয়, আর পরিণাম মতে কারণ থেকে কার্য পৃথক। কথা এই যে, অযথার্থরূপে একটি বস্তু অন্যভাবে পরিণত হ'লে বিবর্ত, যেমন রজ্জুর বিবর্ত সর্প, শুক্তির বিবর্ত রজত, ব্রহ্মের বিবর্ত জগৎপ্রপঞ্চ। বিকারের বেলায় মৃত্তিকার বিকার ঘট, দুগ্ধের বিকার দধি। অদ্বৈতবাদীরা বিশ্বপ্রপঞ্চকে তাই অসৎ অর্থে

মিথ্যা বলে—যেহেতু তার পারমার্থিক-সত্তা নাই। পারমার্থিক-সত্তা বলতে permanent existence ; অর্থাৎ বর্তমান, অতীত ও ও ভবিষ্যৎ তিনকালস্থায়ী বা কালাতীত-সত্তা। তবে জগতের ব্যবহারকালে জগতের সত্যসত্তা আছে—যাকে বলে ব্যবহারিক-সত্তা। তা'ছাড়া আছে প্রাতীতিক-সত্তা ও তুচ্ছসত্তা। প্রাতীতিক-সত্তা ব্যবহারকালেই নষ্ট (বাধিত) হয়, আর তুচ্ছসত্তা তুচ্ছই, তার সত্তা আকাশকুসুমের মতো অলিক ও মিথ্যা'।

স্বামীজী মহারাজ সকল সময়েই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা করতেন পূর্বে বলেছি। আলোচনা করতেন কখনও প্রশ্ন ও উত্তরের ছলে, আবার কখনও একটানাভাবে—অনর্গল বক্তৃতাকারে বলে যেতেন। আবার কখনও হাসিচ্ছলে, ঠাট্টা-তামাসাচ্ছলে থেমে থেমে বলতেন—একটানা নয়। তবে তাঁর সকল আলোচনার বিষয়বস্তুই চিন্তাশীলতাপূর্ণ হ'ত।

সেবক পুনরায় তামাক দিয়ে গেলেন। স্বামীজী মহারাজ কখনও তামাক খেতে খেতে আলোচনা করতেন বা কথাবার্তা বলতেন ; আবার স্থিরভাবে বসে উপদেশচ্ছলেও আলোচনা করতেন।

স্বামীজী মহারাজের আলোচনার ধারার ও বিষয়বস্তুর এখানে কিন্তু পরিবর্তন হ'ল। তিনি বল্লেন : 'একটা গানের মধ্যে আছে : 'আমারই অন্তরে থাকো মা, আমারেই লুকাইয়ে'। গানটি সাধক কমলাকান্তের তিনি গেয়েছেন—

'জানি, জানি গো জননি, যেমন পাষাণের মেয়ে।
আমারই অন্তরে থাকো মা, আমারেই লুকাইয়ে॥
প্রকাশি আপন মায়া, সৃজিলে 'অনেক কায়া।

বান্ধিলে নির্গুণ-ছায়া ত্রিগুণ দিয়ে॥
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ি।
তাহে বিড়ম্বনা কর মা, কি ভাব ভাবিয়ে॥

'মায়াতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। ঈশ্বর নিজের মায়া দিয়ে নিজেকেই সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ তিনি অবতারণ করেন ঈশ্বরের স্বরূপ থেকে মানুষরূপে, কেননা মানুষরূপে না এলে মানুষ চিন্‌বে তাঁকে কিভাবে! সেই দিব্যমানুষ হলেন অবতার—যিনি জীবের জন্য করুণায় বিগলিত হ'য়ে পৃথিবীতে আসেন। এই আসাই তাঁর অবতরণ। ঈশ্বর হয়েও মানুষরূপে অবতরণ করেন বলেই অবতার। আমি শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টকম্'-স্তোত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে লিখেছি—

মায়াং সমাশ্রিত্য করোষি লীলাং
ভক্তান্ সমুদ্ধর্তুমনন্তমূর্তিঃ।....

তারপর—

বিধৃত্য রূপং নরবত্ত্বয়াবৈ
বিজ্ঞাপিতো ধর্ম ইহাতিগুহ্যঃ।

ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর হলেও নিজের মায়াকে নিয়ে মানুষরূপে পৃথিবীতে আসেন আমাদের উদ্ধারের জন্য, আমাদের পথ দেখানোর জন্য। তারপর 'শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রামৃতম্'-স্তোত্রে লিখেছি—

নাধীতশাস্ত্র ইহ যোঽখিলশাস্ত্রবেত্তা
নাধীতবেদ ইহ যঃ শ্রুতিসারবিজ্ঞঃ।
নাধীততন্ত্র ইহ যঃ কুলধর্মবক্তা
তং তত্ত্ববোধকমহো ভজ রামকৃষ্ণম্॥

শাস্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে পড়লেন না, কিন্তু সকল শাস্ত্র সশরীরে তাঁর নিকট উপস্থিত হ'ল। বেদ তিনি পড়লেন না, কিন্তু বেদ-উপনিষদের সকল তত্ত্ব তিনি উপলব্ধি করলেন। তন্ত্রশাস্ত্র তিনি পড়লেন না, কিন্তু ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁকে চৌষট্টিখানি তন্ত্রের সাধনা তন্ন তন্ন ক'রে সাধন করালেন। এ'রকম অলৌকিক তত্ত্বজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানদাতা আর এ'যুগে কোথায় দেখেছো—

নির্বাসনোঽপি সততং পরমঙ্গলার্থী
নিষ্কর্মকোঽপি সততং কর্মকর্তা।
নি'দুঃখলেশমপি তং সততং পরেষাং
দুঃখেষু কাতরমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥

'নিজের মধ্যে স্বার্থের বাসনা নাই, কিন্তু পরের কল্যাণ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বদাই ব্যকুল। নিজের জন্য কর্ম নাই—সর্বদা নিষ্কাম, কিন্তু বিশ্বমানুষের জন্য তিনি সর্বদা কর্ম (সাধনা) করে গেছেন। নিজে সকল দুঃখ-তাপের অতীত, কিন্তু পরের দুঃখে সর্বদাই ব্যথিতচিত্ত ও করুণাপূর্ণ। এ'রকমটি আদর্শ কি আর এ'যুগে খুঁজে পাবে? তিনি সর্বধর্মের সাধনা ক'রে সকল ধর্মের চরমতত্ত্ব জানলেন ও সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধকদের তা দান করলেন। অযাচিত তাঁর কৃপা ও করুণা! তাই 'শ্রীরামকৃষ্ণগুণামৃতম্'-স্তোত্রে লিখেছি—

'কদা যোগী কদা ভোগী কদা বা জ্ঞানবিত্তমঃ।
কদা ভক্তঃ কদা শক্তো বৈষ্ণকশ্বাপি বা কদা ॥
মহাভাবে কদা মত্তঃ প্রেমবিহ্বলমানসঃ।
সমাধৌ বা কদা তিষ্ঠন্নির্বিকল্পকসংজ্ঞকে ॥

বিচিত্রভাবে বা ভাবসমাধিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মগ্ন হতেন। নির্বিকল্পসমাধিতেও তিনি মাঝে মাঝে ডুবে থাকতেন। কিন্তু তাহলেও তাঁর জীবনের ব্রত তিনি ভোলেন নি কোনদিন। লীলার জন্যই তাঁর শরীর ধারণ, ভক্তের জন্যই তাঁর পৃথিবীতে আসা। তাঁর অপার মহিমা ও করুণার কথা আমরা কি বলবো। তিনি তো আমাদেরও ভালবেসে বশীভূত করেছিলেন। পিতামাতার ভালবাসা তাঁর অফুরন্ত ভালবাসার কাছে ম্লান হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণগুণামৃতস্তোত্রে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করে তাই লিখেছিলাম—

লীলারূপহরেরেবং ভক্তার্থং দেহধারিণঃ।
রামকৃষ্ণস্বরূপস্য নানাভাবসমন্বিতাম্ ॥

অশেষগুণসমন্বিত, আবার সকল গুণের অতীত তিনি। সর্বভাবময়, আবার সর্বভাবতীত তিনি। সেই আনন্দমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ সত্যই মন-বুদ্ধির অতীত। সেজন্য আমি প্রণাম জানিয়ে বলেছি—

তত্ত্বং দেব ন জানামি রামকৃষ্ণ তব প্রভো।
যাদৃশোহাসি কৃপাসিন্ধো তাদৃশায় নমো নমঃ॥

বাংলায় রচনা করেছি—

রামকৃষ্ণদেব তুমি প্রভু সবাকার
নাহি জানি তব তত্ত্ব অগম্য অপার।
যাদৃশ তোমার রূপ তাদৃশ তোমায়
প্রণমি হে কৃপাসিন্ধু, তব রাঙাপায়॥

'স্বে-মহিম্নি'—তিনি নিজের মহিমায় মহিমান্বিত, সুতরাং তাঁর মহিমা বর্ণনা করা আমাদের সাধ্য কি ?—'যাদৃশোঽসি কৃপাসিন্ধো তাদৃশায় নমো নমঃ'।

স্বামীজী মহারাজ এ'সকল প্রসঙ্গ থেকে পরে আপনার সপ্রেম আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমা-বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। রোমাঞ্চিত তাঁর সর্বদেহ। ভাবদীপ্ত রক্তিমাভাপূর্ণ তাঁর মুখমণ্ডল। তিনি গম্ভীরভাবে 'যাদৃশোঽসি কৃপাসিন্ধো' বলতে বলতে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দু'টি হস্ত রেখে প্রণাম করলেন।

(দ্বিতীয়াংশ)

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী মহারাজ হঠাৎ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত কর্মযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞাদির প্রসঙ্গে ৪।২৬ শ্লোকে আলোচিত 'সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি' কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে হোম বা আহুতি দান করেন, আবার অপর কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি-বিষয়সকলকে আহুতি

দান করেন অর্থে সংসারে অনাসক্ত হয়ে বিষয়ভোগ করেন প্রভৃতি প্রসঙ্গের উত্থাপন করলেন। স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি' বলতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সংযমের প্রয়োজনীয়তা আছে জীবনকে এবং জীবনচিন্তাকে সচ্ছল ও সুসংযত করার জন্য।

এ'প্রসঙ্গে বলে রাখি যে, স্বামীজী মহারাজ আচার্য শঙ্করের একান্ত অনুরাগী হলেও গীতার ভাষ্যরূপে পরমাদ্বৈতবাদী আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর 'গূঢ়ার্থদীপিকা'-গীতাভাষ্যকে বিশেষ সমাদর দিতেন। তিনি বলতেন আচার্য শঙ্করের পর বিভিন্ন অদ্বৈতবাদী দার্শনিকদের অভ্যুদয় হলেও অসাধারণ যুক্তিবাদী ও উপলব্ধিবান মধুসূদন সরস্বতীর মতো অদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারী সাধক কমই পাওয়া যায়। এজন্য গীতায় আলোচিত বিভিন্ন যজ্ঞের প্রসঙ্গে ৪।২৬ শ্লোকে বর্ণিত 'সংযমাগ্নিষু জুহবতি'-শব্দগুলির প্রামাণিক আলোচনায় স্বামীজী মহারাজ ঐ প্রসঙ্গে মধুসূদন সরস্বতীর ব্যাখ্যাকেই বিশেষভাবে গ্রহণ ক'রে সে'দিন বলেছিলেন : 'কিন্তু 'সংযম' কাকে বলে? 'সংযম'-শব্দের ডিক্‌সেনারী (আভিধানিক) অর্থ নিয়ন্ত্রণ, নিয়মন, নিগ্রহ, দমন (ইন্দ্রিয়সংযম), রোধ, নিরোধ, ব্রতাদির পূর্বদিন করণীয় উপবাসাদি সংযম পালন করা ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি। কিন্তু যোগশাস্ত্রে ও অধ্যাত্মজীবনের ক্ষেত্রে সংযম অর্থে ইন্দ্রিয়সংযম বা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি বোঝায় এবং এ'প্রসঙ্গে ব্রহ্মচর্যাদি পালন প্রভৃতিও বোঝায়। কিন্তু আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর ব্যাখ্যা ও আলোকপাত এ'প্রসঙ্গে অতুলনীয়। তিনি ভাষ্যে বলেছেন : 'ধারণা-ধ্যানং সমাধিরিতি ত্রয়মেকবিষয়ং সংযমশব্দোনাচ্যতে' ; অর্থাৎ সংযম অর্থে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির লক্ষ্য ও করণীয় কর্তব্য এক রকম বিষয়ক হলে তাকেই সংযম বলে। ঋষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে বলেছেন : 'ত্রয়মেকত্র সংযমঃ' ইতি। মোটকথা ধারণা, ধ্যান ও সমাধি একবিষয়ক হওয়া চাই'

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'একত্র বিষয়ক' বলতে কি বোঝায় মহারাজ ?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'কৈবল্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞানলাভবিষয়ক হওয়া চাই। ধারণার উদ্দেশ্য ধ্যানাবস্থায় উপনীত হওয়া ও ধ্যানের উদ্দেশ্য সমাধি লাভ করা এবং মনের পারে চৈতন্যসাগরেডুব দিয়ে এক হওয়া। তাই এক হওয়ার অর্থ এখানে হবে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এ' তিনটি সাধনার একই উদ্দেশ্য ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করা'।

পরে স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'কিন্তু মধুসূদন সরস্বতী এ'কথা বলেই তার বক্তব্য শেষ করেন নি। তিনি ধারণা, ধ্যান, সমাধির প্রকারভেদ, মনের ক্ষিপ্তাদি বিচিত্র অবস্থা ও তাদের নিগ্রহ বা স্থিরীকরণপ্রচেষ্টা, চিত্তভূমির লয় ও বাধ এ'ত্বটি সমাধির অবস্থার কথাও বলেছেন 'সংযম'-কথাটিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, কেননা আমরা সাধারণত সংযম বলতে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা ইন্দ্রিয়সংযম বুঝি, কিন্তু সংযমের আসল অর্থ কৈবল্য বা কেবলভাব-রূপ ব্রহ্মসমাধিতে চরমজ্ঞান লাভ করা'।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'মহারাজ, 'ধারণা'-শব্দের পরিবর্তে গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে 'প্রত্যাহার' শব্দ-ব্যবহার করা হয়েছে; তাহলে ধারণা ও প্রত্যাহার-শব্দত্বটির অর্থ কি এক ?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'অর্থ ও অভিপ্রায় একই, তবে উভয়ের করণীয় পদ্ধতির ধারা হয়তো একটু ভিন্ন হতে পারে। গীতার ঐ ৪।২৬ শ্লোকের ভাষ্যেই মধুসূদন সরস্বতী স্পষ্টভাবে বলেছেন: 'শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি তানি শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত 'অন্যে' প্রত্যাহারপরাঃ'। শ্রীধর-স্বামী 'অন্যে' বলতে 'গৃহস্থাঃ' বলেছেন। 'সংযমাগ্নিষু' ধারণা-ধ্যান-সমাধিরিতি ত্রয়মেকবিষয়ং সংযমশব্দে-নোচ্যতে', অর্থাৎ শ্রোত্র প্রভৃতি যে জ্ঞানেন্দ্রিয়—সেগুলিকে শব্দাদি বিষয়সকল থেকে প্রত্যাহৃত ক'রে বা ফিরিয়ে এনে তাদেরকে

গ্রহণে সুযোগ না দিয়ে প্রত্যাহাররূপ যোগাঙ্গবিষয়ের অনুষ্ঠানে যত্ন করা উচিত। সুতরাং প্রত্যাহার বা প্রতি+আহার-রূপ calling back effort. চঞ্চল ও অস্থির মনকে বারবার একই কেন্দ্রে বা লক্ষ্যে স্থির করার চেষ্টা একই রকমের'।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'এরপর মধুসূদন সরস্বতী ধারণা, ধ্যান ও সমাধি কাকে বলে তাদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন : (১) 'তত্র হৃৎপুণ্ডরীকাদৌ মনসশ্চিরকালস্থাপনং ধারণা', (২) 'এবমেকত্র ধৃতস্য চিত্তস্য ভগবদাকারবৃত্তিপ্রবাহোঽন্তরান্তরান্যাকারপ্রত্যয়ব্যবহিতো ধ্যানম্', (৩) 'সর্বথা বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ সমাধিঃ'। অর্থাৎ (১) হৃদয়পদ্মে চঞ্চল মনকে বারবার চেষ্টা ক'রে বহুক্ষণ ধরে রেখে স্থির করার নাম ধারণা; (২) এরূপ স্থির মনকে বা চিত্তকে একটি স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার পর যে ভগবদাকার অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারা সৃষ্টি হয় তাকে ধ্যান বলে, এবং (৩) সকল ভিন্ন ভিন্ন বিজাতীয় জ্ঞানধারাকে দূর ক'রে সজাতীয় জ্ঞানধারায় স্থির অচঞ্চলভাবে অবস্থানের নাম সমাধি এরপর তোমরা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকের মধুসূদন সরস্বতীর ভাষ্যটি নিজেরা পড়ে দেখবে লয়পূর্বকসমাধি ও বাধপূর্বকসমাধি কাকে বলে। লয়-সমাধিতে চৈতন্যমাত্র জ্ঞান থাকে, কেননা তখন 'তত্ত্বমসি'-মহাবাক্য বিচার করার জন্য মন সম্পূর্ণভাবে সংস্কারবিহীন হয় না। তাই পুনরায় ব্যুত্থান হ'তে পারে, কিন্তু বাধসমাধিতে আর ব্যুত্থান হয় না, তবে দ্বৈতজ্ঞান বা অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে দূর হয়। এজন্য লয়সমাধি যোগের ও বাধসমাধি বেদান্তের সাধনে সিদ্ধ হয়। বাধসমাধিসম্বন্ধে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন : 'পুনরুত্থানাভাবান্নির্বীজো বাধপূর্বকঃ সমাধিঃ'। সেজন্য 'সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি'-শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মধুসূদন সরস্বতী পরিশেষে বলেছেন : 'এতাদৃশো য আত্মসংযমরূপো যোগঃ স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানদীপিতে জ্ঞানং

বেদান্তবাক্যজন্যো· ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারস্তেনাবিদ্যাতৎকার্যনাশাদ্বারা দীপিতে অত্যন্তো জ্বলিতে বাধপূর্বকে সমাধৌ সমষ্টিলিঙ্গশরীরমপরে জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ'। এরই নাম জ্ঞানযজ্ঞ। জ্ঞানযজ্ঞকে ব্রহ্মযজ্ঞও বলে, কেননা তখন সবই ব্রহ্মময়—'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্, ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্'। মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন: 'ব্রহ্মদৃষ্টিরের· চ সর্বযজ্ঞাত্মিকেতি স্তূয়তে'।

(তৃতীয়াংশ)

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী মহারাজ আবার বল্লেন: 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে মহামায়াতত্ত্ব, তাই শক্তিতত্ত্ব। শক্তি বা Divine Energy'. এই dynamic divine Energy (ক্রিযাচঞ্চল শক্তি) বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—আকাশে-বাতাসে, পৃথিবীতে, সাগরে, গ্রহে-উপগ্রহে, সূর্যে-চন্দ্রে-নক্ষত্রে, জীব-জন্তু সকলে। শক্তিই প্রাণের অভিব্যক্তি। বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে শক্তিরূপে মহাপ্রকৃতি ছিলেন। সেই মহাপ্রকৃতিই শ্রীশ্রীচণ্ডীর মহামায়া বা চিতিশক্তি—

> চিতিরূপেণ বা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

চিতিশক্তিই বিদ্যা ও পরমাভগবতী—'বিদ্যাপি সা ভগবতী পরমা হি দেবী'।

আমরা সকলে অফিস-ঘরে স্বামীজী মহারাজকে কেন্দ্র ক'রে বসে আছি। মহারাজ শক্তিই যে বিশ্বসৃষ্টির কারণ সে' সম্বন্ধেই বলতে লাগলেন। তিনি বল্লেন: 'কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—যা-কিছু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেখছো সমস্তই শক্তির কম্পন থেকে সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে—'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং তদা এজতি নিঃসৃতম্'। 'এজতি' বলতে কম্পতে। শক্তিরই কম্পন ও বিচ্ছুরণ। প্রাণীদের দেহে

কুণ্ডলিনীশক্তি, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অব্যাকৃতশক্তি—অব্যাকৃতি। অব্যক্ত ও ব্যক্ত দুটিই শক্তির দুই অবস্থা—একটি unmanifested, আর অপরটি manifested. মানুষের ও সকলপ্রাণীরদেহে মূলাধারে basic Energy কুণ্ডলিনীশক্তি, আর সমগ্র সৃষ্টিতে promordial Energy. অব্যক্ত— অব্যাকৃতি বা প্রকৃতি। এই অব্যক্ত মহামায়াশক্তির সাহায্য নিয়েই সগুণ-ব্রহ্ম বিরাটরূপ বিশ্ববৈচিত্র্য রচনা করেন। তিনি মায়াতীত বিশুদ্ধচৈতন্য হয়েও মায়ার আশ্রয় নিয়ে ঈশ্বর হন। তিনি হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা হন, আবার বিরাট বা বিশ্বচরাচর হন। মায়াশক্তিই বৈচিত্র্যের কারণ। এই মায়াশক্তি বা বিশ্বপ্রকৃতি ব্যক্ত ও ক্রিয়াশীল হলেই কম্পনের আকারে বিশ্বসৃষ্টি করেন সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর-রূপে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : 'মহারাজ ঈশ্বরই তো স্রষ্টা, মায়া বা মায়াশক্তি সৃষ্টি কর্মের সহকারিণী সৃষ্টিকারিণী শক্তি ; সুতরাং স্রষ্টা বলতে আমরা ঈশ্বর বা পরমেশ্বরকেই বুঝি'।

স্বামীজী মহারাজ হেসে বল্লেন : 'তোমরা যা বলছো—তাও ঠিক, আবার আমি যা বলছি—তাও ঠিক। শক্তিরই অবতার। শক্তিতেই দুই, পার্থক্য বা বৈচিত্র্য। অদ্বৈতবেদান্ত বলে : 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্'—ব্রহ্ম অখণ্ড চৈতন্যরূপে এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু একসত্তা দুই বা দ্বিতীয় হয় মায়ার স্পর্শ থাকে ব'লে। মায়ার স্পর্শ সর্বাতীত তুরীয়-ব্রহ্মে থাকে না। সৃষ্টিকর্মের জন্য 'খাদ-রূপ' মায়ার প্রয়োজন হয়। ব্রহ্ম খাঁটিসোনা, আর মায়া খাদ। এই মায়াকেই শক্তি বলতে পারো। মায়া বা মায়াশক্তি আছে বলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, নচেৎ একই সত্তা, দু'য়ের কোন প্রশ্নই নাই। অর্থাৎ একই সত্তা স্বরূপে, বিরূপে দ্বৈতসত্তা'।

বিজ্ঞানও শক্তি ও তার কম্পন স্বীকার করে। বিজ্ঞানে শক্তি energy, আর শক্তির vibration। বা কম্পন energy বা শক্তির ব্যক্ত ও কার্যাবস্থা। বিজ্ঞান বলে পৃথিবীও একটি গ্রহ এবং তা'

নীহারিকাপুঞ্জ বা নেবিউলা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। নিউটন, হেল্মহোজ, লর্ড কেলভিন, ম্যাক্সওয়েল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, গতি বা movement, অর্থাৎ energy বা শক্তির কম্পন থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি—'a movement to interpret the whole material universe as a machine, a movement which steadily gained force until, its culmination in the latter half of the nineteenth century.... বলেছেন বৈজ্ঞানিক জিন্স। ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক, আইনিষ্টাইন, হাইজেনবর্গ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বসৃষ্টির আরও নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন নূতন নূতন আবিষ্কারের উদাহরণ দিয়ে'।

'কিন্তু সে যাইহোক', স্বামীজী মহারাজ বল্লেন, 'শক্তি যে বিশ্বসৃষ্টির কারণ—একথা কেউ অস্বীকার করেন নি। Force বা শক্তি না হলে গতির (motion) সৃষ্টি হয় না। তোমরা যাকে ছায়াপথ বা Milky Way বলো—সেটা কোটি কোটি নক্ষত্রের সমাবেশের পরিণতি ছাড়া অন্য-কিছু নয়। প্রবল ঝড়ের মতো ঘূর্ণায়মান energetic সেই সব নক্ষত্র, আর তাদের থেকেই প্রচণ্ড বেগে কত শত গ্রহ-উপগ্রহেরসৃষ্টি হযেছে ওহচ্ছে। নেউলাবিগুলোই (nabulae) শক্তিরআধার ওগ্রহ-উপগ্রহ-সৃষ্টির কারণ। বৈজ্ঞানিক জিন্সবলেছেন: 'Each nebula contains some thousands of millions of stars. About two millions such nabulae can be photographed in all, and, therefore, probably millions of others beyond the range of any telescope'.

'মহাকাশে নক্ষত্রগুলোকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় তারা কাছে কাছে একসঙ্গে আছে, কিন্তু তা নয়, একটি থেকে আর একটি নক্ষত্রের দূরত্ব অনেক বেশী। অনন্ত অসীম আকাশ, তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার সীমা নাই। নক্ষত্রগুলো ভীষণ বেগে মহাশূন্যে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। স্যার জিন্সের কথায়ই বলি : "This vast multitude of stars are wandering about in space. A few form groups which journey in company, but the majority are solitary travellers And they travel through a universe so spacious that it is an event of almost unimaginable rarity for a star to come anywhere near to another star. For the most part, each voyages in splendid isolation, is like a ship on an empty ocean'.

তারপর স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'এই যে পৃথিবী, এটাও একটা গ্রহ, বরং সকলের আয়তনে চাইতে ছোট গ্রহ। এটিরও জন্ম একটি Nebula বা নীহারিকা থেকে। পৃথিবীগ্রহটিও অনবরত ঘুরছে মহাশূন্যে। চারদিকেই এর বিরাট শূন্যস্থান। সুতরাং ভেবে দেখ আকাশের আয়তন কত বড় ও সীমাহীন। পৃথিবীগ্রহের চেয়ে অনেক বড় বড় গ্রহও মহাশূন্যের চারদিকে প্রবল গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে'।

আমরা বিস্ময়ে শুনছি। স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি নক্ষত্র এক-একটা নেবিউলাকে সৃষ্টি করে। বহু দূরে ঐসব নেবিউলা আকাশের স্থানে স্থানে বিস্তৃত রয়েছে। স্যর জিন্স বলেছেন যে, ঐসব নেবিউলায় যেতে গেলে পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর লাগতে পারে, বরং তার বেশীও লাগে —'Takes 50 millions year to reach', আর ঐ সকল নেবিউলার বা নীহারিকার গতি প্রচণ্ড —এক সেকেণ্ডে পয়তাল্লিশ হাজার (৪৫,০০০) মাইল বেগে গতি'।

'এক একটা নক্ষত্রের আয়তনও বড় কম বড় নয়। তারা এক একটা পৃথিবীর চেয়েও আয়তনে বড়। দূরত্বের তো কথাই নাই। সার জেমস্ জিন্স বলেছেন যে, মহাকাশে ছড়ানো অর্থাৎ বিস্তৃত নীহারিকাদের সৃষ্টি করে—এইসব নক্ষত্রগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা

দুঃসাধ্য : "And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashore of the world"; অর্থাৎ সমুদ্রসৈকতে ছড়ানো সংখ্যাতীত বালুকণার মতো অসংখ্য নক্ষত্র সমগ্র মহাকাশে বিস্তৃত রয়েছে, সুতরাং গণনা ক'রে তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য'।

তারপর তিনি বল্লেন : 'এক-একটা নক্ষত্র ও গ্রহ থেকে আলোক (light) আসতে কত কত হাজার বছর লাগে। আলোর গতি এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। (১৮৬,০০০), সুতরাং ভেবে দেখ depth and length (গভীরতা ও দৈর্ঘ্য) আকাশের কতটা অসীম অনন্ত। সুতরাং মহাশূন্য এই আকাশ। মহাশূন্যই বা বলি কেন? কত সহস্র, কোটি কোটি গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র এই আকাশের অসীম space-এ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমাদের দৃষ্টির অতীতেও অসংখ্য নক্ষত্র আছে, তাদের দৃষ্টিপথে আসতে হয়তো হাজার হাজার বছর লাগবে। তারপর সূর্য, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শনি প্রভৃতি গ্রহ। তিলার্ধ জায়গা নাই আকাশে, অথচ কোনটার সঙ্গে কোনটারই সংঘর্ষ হচ্ছে না। কক্ষ ও গতিপথ ছেড়ে অন্যের কক্ষে ও গতিপথে প্রবেশ ক'রে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে না তারা। প্রকৃতির এমনই অদ্ভুত সৃষ্টি ও নির্মাণকৌশল। সার জেমস্ জিন্স মহাশূন্যতারূপ আকাশের রহস্যকথার পরিচয় দিয়েছেন দেশ ও কালের বিবরণ দিয়ে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সওয়েল প্রথমে ও পরে আবার ম্যাক্সওয়েল ও ফ্যারাডে দু'জনে আলোকের গতি-অনুসারে আকাশের অসীমতা কত তার পরিচয় দিয়েছেন। পরে আইনিষ্টাইন, ওয়াইটহেড, সালিভ্যান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানের অনেক-কিছু তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করেছেন—যা বিস্ময়কর ও কৌতুহলজনক।

এখন চিন্তা করো—বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিকৌশলের বাহাদুরী আছে। তিনি মহতো মহীয়ান্'।

'এখন হটাৎ বিজ্ঞানের আলোচনা নিয়ে তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম কেন বলোদেখি ?'

আমরা বল্লাম 'কেন মহারাজ ?' স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'আকাশের vast empty space বা বিরাট শূন্যতা—তার একটা ধারণা আমাদের সকলের মধ্যেই থাকা উচিৎ। উচিৎ এজন্য যে, আমরা সীমাশূন্য অসীম কোন বৃহৎ বস্তুর বা মহতের ধারণা সহজে করতে পারি না, আর পারি না ব'লে যখনই বেদান্তদর্শনে পাড় 'ব্রহ্ম'-শব্দ, তখনই তার ধারণা করতে চেষ্টা করি দেশ-কাল-কারণের সীমায় আবদ্ধ ক'রে। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মকে তুলনা করা হয়েছে আকাশের সঙ্গে। বলা হয়েছে : 'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যম্'। প্রকৃতপক্ষে সীমাশূন্য আকাশকে দেশ ও কাল দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ব্রহ্মও বস্তুত তাই। ব্রহ্মকে এজন্যই বলা হয়েছে সীমাশূন্য বিশাল ব্যাপক অথচ সর্বগত চৈতন্য। তোমাদের অনেকবার পূর্বেও বলেছি যে, দিক্‌দিগন্তহীন আকাশকে সর্বগত বলা হয়েছে, আবার সর্বাতীত বলা হয়েছে। সর্বব্যাপক ব্রহ্ম তাই অসীম, আবার সীমাযুক্ত সসীম। এখানে contradiction বা বিরোধের ভাব আছে, আবার নাই। তিনি নিকটে, আবার দূরে বলা হয়েছে—'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে'। এ'সকলকে অপাতবিরোধী, আবার বিরোধহীন অবিরোধী বলা হয়েছে। একমাত্র সর্ববিস্তারী ও সর্বাবভাসক চৈতন্যকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে। বিজ্ঞানে যে আকাশের vastness বা অসীমতার কথা বলা হয়েছে, সেই অসীমতা অথচ অখণ্ডতা আছে বেদান্তের ব্রহ্মের। বেদান্তের ব্রহ্মের এই অসীমতা অথচ অখণ্ডতার ধারণা করার জন্যই তোমাদের কাছে আজ বিজ্ঞানের কথা বল্লাম, নইলে বিজ্ঞানের যেকোন বই পড়লেই তো

বিজ্ঞানের কতো কথা তোমরা এর চেয়েও বেশী ক'রে জানতে পারো'।

স্বামীজী মহারাজ পরিশেষে বল্লেন : 'বেদান্তে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে ধারণা কিন্তু চৈতন্যের অসীমতার ধারণা। আবার তিনি (ব্রহ্ম) সসীম হয়ে সীমার মাঝেও ধরা দেন। যেমন অবতার। ঈশ্বরের অবতাররা অসীম, আবার সসীম। মানুষের ব্যষ্টিচেতনা হলেও ব্রহ্মচৈতন্য ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টিচৈতন্য হয়েও ধরা দেন—'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' —পূর্ণ থেকে পূর্ণের অংশ নিলে পূর্ণই থাকে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্র অখণ্ডচৈতন্যসত্তা আছে এবং সেই চৈতন্যসত্তাই ব্রহ্ম। বৃহৎ, ব্যাপক, বিরাট, অনন্ত, অসীম, অখণ্ড—এই সব শব্দ বা বিশেষণ দিয়ে ব্রহ্মের অসীমতা ও ব্যাপকতাকে (ব্যাপকসত্তাকে) বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে বেদান্তে। এই ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হলেই মানুষ তার খণ্ড ও সসীম সত্তারূপ অজ্ঞানতা ও বন্ধনের পারে যেতে পারে। সীমা ও বিছিন্নতাই অজ্ঞান, আর অসীমতা ও অবিচ্ছিন্নতাই জ্ঞান। ব্রহ্ম জ্ঞানসমুদ্র—সীমাহীন, আবার ব্যষ্টি-চেতনায় সসীম। একথা বোঝানোর জন্য বেদান্তে বিজ্ঞান বা ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের কথাও বলা হয়েছে—'ব্রহ্মবিজ্ঞানমিচ্ছতি'। এ' জ্ঞানই বিরাটের, আবার বিরাটত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাকে মুক্তির ইচ্ছা বলতে পারো। বেদান্ত এই ইচ্ছার পরিপূর্ণতাকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলেছে'।

পূর্বেই বলেছি এবং এখনও বলি যে, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের প্রতিটি আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বসম্ভারের সমাবেশ থাকতো। কি ইংরাজী, কি সংস্কৃত ও কি বাংলা-উদ্বৃতি (Quotation.) তিনি খুব দিতেন, এতটুকুও ভুল থাকতো না বা ব্যতিক্রম হত না তার উদ্ধৃতিতে। তাছাড়া হয়তো দু'টি, তিনটি বা চারটি বিষয়ের আলোচনা করতেন একই

দিনে একই সময়ে পর পর, হয়তো একটি আলোচিত বিষয়বস্তুর মিল থাকতো না অপরটির সঙ্গে, কিন্তু সর্বশেষে সকল-কিছুর সিদ্ধান্তে নিহিত তত্ত্বের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকতো সর্বদাই তাঁর আলোচনায়। অসাধারণ ও বহুমুখী ছিল তাঁর প্রতিভা, তাই একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করতেন সমগ্র প্রসঙ্গ ও আলোচনার মধ্যে একটি অখণ্ড সঙ্গতি রক্ষা ক'রে'।

॥ স্মৃতি : চৌদ্দ ॥

ইংরাজী ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তখন দার্জিলিঙে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আশ্রমে। বিখ্যাত 'নোবেল-প্রাইজ' (Nobel Prize)-প্রাপ্ত বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যর সি. ভি. রমণও তখন দার্জিলিঙে। তাঁর স্ত্রীও এসেছেন সঙ্গে বেড়াতে। তাঁর স্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও বিশেষভাবে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পরমভক্ত ও অনুরাগিণী ছিলেন। সেজন্য তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ-শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যখন দার্জিলিঙে আছেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করা কর্তব্য। স্যর সি. ভি. রমণ-পূর্ব থেকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত না থাকলেও লণ্ডনে ও আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অসামান্য কার্যাবলীর কথা তিনি শুনেছিলেন। পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারের কার্যে সাহায্য করার জন্য স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান পেয়ে ইংরাজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রথমে লণ্ডনে যান ও সেখানে প্রায় এক বৎসরকাল শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দকে বিভিন্ন কর্মে সাহায্য করার পর ইংরাজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় উপস্থিত হন। প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারকার্যের শেষে ইংরাজী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে স্বামী অভেদানন্দ জাপান, হোনোলুলু প্রভৃতি দেশ হয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। মাঝে ইংরাজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ছ'মাসের জন্য একবার এসেছিলেন ভারতে। স্যর সি. ভি. রমণ এ'সব কথা সমস্তই শুনেছিলেন ও বিশেষ ক'রে ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচারকরূপে স্বামী বিবেকানন্দের পরই স্বামী অভেদানন্দের নামের সঙ্গে

পরিচিত ছিলেন। সেজন্যই তাঁর অন্তরের ইচ্ছা ছিল একবার স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে তিনি পরিচয় করেন।

সুতরাং বৈজ্ঞানিক সি. ভি. রমণ দার্জিলিঙে ভ্রমণ করতে এসে যখন লোকপরম্পরায় শুনলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ দার্জিলিঙে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামাঙ্কিত একটি ধর্মপ্রতিষ্ঠান দার্জিলিঙে আছে, তখন সেই আশ্রম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুবর্ণ-সুযোগ গ্রহণে ডক্টর রমণ বিশেষ আগ্রহী হন। পূর্বেই বলেছি যে, বিশেষ ক'রে তাঁর সহধর্মিণী মিসেস রমণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদা দেবীর একান্ত অনুরাগিণী ভক্ত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মিসেস রমণ দার্জিলিঙের ঠাণ্ডায় হটাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্যর সি. ভি. রমণ একাই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করার জন্য বেদান্ত-আশ্রমে এসে উপস্থিত হন।

দার্জিলিঙে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আশ্রমে আসার জন্য তখন দু'টি রাস্তা ছিল। এখনও তাই আছে। একটি রাস্তা দার্জিলিঙে রেলওয়ে-ষ্টেশনের সামান্য একটু পিছনে বামদিকে একটি ইটের সিড়িযুক্ত রাস্তা নীচে নেমে গেছে ও কিছুদূর গেলেই সামনে আশ্রমে প্রবেশের নিজস্ব রাস্তা—যেটি একেবারে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যেখানে অভ্যাগতদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন সেই ভিজিটারস্‌-রুমের ঠিক সম্মুখেই প্রসারিত, আর একটি আশ্রমের একেবারে নীচে যেখানে আশ্রমের দাতব্য-চিকিৎসালয় বা ডিসপেনসারী ও তার সম্মুখ দিয়ে 'ভিকটোরিয়া-ফলস্‌' (Victoria Falls)-এ যাওয়ার পথে বাঁমদিকে।

একদিন দেখি স্যর সি. ভি. রমণ ষ্টেশনের দিকের রাস্তা দিয়ে নেমে একেবারে স্বামীজী মহারাজ যে ঘরে সর্বসাধারণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন ঠিক সেই Visitors Room-এর সামনে দাঁড়িয়ে

আছেন। তিনি একাই এসেছিলেন, কেননা তাঁর স্ত্রী দার্জিলিঙের ঠাণ্ডায় হঠাৎ অসুস্থ হয়েছিলেন; আমরা তাঁকে ঠিক চিনতাম না। তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম তিনি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর সি. ভি. রমণ। আমরা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ইংরাজীতে বল্লেন: 'I have come to get *darshana* of Swami Abhedananda, My name is C. V. Raman. Can I get his *darshana*?' আমরা শশব্যস্তে তাঁকে সম্ভাষণ ক'রে অফিস-ঘরের দরজাটি খুলে ভিতরে একটি চেয়ারে বসতে বল্লাম। পূর্বেই বলেছি যে, ঐ ঘরের দু'দিকেই অনেকগুলি সারিসারি চেয়ার পাতা ছিল এবং সামনের একেবারে দক্ষিণ দিকের সারির শেষে স্বামীজী মহারাজের বসার একটি বেতের চেয়ার ও ছোট টেবিল পাতা ছিল ও টেবিলের উপরে বিভিন্ন ফুলে-ভরা একটি ভাস্ ছিল। দার্জিলিঙ ফুলের দেশ, সুতরাং দার্জিলিঙের ছোট-বড় সকল শ্রেণীর লোকদের ঘরে, বিভিন্ন অফিসে, দোকানে ও প্রায় সর্বত্রই ফুল দিয়ে সাজানো সব টব বা ভাস্ ছিল। স্যর রমণ একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করলে স্বামীজী মহারাজকে খবর দেওয়া হ'ল স্যর সি. ভি. রমণের নাম বলে। স্বামীজী মহারাজ টিফিন (Tiffin) করছিলেন তখন, কারণ সকাল তখন ন'টা। স্বামীজী মহারাজ স্যর সি. ভি. রমণের নাম শুনে বল্লেন: 'ওঁকে আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলো, আমি টিফিন সেরেই যাচ্ছি। এর মধ্যে আমাদের (দার্জিলিঙ) আশ্রম, ঠাকুর ঘর প্রভৃতি ঘুরিয়ে দেখাও'।

আমরা সে'রকমই করলাম। স্যর সি. ভি. রমনকে জানালাম: 'স্বামীজী মহারাজ টিফিন করছেন, আধঘণ্টা পরেই তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন'। স্যর রমন শুনে বল্লেন: 'নিশ্চয়ই, আমি অপেক্ষা করছি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎশিষ্য, মহাপণ্ডিত। আমেরিকায় তাঁর প্রচারকার্যের কথা শুনেছি, কিন্তু দেখা করার

সৌভাগ্য আর ঘটে নি'। সমস্ত কথাই তিনি ইংরাজীতে বল্লেন। আমরাও তাঁকে জানালাম যে, স্বামীজী মহারাজের ইচ্ছা—আপনি আমাদের দার্জিলিঙ-আশ্রমটি ঘুরে একটু দেখুন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরও দেখুন'। স্যার রমণ সসম্ভ্রমে বল্লেন : 'চলুন, নিশ্চয়ই'। আমরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমের বিভিন্ন স্থানগুলি দেখিয়ে নীচে মন্দিরে নিয়ে গেলাম। নীচে কথার অর্থ আমাদের দার্জিলিঙের সমগ্র আশ্রমটি কয়েকটি বড় পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একেবারে উপরে 'নিবেদিতা-বিল্ডিঙ'। সিস্টার নিবেদিতার নামে বিল্ডিংটির নামকরণ করেছিলেন স্বামীজী মহারাজ নিজে। তার ঠিক নীচে কিছুটা দূরে স্বামীজী মহারাজের থাকার ঘর, রান্নাঘর, ভিজিটার্স-রুম প্রভৃতি। স্বামীজী মহারাজের ঘরের নীচে আশ্রমবাসী সাধু-ব্রহ্মচারীদের থাকার ঘর, রান্নাঘর, সাধু-ব্রহ্মচারীদের খাবার ঘর। তার কিছুটা নীচেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির—সমস্তটাই কাঠের তৈরী।[১] তার ঠিক নীচে আবার তিনতলা-বিল্ডিঙ যাতে—সাধু-ব্রহ্মচারীদের থাকার ঘর। ঠিক তার নীচে চ্যারিটেবিল ডিস্‌পেন্সারী (Charitable Dispensary)। সকলের পাশ দিয়ে বারাণ্ডা দেওয়া একটি কঙক্রিটের রাস্তা নীচে-পর্যন্ত গেছে। ঐসব বিল্ডিঙসের ব্যবধানে বিভিন্ন ফুলের সারি সারি গাছ টবে সাজানো—বাগান বলা যেতে পারে। একেবারে নীচে ডিসপেন্সারীর সামনে দিয়ে 'ভিক্টোরিয়া-ফলস্'-এ যাওয়ার উঁচু-নীচু রাস্তা চলে গেছে—যে রাস্তাটি দার্জিলিঙের বাজার থেকে ঘুরতে ঘুরতে নেমে এসেছে 'জুবিলি-স্যানিটোরিয়াম'-এর পাশ দিয়ে। কাছেই গর্ভনমেণ্ট-কলেজ।

ইতিমধ্যে স্যর সি. ভি. রমণকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমের মোটামুটি দ্রষ্টব্যস্থানগুলি ও মন্দিরটি দেখানো শেষ হয়েছে। মূলমন্দিরের সামনে নাটমন্দিরের মতো কাঠেরই একটি ছোট দালান ও সেখানেই

১। বর্তমানে সেটি কঙ্‌ক্রিটের দু'তালা মন্দির।

স্তোত্রাদি পাঠ, ধর্মীয় ক্লাস, ভজনসঙ্গীতাদির অনুষ্ঠান হয়। স্যর রমণ নাটমন্দিরে প্রবেশ ক'রেই মূলমন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদা-দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেখে হাত তুলে নমস্কার করলেন ও বল্লেন: 'Very peaceful atmosphere' (ভারী শান্তিপূর্ণ পরিবেশ)। তখন প্রায় আধঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি স্যর রমণকে নিয়ে আমরা স্বামী মহারাজের ভিজিটার্স-রুমে নিয়ে এলাম ও তাঁকে বসিয়ে স্বামীজী মহারাজকে সংবাদ দিলাম।

স্বামীজী মহারাজ ইতিমধ্যেই টিফিন সেরে স্যর রমণের সঙ্গে দেখা করার জন্য তৈরী হয়ে বসে আছেন। আমরা স্বামীজী মহারাজের ঘরের ভিতরে গিয়ে জানালাম যে, আশ্রমের মন্দির ও মোটামুটি দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখানো হয়েছে ও এখন ভিজিটার্স-রুমে স্যর রমণ অপেক্ষা করছেন। স্বামীজী মহারাজ ভিজিটার্স-রুমে প্রবেশ ক'রেই হাত তুলে নমস্কার ক'রে স্যর রমণকে সম্ভাষণ জানালেন এবং স্যর রমণও শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে জোড়হাতে স্বামীজী মহারাজকে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানালেন।

স্বামীজী মহারাজ তখন নিজের চেয়ারে বসে স্যর রমণকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন: 'I am very glad to meet you. I have heard your name and the great reputation for the Noble Prize, you have owned. You have done a noble work in the field of Science, and I believe that the world will remember your great service and name' ('আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে অত্যন্ত খুসী হয়েছি। আমি আপনার নাম ও 'নোবেল-প্রাইজ' পাওয়ার সুখ্যাতির কথা শুনেছি। আপনি বিজ্ঞানের জগতে অভূতপূর্ব এক অবদান দিয়েছেন—যেজন্য

আমি বিশ্বাস করি যে, বিশ্বসমাজ আপনার মহান্ দানের কথা ও আপনার নাম স্মরণে রাখবে')।

স্যর সি. ভি. রমণ কৃতজ্ঞতা-সহকারে বল্লেন : 'It is your blessings' ('এ' আপনার আশীর্বাদ')। সামান্যক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর স্যর রমণ পুনরায় বল্লেন : 'My wife was very eager to get a *darshana* of you, but she has been caught cold for the dampy weather of Darjeeling, and so she failed to come to see you. She is a devotee of Ramakrishna Paramahansa, and especially of Sri Sri Sarada Devi. She daily performs the *pujās* of Sri Ramakrishna and Sri Sarada Devi ('আমার স্ত্রীও আপনার দর্শনলাভের জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলেন, কিন্তু দার্জিলিঙের ঠাণ্ডায় তিনি সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছেন ব'লে আসতে পারলেন না। আমার স্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং বিশেষ ক'রে শ্রীসারদাদেবীর একান্ত অনুরাগী ও ভক্ত। তিনি প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর পূজা-অর্চনা করেন)।

স্বামীজী মহারাজ শুনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন এবং বল্লেন পরে একদিন তাঁকে (রমণের স্ত্রীকে) আশ্রমে নিয়ে আসতে। স্যর রমণ জোড়হাতে সসম্ভ্রমে বল্লেন : 'Yes, certainly. But unfortunately, tomorrow we are leaving Darjeeling' (হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে কালই আমরা দার্জিলিঙ ত্যাগ করছি)। এরপর সমস্ত কথাবার্তা উভয়ের মধ্যে ইংরাজীতে হলেও আমরা বাংলাভাষাতেই এখানে সমস্ত-কিছুর আলোচনা করি।

স্বামীজী মহারাজ তখন হাসতে হাসতে বল্লেন : 'আপনি এসেছেন—পরমসৌভাগ্য। ভারতের আপনি রত্ন। মুখোজ্জ্বল

করেছেন সমগ্র ভারতবাসীর 'নোবল্'-পুরস্কার লাভ ক'রে'। স্যর রমণ পূর্বের মতোই মাথা নত ক'রে বল্লেন: 'সমস্তই আপনাদের কৃপা। আমি অসময়ে এসে আপনার অমূল্য সময় বোধহয় কিছুটা নষ্ট করলাম?' স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'সেকি কথা। আপনি এসেছেন—এতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। ভবিষ্যতে আশা করবো যে, আপনার ভক্তিমতী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমাদের আশ্রমে আসবেন'। স্যর রমণ উৎফুল্লচিত্তে বল্লেন: 'অবশ্যই'।

একটু পরে পুনরায় স্যর রমণ ধীরে ধীরে বল্লেন: 'আমার স্ত্রী আমার চেয়েও অত্যন্ত ভক্তিমতী। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে অবতার—Incarnation of God—একথা বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমি সায়েন্স নিয়েই থাকি, সায়েন্স ছাড়া আর কিছুই জানি না। আমার বিশ্বাস যে, সায়েন্সই একমাত্র rational subject (একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ বিষয়)। এজন্য আমি সায়েন্সের ভিতর দিয়েই বিশ্বরহস্যের মূলতত্ত্ব জানতে চাই। আপনি কি বলেন?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'ঠিকই বলেছেন। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ—'the age of Science'. বিশ্বরহস্যের মূলতত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে বিজ্ঞানও। বিশ্বকারণ ঈশ্বরের কথাও বিজ্ঞান স্বীকার করে এবং আইনিষ্টাইন, এডিঙ্টন, ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক, স্যর জেমস জিন্স, হাইজেনবার্গ, স্যাল্লিভান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন প্রকারে বিশ্ববিকাশের মূলে যে ঈশ্বর বা God আছেন একথা বিশ্বাস করেন। একথা সত্য যে, বিজ্ঞানের মূলকথার সঙ্গে দর্শনের মূলকথার মোটেই বিরোধ নাই—'there is no contradiction between Science and Philosoply'. । বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক (Max Plank) ইঙ্গিতে সেকথা স্বীকারও করেছেন'।

স্বামীজী মহারাজ একটু চুপ ক'রে পুনরায় বল্লেন: 'আমি আমেরিকায় থাকতে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসনের

স্বামী অভেদানন্দ

সার সি ভি রমণ

টমাস এ-এডিসনের আবিষ্কৃত গ্রামোফোন-যন্ত্রের
নামাঙ্কিত ট্রেডমার্ক।
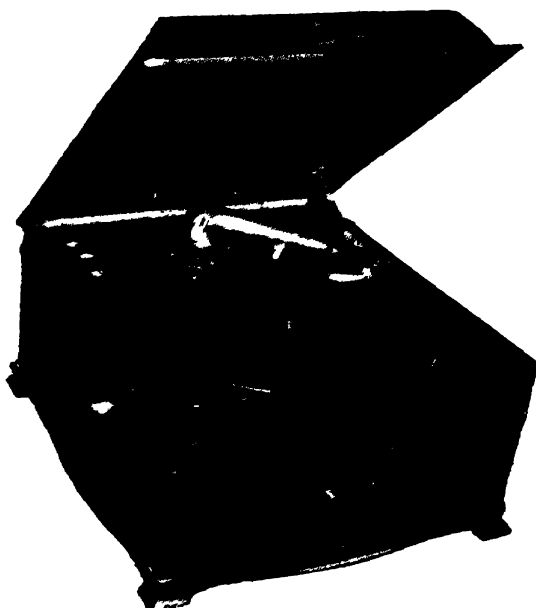
স্বামী অভেদানন্দকে টমাস এডিসন-প্রদত্ত
গ্রামোফোন-যন্ত্র (যদিও সেই পুরাতন
যন্ত্রটির অনেক-কিছু মেরামত করা হয়েছে)

বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক টমাস এ-এডিসন (আমেরিকা)

ভগবান যীশুখৃষ্ট (শিল্পী জিওটো-অঙ্কিত)

(১২৬৬-১৩৩৭)
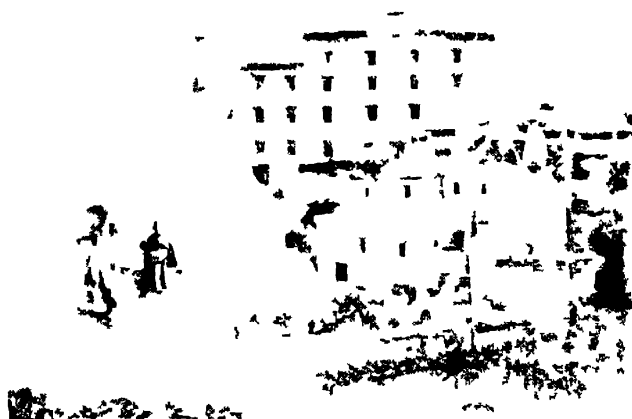
লামাউরু-গুম্ফা (লাদাক) (বহু প্রাচীন বৌদ্ধমঠ)
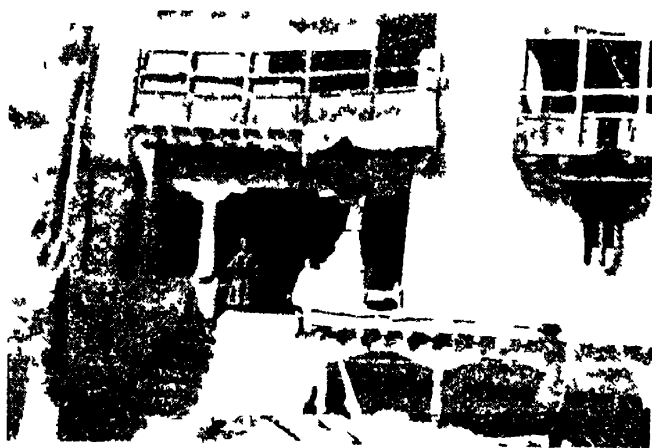
হিমিশ-গুম্ফা (লাদাক) (মন্দিরের দ্বারে স্বামীজী মহারাজ ও কোষাধ্যক্ষ-লামা)

স্বামী বিবেকানন্দ

(ধ্যানমূর্তি)

স্বামী অভেদানন্দ

(ধ্যানমূর্তি)
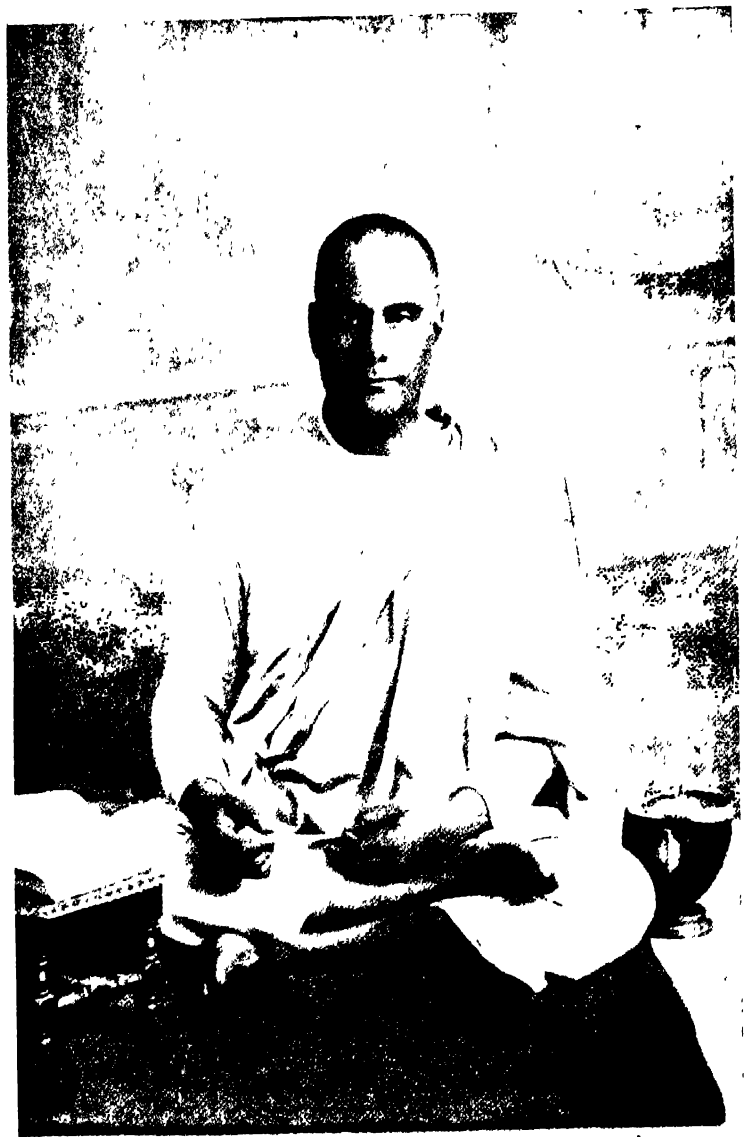
আচার্যবেশে স্বামী অভেদানন্দ

কলিকাতার রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের দোতলায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অফিস-রুম।

(স্বামীজী মহারাজ উপবিষ্ট)
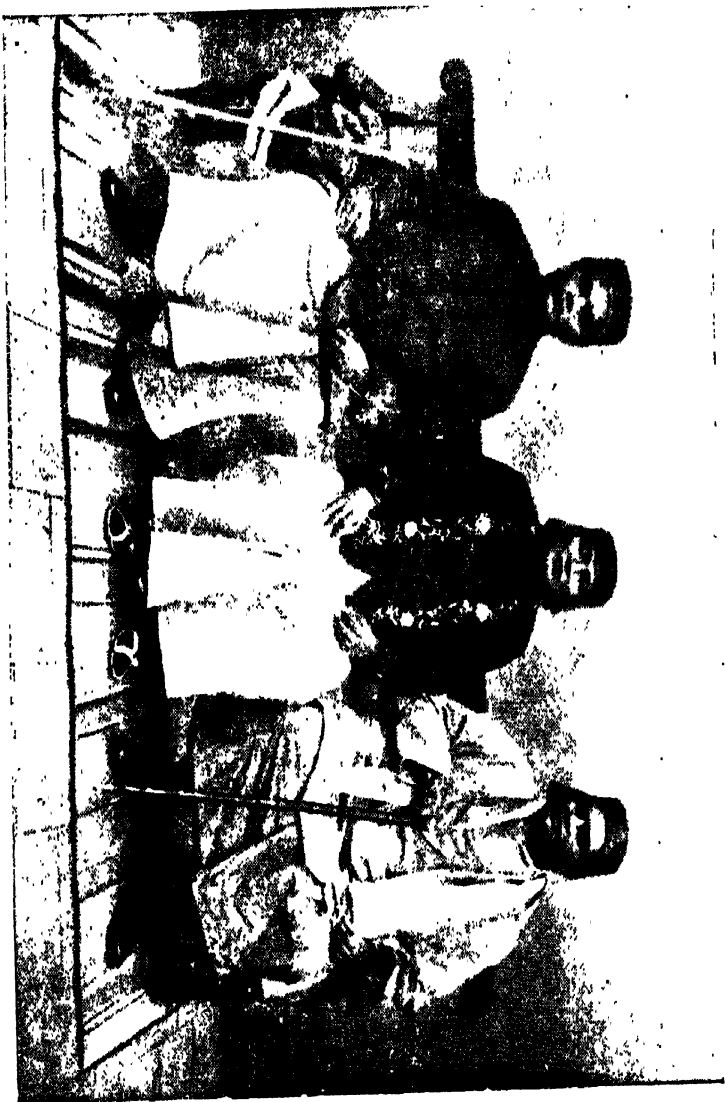
স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ (বেলুড় মঠে তোল

(Thomas A. Eddision) সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। একবার নয়—দু'বার। শ্রদ্ধেয় এডিসন বিজ্ঞানেব পরীক্ষা-নিরীক্ষা (keen observation) নিয়ে ডুবে থাকতেন। দেখলাম তিনি ধ্যানমগ্ন যোগীর মতোই সর্বদা আত্মসমাহিত হয়ে আছেন। খাওয়ার ও স্নান করার এতটুকু সময় নাই, সর্বদাই আত্মসমাহিত।[২] প্রতিদিন তাঁর ঘরের বাইরে খাবার রেখে দেওয়া হ'ত, কোনদিন খেতেন, কোনদিন খেতে ভুলে যেতেন। মহাযোগীর অবস্থা। Concentration (মনঃসংযম) তাঁর মধ্যে অসাধারণ। তিনি ছিলেন আত্মভোলা যোগীপুরুষ। আমি প্রথম দিন যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম তখন তিনি কোন একটা বিষয়ে absorbed হয়ে (ডুবে) ছিলেন, বহির্জগতের বিন্দুমাত্র হুঁশই ছিল না। তাঁর খাবার সে'দিন ঢাকা দেওয়া পড়ে ছিল। যাইহোক আধঘণ্টা প্রায় অপেক্ষা করার পর তাঁর হুঁশ এলো। আমাকে তাঁর লেবোরেটরী-ঘরের মধ্যেই বসতে দেওয়া হয়েছিল। তিনি আমাকে দেখে একটু মাথা নীচু ক'রে নমস্কার জানালেন। আমি আমার পরিচয় দিতে তিনি উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন : 'Oh, you are comming from India ? (ও, আপনি ভারতবর্ষ থেকে আসছেন ?)। আমি বল্লাম : 'আজ্ঞে হ্যাঁ'। ঠিক শুনতে পেলেন কিনা জানি না, কারণ তিনি কানে অত্যন্ত কম শুনতেন। বলা যায় তিনি সম্পূর্ণ বধিরই ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর অনেক কথা হ'ল লিখে। আমি তাঁকে তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিস্কার-সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে জিজ্ঞাসা করলাম। বৈদ্যুতিক আলোক, টেলিগ্রাফ, গ্রামোফোনযন্ত্র প্রভৃতি তিনিই আবিষ্কার করেছেন—যা বিশ্বে এক বিস্ময়ের বস্তু। এ'সব কথা লিখে দেখাতে ধীরে ধীরে তিনি হাসতে লাগলেন

২। প্রতিদিন ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা তিনি তাঁর লেবোরেটারীতে থেকে বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের বিষয় চিন্তা করতেন।

আমার দিকে চেয়ে। তাছাড়া সেদিন (সেই প্রথম দিন) 'বেদান্ত' সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হ'ল। সবই কিন্তু লিখে। তিনি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আর একদিন অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। পরে লিখে জানালেন যে, 'বেদান্ত'-সম্বন্ধে আরো-কিছু তিনি জানতে চান। আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম'।

স্যর রমণ উদ্‌গ্রীব হয়ে সকল কথা শুন্‌ছিলেন। স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'আর একদিন আমি শ্রদ্ধেয় এডিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। সে'দিন যাওয়া-মাত্র তিনি আমাকে সাদরে ভিতরে যেতে ও বসতে বল্লেন। আমি ভারতবর্ষের উদার ও সার্বভৌমিক দর্শনচিন্তা 'বেদান্ত'-সম্বন্ধে মূলকথা তাঁকে লিখে বল্লাম। তিনিও সানন্দে আমার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিলেন। বেদান্তের অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শকে তিনি অন্তরের সঙ্গে স্বাগত জানালেন। পরিশেষে তাঁর উদ্‌ভাবিত একটি গ্রামোফোনযন্ত্র আমায় উপহার দিলেন। আমি ভালবাসার দানরূপে সেটি গ্রহণ ক'রে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা তাঁকে জানালাম।[৩] গ্রামোফোনযন্ত্রটি আমি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ভারতে ফেরার সময়ে সঙ্গে নিয়ে আসি। তবে তার এখন অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, কারণ এদেশে (কলকাতায়) তাকে বিশেষভাবে আবার মেরামত করতে হয়েছে কিছু কিছু অংশ (parts) খারাপ হওয়ার জন্য। বলা বাহুল্য যে, টমাস এডিসনের অবিস্মরণীয় দান-রূপে এখনও আমার কাছে ঐ গ্রামোফোনযন্ত্রটি রক্ষিত আছে'।

স্যর সি. ভি. রমণ একথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লেন।

৩। টমাস এ. এডিসনের প্রদত্ত গ্রামোফোনযন্ত্রটির একটি আলোকচিত্র গ্রন্থে সংযোজিত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে এডিসনের গ্রামোফোনের ট্রেডমার্কের একটি চিত্র দেওয়া হ'ল।

তিনি বল্লেন : 'টমাস এডিসনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা বিশ্ববাসী কোনদিনই ভুলবে না'।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'ঠিকই বলেছেন। বিশেষ ক'রে আপনার সম্বন্ধেও তাই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনার অবদানের জন্য নোবেল-পুরস্কারই সে'কথা মানুষের মনে জাগরুক রাখবে'। স্যর রমণ স্বামীজীর কথা শুনে মস্তক অবনত ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাক্‌লেন।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'আপনি তো আমাকে প্রথমেই বল্লেন : 'You are a man of science' (আপনি বিজ্ঞানের লোক), science নিয়েই আপনার জীবনের চিন্তা। আর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি নিশ্চয়ই বলবো—'I am a man of philosophy' (আমি দর্শনশাস্ত্রের মানুষ), philosophy নিয়েই আমার জীবনের চিন্তা। কিন্তু একথা বল্লেও ঠিক বলা হ'ল না, কেননা যেমন দর্শনের চর্চা করি, তেমনি চর্চা করি আমি বিজ্ঞানের, শিল্পের, ইতিহাসের, ইংরাজী ও বাংলা-সাহিত্যের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের এবং আরও কত-কিছুর'।

স্বামীজী মহারাজ পুনরায় বল্লেন : 'ডক্টর রমণ, তার কারণ হ'ল বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের এবং দর্শনের সঙ্গে ধর্মের ও অপরাপর বিষয়ের ঐক্য ও সম্পর্ক যথেষ্ট। Science, philosophy and religion follow a process of continuity. Where science ends, philosophy begins, and where philosophy ends, religion begins, and religion is but a logical sequence to, and step ahead of, philosophy (বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম এ' তিনটি বিষয় একটি নিয়মবদ্ধ ধারাকে অনুসরণ ক'রে চলে। মোটকথা বিজ্ঞানের যাত্রাপথ যেখানে শেষ হয়, সেখান থেকেই দর্শন-শাস্ত্রের যাত্রাপথ আরম্ভ হয়, আবার দর্শনশাস্ত্রের যাত্রাপথ যেখানে

শেষ হয়, সেখান থেকেই ধর্মের যাত্রাপথের আরম্ভ হয়। আসলে ধর্ম দর্শনশাস্ত্রকেও অতিক্রম ক'রে। বরং বলা যায় ধর্ম দর্শনবৃক্ষের ফল)। সেজন্য বলি যে, বিজ্ঞানের যাঁরা পথযাত্রী, তাঁরা পরিশেষে দর্শন ও ধর্মের পথানুসারী অবশ্যই হন, কেননা বিজ্ঞানচিন্তার পরিপূরক হ'ল দর্শনচিন্তা ও ধর্মচিন্তা। অবশ্য একথাই আমি বিশ্বাস করি'।

ডক্টর রমণ ঘাড় নেড়ে স্বামীজী মহারাজের কথা স্বীকার করলেন।

স্বামীজী মহরাজ পুনরায় ডক্টর রমণকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন: 'কিছুক্ষণ পূর্বে আপনি বলেছেন যে, আপনি একজন man of science, আর আমি বলেছি আমি একজন man of philosophy. তার কারণ হ'ল বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে আদর্শগত বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের চলার পথ বা method of approaching হয়তো ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু চরম-আদর্শে ও লক্ষ্যে পার্থক্য নেই'।

স্যর সি. ভি. রমণ হাসতে হাসতে বল্লেন: 'Yes Swamiji, you are correct. There is a difference between the two in an ordinery sense, but in the ultimate analysis, there is no difference between the two, because both the subjects search after truth, which is fundamentally the same' (হ্যাঁ স্বামীজী, আপনি ঠিকই বলেছেন যে, সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন বলি, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য উভয়েরই সমান, কেননা উভয়েই 'একটা সত্য আবিস্কার করার জন্য চেষ্টা করে এবং ঐ সত্য উভয়ের দৃষ্টিতে সমান)।

স্বামীজী মহারাজ হাসতে হাসতে বল্লেন: 'তাহলে আপনি একজন পাকা-বিজ্ঞানী হয়েও তা স্বীকার করেন? বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স-

প্ল্যাঙ্ক তাঁর **Where the Science is Going On**-গ্রন্থে ঠিক ঐ কথাই স্বীকার করেছেন। অবশ্য তিনি বলেছেন যে, ভবিষ্যতের বুকে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্যসম্পর্ক স্থাপিত হবে—'there will be wedding between science and philosophy'। স্যর জেমস্ জিন্সের অভিমতও অনেকটা তাই'।[8]

---

[8] Let us discuss in this connection what *Physics and Philosophy* are from the chapter I of the book, 'Physics and Philosophy' (published from the Cambridge University Press in 1913), so as to throw some light upon this discussion. Sir James Jeans said :

"Both physics and philosophy had thus beginnings in those dim ages in which man was first differentiating himself from his brute ancestry, acquring new emotional and mental characteristics...physics tries to discover the pattern of events which controls the phenomena we observe, But we can never know what this pattern means, or how it originates ; and even if some superior intelligence were to tell us, we should find the explanation unintelligible. Our studies can never put us into contact with reality, and its true meaning and nature must be for ever hidden from us.

"Such is physics, but it is less easy to say what philosophy is ...while the workshop of the scientists is his laboratory, or perhaps the open field of the star-lit sky, that of the philosopher is his own brain. In whatever ways define science and philosophy, their territories are contignous ; wherever science leaves off-and in many places its boundary is ill-defined there philosophy begins...But the physicist can warn the philosopher

স্বামীজী মহারাজ পুনরায় বল্লেন: 'ধরুন, আপনারা বলেন আপনারা বৈজ্ঞানিক, আর আমরা বলি, আমরা দার্শনিক। প্রকৃতির রহস্যকে উন্মোচন করার জন্য আপনাদের প্রয়োজন লেবরেটরী (Leboratory) ও যন্ত্রপাতি অনেক-কিছু, কিন্তু আমাদের লেবরেটরী মন। আমরা মনকে সংযত ক'রে প্রকৃতির রহস্যকে জানার জন্য চেষ্টা করি, বা প্রকৃতির রহস্যের পারে যাওয়ার জন্য ইন্দ্রিয়সংযম, ধারণা, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করি। আপনাদের বিষয় হ'ল এ্যাটম, মলিকিউল, প্রোটন থেকে মোটামুটি ফোটন পর্যন্ত। কিন্তু এ'সব তো material things (পার্থিব বস্তু)। এদের পরিবর্তন আছে। All these are shifting or changing all the time (সকল সময়েই

in advance that no intelligible interpretation of the workings of nature is to be expected".

Further Sir James Jeans said: "The tools of science are observation and experiment; the tools of philosophy are discussion and contemplation. It is still for science to try to discover the pattern of events, and for philosophy to try interpret it when found". In conclusion, he said: "The general recognition of this (method of science) has brought philosophy into closer relations with science, and this approach has coincided with a change of views as to the proper aims of philosophy".

Prof. Werner Heisenberg also dealt with the same problems of science and philosophy, along with their mutual co-operation in his book, *Physics and Philosophy*, published in 1959 from Ruskin House, George Allen and Unwin Ltd, London.

এ'সকলের পরিবর্তন হচ্ছে)। এদের পরিবর্তে হয়তো many new elements may come। (অনেক-কিছু নূতন জিনিস বা উপাদান আসতে পারে)। কিন্তু আমাদের আত্মবিশ্লেষণের process-টা (প্রণালীটা) লক্ষ্য করুন। আমাদের মনের অনেক পরিবর্তন অবশ্যই আছে, কিন্তু মন যেখানে গিয়ে চৈতন্যরূপ লক্ষ্যে বা কেন্দ্রে গিয়ে স্থির হয়, তার কিন্তু পবিবর্তন নেই। আমাদের বেদান্তের চরমবস্তু সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের কিন্তু কোনদিনই পরিবর্তন হয় না। ব্রহ্ম চৈতন্যরূপে স্থির-ধীর, অবিনাশী ও শাশ্বত, কিন্তু বিজ্ঞানের চরমলক্ষ্য বস্তু প্রকৃতপক্ষে কি—এ' তত্ত্বের এখনো সম্পূর্ণভাবে মীমাংসা হয় নি। সেজন্যই বলি যে, বিজ্ঞান লক্ষ্যপথ ধরেই চলছে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছায় নি'।

'আর একটা কথা', স্বামীজী মহারাজ বল্লেন, 'যোগসাধনায় যে সমাধির কথা আছে, সেখানে পৌঁছুতে গেলে প্রথমে ধারণা ও ধ্যান concentration and meditation-এর প্রয়োজন। আপনাদের বিজ্ঞানেও তাই। বিজ্ঞানেরও আবিষ্কার নির্ভর ক'রে concentration and meditation-এর উপর, কেননা মন যদি স্থির ও শান্ত না হয়, তবে বিজ্ঞানে সত্যনির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং বেদান্ত ও বিজ্ঞানের মধ্যে তাহলে পার্থক্য কোথায় ? আমরা যখন আত্মার উপলব্ধির জন্য ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অভ্যাস করি, তখন আমরা জানি যে, ঐ সকল অভ্যাস আমাদের জাগতিক ও প্রাকৃতিক সকল ঘটনা ও কার্য-কারণ-রহস্যের পারে নিয়ে যাবে। সমাধি অবশ্য দু'রকম—সবিকল্প ও নির্বিকল্প, অর্থাৎ সবীজ ও নির্বীজ। 'বীজ' অর্থে সংকল্প বা মনেরবৃত্তি—modifications of the mind. সবিকল্প-রূপ সবীজ-সমাধিতে কিছুটা সংকল্প থাকে। একমাত্র মনের সকল বৃত্তি স্থির বা প্রশান্ত হয় মন যখন চৈতন্যে transformed (রূপান্তরিত) হয়। তখনই চিরপ্রকাশশীল আত্মাকে আমরা

উপলব্ধি করি। এই উপলব্ধি হ'লে তা থেকে আর কোনদিনই আমরা বঞ্চিত হই না। সেই অবস্থাকে আমরা বেদান্তীরা বলি মুক্তি—emancipation. আপনারাও বিজ্ঞানে বিচিত্র তথ্যের ও তত্ত্বের অনুশীলন ও উদ্ভাবন করেন ঐ একই যন্ত্রস্বরূপ ধারণা ও ধ্যানের সাহায্যে, কিন্তু একথা সত্য যে, চরম ও পরম-সত্যস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান বা Self-realization আপনারা ঠিক লাভ করতে পারেন না। কারণ আপনারা ধ্যানের পর সমাধির সাহায্য নিয়ে এক ও অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ আত্মাকে জানার ও পাওয়ার চেষ্টা করেন না,—যেজন্য বিজ্ঞান (Science) এখনও অসম্পূর্ণই (imperfect) বলতে হবে। বিজ্ঞান তাই আজও বিশ্বরহস্যের পারে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে না'।

স্যর রমণ তখন স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'আমি সাংখ্যের cosmology-কে (সৃষ্টিতত্ত্বকে) বৈজ্ঞানিক বলে অনেকটা বিশ্বাস করি। সাংখ্যে দু'টি তত্ত্ব বা পদার্থ—পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি সৃষ্টি করে পুরুষের সাহায্য নিয়ে, কিন্তু আপনাদের বেদান্ত সেকথা বিশ্বাস করে না। বেদান্ত সৃষ্টিকে মিথ্যা বা illusion ব'লে প্রমাণ করে। এ'সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'হ্যাঁ, এ'নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা ও বাদানুবাদ হয়েছে। তবে বেদান্ত সাংখ্যের সৃষ্টিপদ্ধতিকেই কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ব'লে স্বীকার করে। তবে সৃষ্টিকে বেদান্ত সত্য বলে না এজন্য যে, যা নানা আকারে পরিবর্তিত হয়, তা কখনও কোনদিন যথার্থ নিত্য ও সত্য হ'তে পারে না। আমাদের যোগ-শাস্ত্রেই দেখুন না—পতঞ্জলি বলেছেন: 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিঃ নিরোধঃ'। 'নিরোধ' বলতে সমাধি বা শান্তি—যেটা বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল নয়। যোগে মন concentrated and one-pointed হয়। (সমাহিত ও কেন্দ্রগত হয়)। যোগে ধ্যানের পর সমাধিতেই একমাত্র

ছড়ানো মন এক হয়। তখন মন আর মন-রূপে থাকে না, মন তখন শুদ্ধচৈতন্যে রূপায়িত হয়। মন চঞ্চল ও অশান্ত, আর চৈতন্য অচঞ্চল ও শান্ত। আমাদের বেদান্তের গবেষণাগারে যে সত্যবস্তুর আবিষ্কার হয়—তা চিরদিনই অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত, কিন্তু আপনাদের বিজ্ঞানের লেবরেটরীতে (গবেষণাগারে) বহু তথ্যের ও তত্ত্বের আবিষ্কার হয়, কিন্তু তাদের অনেক-কিছুরই পরিবর্তন হয়। তাই অপরিবর্তনীয় শাশ্বত একটি সত্যের সন্ধান বিজ্ঞানীরা দিতে পারেন না'।

স্বামীজী মহারাজ পুনরায় বল্লেন : 'বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত universe (বিশ্বপ্রপঞ্চ) ক্রমাগতই বদলাচ্ছে (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল), আর আমরাও ঠিক তাই বলি। কিন্তু আমরা বেদান্তিরা বলি যে, ঐ পরিবর্তনের পিছনেও একটি নিত্য ও অপরিবর্তনীয় সত্যবস্তু আছে ও সেই সত্যবস্তুই জগতকে চলমান রাখে, আর সেই চলমানতারূপ পরিবর্তনকে অক্ষুণ্ণ রেখেও এমন একটি রাজ্যে মানুষকে উপনীত করে যে রাজ্যে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, কেবলই নিত্য ও শাশ্বত শান্তি ও আনন্দ। আমরা ঐ শাশ্বত শান্তি ও আনন্দেরই ভিখারী। আপনারাও তাই, তবে এখনও তার নির্দিষ্ট কোন সন্ধান আপনারা দিতে পারেন না। তাই আপনারা অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা এখনও পথে চলছেন, কিন্তু ঠিক লক্ষ্যে পৌছুতে পারেন নি। কিন্তু দর্শন অর্থাৎ বেদান্ত সেই চরম ও পরম-লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে'।

স্যর রমণ তখন জিজ্ঞাসা করলেন : 'পূর্বেও জিজ্ঞাসা করেছি আর এখনও বলি—আমরা দিনরাতই অবশ্য science (বিজ্ঞান) নিয়েই গবেষণা করি। আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কিছু কিছু বাণী পড়েছি এবং স্বামী বিবেকানন্দেরও কোন কোন গ্রন্থ পড়েছি। কিন্তু মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ, ব্রহ্মজ্ঞান এ'সবের যথার্থ অর্থ কিছু বুঝি না। তবে অশান্ত জীবনে যে শান্তি লাভ করা উচিত একথা সম্পূর্ণভাবে

বিশ্বাস করি ও বুঝি। তাই জিজ্ঞাসা করি যে, বিজ্ঞান দিয়ে কি মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না ?'

স্বামীজী মহারাজ ঈষৎ হেসে বল্লেন: 'আপনি বিদ্বান ও যুক্তিবাদী, তাই নির্দিষ্টভাবে ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম এ' সকল বিষয় বা তত্ত্ব বিশ্বাস না করলেও অশান্ত ও কর্মময় জীবনে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে চান। কিন্তু শান্তি, আনন্দ বা মুক্তি-সম্বন্ধে বেদান্ত বলে যে, ঐ বস্তু বা তত্ত্ব আমাদের মধ্যে সহজাতভাবেই আছে, কেবল সেই সম্বন্ধে সচেতন নই বলেই তার কথা ভুলে যাই। এই ভুল বা ভ্রান্তিকে বেদান্ত বলে মায়া। মায়াটা Illusion বা মিথ্যা-মরীচিকা নয়। একে বলে delusion, অর্থাৎ ভ্রম ও মিথ্যাজ্ঞান। মায়া তাই ভ্রম। তার সত্যকারের কোন সত্তা বা অস্তিত্ব নাই, অথচ ভুল বোঝায় ব'লে তার একটা মিথ্যাসত্তা স্বীকার করি। মরুভূমিতে mirage বা মরীচিকাও তাই। স্যর রমণ, এ'সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ?'

স্যর রমণ সামান্য একটু হেসে বল্লেন: 'আমরা বিজ্ঞানীরাও মিরাজ (mirage) বা মরীচিকা স্বীকার করি—যদিও সেটা চোখের ভুলদেখা। The Optics Mirages-সম্বন্ধে স্যর রমণ বল্লেন: "Mirages constitutes a remarkable group of effect arising from variations of the refractive index of the atmosphere. They are generally described as of two kinds, being respectively the socalled superior and inferior types of mirage. The latter are quite common and may be described as the manifestation above the level heated surface of the earth of a reflection of the sky and other elevated objects : the latter appear as inverted images against the background of the reflected objects at the surface of a pool or lake. The superior type of mirage arises when the thermal conditions of the atmosphere are the reverse of those

which give rise to mirages of the inferior type ; they are observed when the atmosphere rests on a cold level surface above which there lies a hot stratum of air. Objects at or near the level of the cold surface are usually visible to the observer... Pictures of both types of mirage are to be found reproduced in many treatises on optics and materology." তিনি এ'সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মোঙ্গে (Monge), পারন্‌টার (Pernter), এক্সনার (Exner), হিলার (Hiller) ও অধ্যাপক স্নেল (Snell) ও তাঁর law of refraction-সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন স্যর রমণ'।

স্যর রমণ পুনরায় বল্লেন : 'বৈজ্ঞানিকদের মতে 'the actual mirage is observed when the eye is kept at any point which lies on the bright strip of light lying to the left of the caustic, the eye being focussed on the plane containing the object, i. e. at infinity'.

সংক্ষেপে মিরাজ বা মরীচিকা-সম্বন্ধে আলোচনা করলেন স্যর রমণ। স্বামীজী মহারাজ স্বীকার করলেন স্যর রমণের মিরাজ-বিশ্লেষণের কথা এবং বল্লেন যে, আমাদের ভারতীয় দার্শনিকদেরও প্রায় ঐ এককথা। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে সূর্যের আলোকে এমন একটা দৃশ্য সৃষ্টি হয়—যাকে বলা যায় জল, অথচ সেটা ঠিক জল নয়। বহু পশু ও এমনকি মানুষও মরীচিকাকে সত্যকারের জল ব'লে মনে ক'রে ভ্রম করে। কাছে গিয়েও তাই বিফলমনোরথ হয় তারা। আমাদের বেদান্তদর্শনে—বিশেষ ক'রে অদ্বৈতবেদান্তে মায়ার প্রকৃতি ঐ মিরাজের মতোই ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে'।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'The mirage is formed and found in the desert. We see water in a mirage at a distance. When we get nearer, we are free from error or delusion, and find no water but only a heep of burning sands. It can be said that at that time our delusive false notion or sight is corrected. Here the

effect i. e. appearance is a thorough delusion even in the realm of empirical realities. The water that appears to be seen as real is no more present over the burning sands, just as the snake in the rope, or the piece of silver in the mother-of-pearl that we mistake them respectively to be really not true.

'Now this delusive appearance has been explained by the Advaita Vedanta philosophers with the help of three doctrines, reflection theory, limitation theory and appearance theory. In fact, the mirage is no other than the deceptive false appearance. It is corrected by right knowledge of the mystery of mirage. Similarly we are deluded and confounded in this world of appearance. We take false thing as real thing. So this delusion or *maya*, which is a false knowledge, should be removed i.e. corrected by the help of right knowledge. This right knowledge can be said to be the Atman or Brahman in Vedanta. When the right knowledge of the Atman or Brahman dawns upon a man, he realizes that all the objects, animate and inanimate, are pervaded by the whole and stupendcus Atman or Brahman knowledge. Then the false knowledge or mirage is totally removed i.e. corrected, and the realized man enjoys the eternal peace and happiness'.

(অর্থাৎ মরীচিকা মরুভূমিতেই সৃষ্টি হয় ও দেখা যায়। তখন মরুভূমিতে দূরে আমরা জল দেখি। কিন্তু যখন কাছে যাই তখন আর জল থাকে না, তখন তার পরিবর্তে সেখানে দেখি তপ্ত বালুকারাশি। তখনই বলতে গেলে আমাদের বালুকারাশিকে জল ব'লে ভুল দেখার অবসান হয়। সুতরাং সেখানে হয় কি আসলে ? আপাতদৃষ্ট বাস্তব জগতেও তখন ভুল-দেখা বালুকারাশিকে জল ব'লে ভ্রম করি

—যেমন দড়িতে ভাসমান ভুল-সাপ্ বা ঝিনুকে ভাসমান রূপা। এই সকল ক্ষেত্রেই আমরা মিথ্যাকে সত্য ব'লে দেখে ভুল করি।

অদ্বৈতবেদান্ত মিথ্যাকে সত্য বলে দেখার তিন রকমভাবে ব্যাখ্যা করে। এই তিন রকম ব্যাখ্যা করে প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদ-বাদ ও আভাসবাদের সাহায্যে। আসলে মরু-মরিচীকা মানুষের মিথ্যা-বুদ্ধিকে সত্য ব'লে দেখায়—যেমন উত্তপ্ত বালুকারাশিকে জল ব'লে ভ্রম হয়। তাই মরীচিকার স্বরূপের সত্যজ্ঞান হলে অর্থাৎ মরীচিকাকে মরীচিকা বলে দেখলে মরীচিকাআর থাকে না।)

'সত্যকারভাবে আপাতবিরোধী মিথ্যাজ্ঞানের জগতে তাই সত্য-স্বরূপ আত্মার বা ব্রহ্মের জ্ঞান হ'লে ভ্রমরূপ মায়ার অবসান হয়, আর তখন মানুষ দিব্যজ্ঞানরূপ আত্মার বা ব্রহ্মের সত্যজ্ঞান লাভ ক'রে মুক্তি লাভ করে বলতে মায়া বা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আলোকরূপ শান্তি ও আনন্দময় জীবন সে লাভ করে। আসলে 'মুক্তি'-কথার অর্থ দিব্যজ্ঞানরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা'।

স্যর রমণ স্থিরভাবে স্বামীজী মহারাজের কথা শুনছিলেন। তিনি বল্লেন: 'কিন্তু তাহলেও তো পরিবর্তনশীল জগতের কার্যাবলীর সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত, তা থেকে আলাদা নই?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'ঠিক কথা। আমরা পরিবর্তনশীল জগতের সকল ঘটনা ও কার্যকেই আপাতত সত্য ব'লে মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করি, কিন্তু এই ব্যবহার আমাদের মিথ্যা, ঠিক সত্য নয়। একেই ব্যবহারিক-সত্তা বলে। কিন্তু এর পরে বা পারে পারমার্থিক-সত্তা আছে—যা শাশ্বত ও পরিবর্তনহীন। আমরা দড়িকে সাপ ব'লে দেখি, শুক্‌নো কাঠকে ভূত ব'লে দেখি, ঝিনুককে রূপো মনে করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি দড়ি, শুকনো-কাঠ ও ঝিনুক সত্য সত্য সাপ, ভূত বা রূপো? মোটেই তা নয়। তবে কি জানেন স্যর রমণ, ঠিক ঠিক দর্শন বা অপরোক্ষ-ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া-পর্যন্ত

মনের ভুল ও চোখের ভুল এ'ধরনের হতেই থাকে। সত্যজ্ঞানরূপ সকল জিনিসের background বা অধিষ্ঠানের জ্ঞান যতদিন না হয়, ততদিন মায়াকে ভুলজ্ঞান ব'লে মনে হয় না। এরই জন্য সাধনা দরকার। সাধনা বলতে spiritual dicipline. যোগশাস্ত্রে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা আছে। সমাধি যোগের ও প্রত্যক্ষ-বা অপরোক্ষ-ব্রহ্মজ্ঞান বেদান্তের। তাই ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা direct knowledge না হওয়া-পর্যন্ত আমরা ভুলের মধ্যেই থাকি, আর সত্যজ্ঞানের কথা মনে হয় না। মনে হওয়ার অর্থ এখানে উপলব্ধি বা direct knowledge'.

স্বামীজী মহারাজ পুনরায় বল্লেন : 'স্যর রমণ, আপনি যে প্রথমে বল্লেন আপনি man of science (বিজ্ঞানের লোক), সুতরাং জিজ্ঞাসা করেছেন বিজ্ঞান দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান হ'তে পারে কিনা? আমি বলি—নিশ্চয়ই হ'তে পারে। Science can discover the ultimate Truth'.

কিছুক্ষণের জন্য কথাবার্তার বিরতি হ'ল। একজন সেবক স্যর রমণকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসাদ এনে দিলেন এবং স্যর রমণ শ্রদ্ধাচিত্তে তা গ্রহণ করলেন।

এবার স্বামীজী মহারাজ প্রসন্নচিত্তে স্যর রমণকে উদ্দেশ ক'রে ধীরে ধীরে বল্লেন: 'ওদেশে (পাশ্চাত্যদেশে) আমাকে নানান্ কাজে ব্যস্ত থাকতে হ'ত। ভারতের বেদান্তের কথা, বিভিন্ন শাস্ত্রের ও যুক্তির কথা এবং বিশেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ প্রভৃতি-সম্বন্ধে জানার জন্য বহু মনীষী, অধ্যাপক ও ছাত্রেরা উদ্‌গ্রীব থাকতেন। সেজন্য আমাকে ব্রুক্‌লিন, হার্বার্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, কলম্বিয়া প্রভৃতি ইউনিভার্সিটিতে ঐ সকল বিষয়-সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতে হ'ত ও ক্লাশ নিতে হ'ত। বিভিন্ন জিজ্ঞাসু মানুষও আমার বক্তৃতায় ও ক্লাশে যোগদান করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই

সায়েন্সের ভিতর দিয়ে দর্শনের তত্ত্ব জান্‌তে চাইতেন। এ'সব হ'ল আজ থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার কথা। সায়েন্সের বই আমি নিয়মিত পড়ে বেদান্তদর্শনের সঙ্গে তাদের একটা সামঞ্জস্য রেখে বক্তৃতা দিতাম ও ক্লাশ করতাম, তারা শুনে বিশেষ আনন্দ পেতেন। এখনও সেই সব বিভিন্ন অধ্যাপক ও জিজ্ঞাসুকদের বিভিন্ন প্রশ্নের ও আলোচনার কথা মনে আছে। এজন্যই তো Scientific Basis of Religion, Religion of the Twentieth Century, Cosmic Evolution and Its Purpose প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলাম। সেজন্যই বলি যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের বিরোধ কোনখানে নেই, যা আছে তা আপাতদৃষ্টিতে। বিজ্ঞান হয়তো এখন পথে চলেছে, আর দর্শন তাঁর চরমলক্ষ্যে পৌঁছেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ মিলন একদিন উভয়ের মধ্যে হবেই হ'বে ঈশ্বরলাভরূপ চরমলক্ষ্যে উপনীত হ'য়ে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স-প্লাঙ্কের কথা। তিনি অদূর-ভবিষ্যতে এ'দুটির মধ্যে পরিপূর্ণ মিলনের কথা উল্লেখ করেছেন'।

স্যর রমণ বল্লেন : 'আপনার স্মরণশক্তি অদ্ভুত ও অসাধারণ। এটা কিভাবে সম্ভব হ'ল ?'

স্বামীজী মহারাজ হেসে বল্লেন : 'এটা অখণ্ড-ব্রহ্মচর্যের ফল। সেজন্য প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করার জন্য ব্রহ্মচর্যকে তার সহায়ক বলেছেন। তাছাড়া যোগাভ্যাস করা জীবনে প্রয়োজন। ঋষি পতঞ্জলি ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা তাঁর পতঞ্জল-দর্শনে বলেছেন। জীবনে সমাধি লাভ হলেই সব হয়ে গেল —'কিঞ্চিৎ নাবশিষ্যতে'—আর কিছু জানতে বা পেতে বাকী থাকে না। বেদান্তে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের কথা আছে। শ্রবণের পর মনন ও মননের পর নিদিধ্যাসন। এই নিদিধ্যাসনে ব্রহ্মবিদ্যার প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি হয়। তবে বেদান্তের বিবরণ-সম্প্রদায়

শ্রবণকে অর্থাৎ শ্রবণরূপ বিচারকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। যোগের সমাধি হ'ল নির্বিকল্পসমাধি, আর অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্মানুভূতি এককথা।'

স্যর রমণ করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন: 'Can I ask you one thing? Have you attained the samadhi, and received Brahmajnana in your life?'

স্বামীজী মহারাজ হেসে বল্লেন: 'Yes, I have attained them through the grace of my Guru, Ramakrishna Paramahansa?'

স্যর রমণ তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং স্বামীজীও উঠে দাঁড়িয়ে স্যর রমণকে Cosmic Evolution and Its purpose, Religion of the 20th Century এবং Scientific Basis of Religion- বই-তিনখানি সেবককে নিজের ঘর থেকে আন্‌তে বল্লেন এবং সেবক আন্‌লে স্যর রমণকে সেগুলি উপহার দিলেন। স্যর রমণ বই-তিনখানি নিয়ে মাথায় ঠেকালেন। তিনি প্রথমে যখন এসে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তখন দু'হাত তুলে প্রণাম ক'রেছিলেন, কিন্তু এবার একেবারে সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে শুয়ে স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করলেন। স্বামীজী মহারাজ স্মিতহাস্যে জোড়হাত ক'রে স্যর রমণকে বল্লেন: 'Very happy to meet you today. I request you to come again with your devoted wife in the next time?'

স্যর রমণ প্রণাম ক'রে ওঠে জোড়হাত ক'রে বিদায় নিয়ে বল্লেন: 'Tomorrow morning we are getting down to the plane. Certainly I shall remember your love and request'. স্বামীজী মহারাজ Visitors Room-এর বাইরে এসে স্যর রমণকে বিদায় দিলেন ও স্যর রমণ উপরে উঠতে উঠতে মাঝে মাঝে হাত তুলে স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম জানাতে জানাতে চলে গেলেন'।

॥ স্মৃতি : পনেরো ॥

সকাল ১০টা। আমরা দু'জন হাজির হলাম স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম ক'রে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো ব'লে। সচরাচর সকাল ১০টায় আমরা যাইই কম, কিন্তু কি জানি কেন প্রাণের টানে ও আকুলতায় একবার স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করার ইচ্ছা হ'ল। আমরা সোজাসুজি গিয়ে মহারাজের অফিস-ঘরে (কলিকাতা) প্রবেশ ক'রে প্রণাম করলাম পায়ে মাথা রেখে। স্বামীজী মহারাজ তখন একাই ঘরে বসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: 'কি গো, হঠাৎ এখন কি মনে ক'রে ?' আমরা বল্লাম: 'আমরা এলাম মহারাজ— দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য'। স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'কি কথা বলো'। আমরা মাথা নীচু ক'রে বল্লাম: 'ঈশ্বরলাভ, আত্মা, মুক্তি, ভগবান এ'সব কথার অর্থ কিছু-কিছু বুঝি, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কাকে বলে এটা বিশেষ বুঝি না'।

স্বামীজী মহারাজ হেসে বল্লেন: 'বলো কি ? ঈশ্বরলাভ, আত্মা, মুক্তি, ভগবান—এ'সব কথা কিছু-কিছু বোঝ। তাহলে তো দেখছি সব-কিছুই তোমরা বোঝ, বোঝার আর বাকী কি বলো ?'

আমরা বল্লাম: 'না মহারাজ, গীতায়, উপনিষদে, ব্রহ্মসূত্রে ও অপরাপর শাস্ত্রে 'ব্রহ্ম'-শব্দের উল্লেখ দেখি, কিন্তু ব্রহ্ম বলতে সত্যকারের কি বোঝায় ? বা ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুভূতি কি তা ঠিক ঠিক বোঝা অত্যন্ত কঠিন'।

স্বামীজী মহারাজ: 'তোমরা ঠিক বল্লে না। তোমরা ঈশ্বর লাভ কাকে বলে জানো, আত্মা কি, মুক্তি কি, ভগবান কি—এ'সব জানো, অথচ ব্রহ্ম কাকে বলে, বা ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি কাকে বলে—তা জানো না।'

'তবে শোন', স্বামীজী মহারাজ বল্লেন—'তবে শোন। ঈশ্বরলাভ, আত্মা, মুক্তি, ভগবান প্রভৃতি যাকে বলে, তার নামই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম হ'লেন মহাচৈতন্য, অর্থাৎ যাকে বলে সর্বত্রবিস্তৃত ও সর্বব্যাপকচৈতন্য। ব্রহ্ম সমুদ্রের মতো যেন অসীম অনন্ত জলরাশি—যে জলের কুল-কিনারা নাই। যেমন অসীম ও সর্বত্রবিস্তৃত আকাশ—যে আকাশের অন্ত নাই, সীমা নাই—অনন্ত ও অসীম। উপনিষদে ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাই আকাশের সঙ্গে তুলনা ক'রে—'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ'। এই আকাশের কথা আমি পূর্বেও বহুবার বহু স্থানে তোমাদের বলেছি। দার্শনিকরা এর উদাহরণ দেন বিশালতা ও ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য। কিন্তু ব্রহ্ম আকাশ নয়, বরং আকাশের আধার ও ধারক। যা ব্যাপক তাই ব্রহ্ম। যা অনন্ত, অখণ্ড ও সর্বতবিস্তৃত, তাই ব্রহ্ম—'ব্যাপকত্বাৎ ব্রহ্ম'। ব্রহ্মের অভিন্ন শব্দ বিষ্ণু—'ব্যাপকত্বাৎ বিষ্ণুঃ'। এর অর্থ হ'ল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে -জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে সর্বত্র। এমন স্থান নাই যেখানে সত্তারূপে, মহাপ্রাণরূপে চৈতন্যরূপে ব্রহ্ম বর্তমান না আছেন। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মসত্তা এক ও অভেদ। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, বৃক্ষ, লতাপাতা, সমুদ্র, নদ-নদী, স্থাবর-জঙ্গম, চেতন-অচেতন যা-কিছু আছে সবই ব্রহ্মের অর্থাৎ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মের দ্বারা আবৃত—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'।[১] ঈশ অর্থে ঈশ্বর অর্থাৎ ব্যাপকব্রহ্ম। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—ব্রহ্মচৈতন্যরূপে ও মহাপ্রাণরূপে আছেন ব'লে তবেই সকল-কিছুর সত্তা আছে। বেদান্তে যদিও ব্রহ্মকে 'বস্তু' বলা হয়েছে, তাহলেও সেই বস্তু কিন্তু ঘটি-বাটির মতো জড়পদার্থ নয়। ব্রহ্ম চৈতন্য বা চৈতন্যঘন। ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ। ব্রহ্ম আছে বলেই সকল-কিছুর প্রকাশ (চিৎ) এবং প্রকাশের জন্য আনন্দ। অস্তি, ভাতি, প্রিয়ের একই অর্থ। এখন বুঝলে ব্রহ্ম কি? ব্রহ্মই আবার সগুণ ও নির্গুণ। বেদান্ত হয়তো

১। 'তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম'—গীতা ৩।১৫

বলবে ব্রহ্ম শুদ্ধ ও অশুদ্ধ—অখণ্ড ও খণ্ড। ব্রহ্ম শুদ্ধ বলতে ব্রহ্মের সহকারীরূপে মায়া-মলিনতাহীন ব্রহ্ম, আর ব্রহ্ম অশুদ্ধ বলতে ব্রহ্মের সঙ্গে মায়া থাকে। ঐ মায়াকেই বেদান্তীরা শক্তি বলেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সে'কথাই বলেছেন। মায়াশক্তিকে নিয়ে ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে পরিচিত। আবার তিনি অবতার হন। শক্তিরই অবতার। শক্তি বলতে মায়াশক্তি'।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : 'মহারাজ, মায়াকে শক্তি বলে কেন ?'

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন : 'ভাল কথা বলেছ। শক্তিরই স্পন্দন, স্ফুরণ, গতি, কার্য প্রভৃতি হয়। শক্তির সাহায্য নিয়ে ব্রহ্ম বলতে সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর বিশ্বের ও জীবের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন। শক্তি না থাকলে ক্রিয়া হয় না। শক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই 'খাদ' বলেছেন। খাদ কিনা শুদ্ধ নয়, নির্গুণ নয়। নির্গুণ ও শুদ্ধচৈতন্যরূপ ব্রহ্মে মায়ারূপ খাদ মিশলেই সৃষ্টি-স্থিতি-পালন-ধ্বংস প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রকাশ হয়। খাদরূপ মায়াশক্তিকে বেদান্ত অঘটনঘটন-পটিয়সী মায়াশক্তি বলেছে। এর অর্থ মায়া শক্তিরূপে ও কার্যরূপে জগতে সকল-কিছুই করতে পরে, পারে না এমন কিছুই নাই। মহাশান্তিরূপ চৈতন্যের স্পর্শ যাঁরা চান, তাঁদের তাই মায়াশক্তির পারে যেতে হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন : 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'। মায়াসমুদ্র অনন্ত অসীম, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে মায়াও সান্ত ও সসীম বলে মনে হয়'।

'তবে কি জানো ?', স্বামীজী মহারাজ বল্লেন,—'মায়াই অজ্ঞান'। অজ্ঞানের পারে না গেলে ব্রহ্মকে জানা অর্থাৎ উপলব্ধি করা যায় না। ব্রহ্মের উপলব্ধি তাই মুখের কথা নয়। এতটুকু মায়া বা অবিদ্যারূপ অজ্ঞান থাকলে বৃহৎ ও সর্ববিস্তারী চৈতন্য ব্রহ্মকে জানা যায় না। ব্রহ্মকে জানার নাম ব্রহ্মের উপলব্ধি। বেদান্ত তাই বলেছে—'ব্রহ্মকে যে জানে, সে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে'—

'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর, ভগবান, মোক্ষ, মুক্তি, নির্বাণ, শান্তি এ' সকল শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বা ব্যাপকচৈতন্য। সুতরাং ব্রহ্মকে সাধারণভাবে জানবে কি ক'রে—যদি না না-জানা-রূপ অজ্ঞানের পারে যাও। অজ্ঞান অন্ধকার, আর ব্রহ্মজ্ঞান আলোক। তাই আলোকে যেমন অন্ধকার দূর হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে তেমনি অজ্ঞানের নাশ হয়। অজ্ঞানের নাশই জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। এখন বোঝ যে, ব্রহ্ম কি ও ব্রহ্মের অনুভূতি কাকে বলে? আমরা বল্লাম: 'এই বোঝা বড়ই কঠিন মহারাজ'।

স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'কঠিন বলেই তো সহজে বোঝা যায় না, বা জানা যায় না। তবে একেবারে বোঝা বা জানা যায় না—একথা ঠিক নয়। ব্রহ্মকে আত্মার আত্মা ও প্রাণের প্রাণ ব'লে বোঝা যায়। এই বোঝার নাম অপরোক্ষানুভূতি। অপরোক্ষ বলতে প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মের স্বরূপকে জানা যায়—যেমন ঘটি, বাটি ও পৃথিবীর সকল মানুষ, জীবজন্তু ও বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা ও জানা যায়। সুতরাং ব্রহ্ম অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় হবে কেন? হার্বার্ট স্পেন্সার ও কাণ্ট ব্রহ্মকে অর্থাৎ এ্যাবসোলিউট বা থিঙ্-ইন্-ইট্সেলফকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলেছেন। বলেছেন unknown and unknowable। এজন্য অনেক দার্শনিক স্পেন্সার ও কাণ্টের সমালোচনা ক'রে বলেছেন by which we know the Absolute or Thing-in-Itself as unknown and unknowable, that is absolute Truth,—অর্থাৎ যে জ্ঞান দিয়ে স্পেন্সার ও কাণ্ট ব্রহ্মকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলেছেন সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম। জ্ঞান দিয়েই সর্বগত জ্ঞানরূপ ব্রহ্মকে জানা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম supersensible পরমজ্ঞান —যে জ্ঞানকে এই জড়-ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়জ্ঞানের গোচর বা প্রত্যক্ষ। সুতরাং ব্রহ্মকে যদি জানতে চাও তবে ইন্দ্রিয়ের পারে যেতে হবে। যোগী

যাঁরা, যথার্থ জ্ঞানী যাঁরা, তাদের একটা Third Eye বা তৃতীয় চক্ষু হয়। এই তৃতীয় চক্ষুর নাম প্রজ্ঞা। দেবতাদের ও দেবীদের তৃতীয় চক্ষু বা প্রজ্ঞাচক্ষু থাকে। প্রজ্ঞাচক্ষু দিয়েই সীমাহীন অসীম অনন্ত সর্ববিস্তারী ব্যাপকচৈতন্য ব্রহ্মকে জানা ও উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়—এ'কথা সত্য'।

স্বামীজী মহারাজের মুখ রক্তিম ও প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি এমনই জোরের সঙ্গে 'ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়' বল্লেন সে'কথা এখনো আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে আছে। আমরা সেই কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম ও ভাবলাম—জানি না আমাদের জীবনে সেই উপলব্ধি হবে কি-না! আমরা সকলেই স্তব্ধ। নীরবে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম।

আমাদের নীরবে বসে থাকতে দেখে স্বামীজী মহারাজ বল্লেন: 'কি, বুঝেছ ব্রহ্ম কি বা ব্রহ্ম কাকে বলে? ব্রহ্মের রূপ বিশ্ব-বৈচিত্র্যের রূপ, আবার তিনি সকল রূপ ও সকল নামের অতীত—অরূপ ও অনামী। নাম ও রূপই ব্রহ্মের আসল রূপে বা সত্তায় ভেদ সৃষ্টি করে—'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'। জ্ঞানী অনুভব করেন ব্রহ্ম সর্বরূপে ও সর্বনামে অনুস্যূত, আবার তিনি সকল রূপবিহীন ও নামবিহীন। আবার স্বর্গত ও সর্বাতীত এক ও অখণ্ড ব্রহ্মকে অনুভব বা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন জ্ঞানীরা ও যোগীরা। এই প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির নাম বেদান্তে অপরোক্ষানুভূতি—সেকথা তোমাদের পূর্বেই বলেছি। এই অনুভূতির মধ্যে কোন সংশয় বা সন্দেহ থাকে না। যথার্থভাবে ব্যাপক-ব্রহ্মসত্তার অনুভব হয় জীবনে। অনুভব হয় যে, ব্রহ্ম-ছাড়া কোন বস্তুরই অস্তিত্ব বা সত্তা থাকতে পারে না। তাঁর থাকতেই সকল-কিছুর থাকা। এই অনুভূতির নামই জ্ঞান। অজ্ঞান তার বিপরীত'।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'মহারাজ, ব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপনিষদে

বা বেদান্তে, গীতায়, ভাগবতে, যোগবাশিষ্টরামায়ণে এবং আরও কত কত গ্রন্থে বা শাস্ত্রে আছে, কিন্তু কোন্ শাস্ত্র ব্রহ্মের ও তাঁর অনুভূতির পরিচয় দিয়েছে প্রত্যক্ষভাবে ?'

স্বামীজী মহারাজ আমাদের কথা শুনে হেসে বল্লেন : 'তোমরা খুব সহজ কথায় ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝতে চাও। কিন্তু কিভাবে বুঝবে ? মন, বুদ্ধি ও বোধি এই তিনটি সাধারণ উপায় ব্রহ্মতত্ত্ব বোঝার জন্য। মনে কল্পনা করো ব্রহ্মসম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য শুনে, বুদ্ধি বিচার ক'রে নির্ধারণ করতে চেষ্টা ক'রে সেই তত্ত্ব, আর পরিশেষে বোধি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। বোধি বলতে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। কিন্তু আসল সমস্যা কি জানো ? মন ও বুদ্ধি ব্রহ্মতত্ত্ব ঠিকঠিকভাবে নির্ধারণ করতে অক্ষম, কেননা ব্রহ্ম চৈতন্যরূপে মন-পদার্থ থেকে আলাদা। আবার বুদ্ধি-পদার্থ থেকেও ব্রহ্মচৈতন্য সম্পূর্ণ পৃথক। সেজন্য উপনিষৎ বলেছে : 'মনসা বা মনুতে', 'অবাঙমনসগোচরম্'। মন ও বুদ্ধি যে উপাদানে সৃষ্টি, ব্রহ্মচৈতন্য সেই উপাদান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মন ও বুদ্ধি পার্থিব রাজ্যের বস্তু, আর পার্থিব-বস্তুমাত্রেই অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য। ব্রহ্মবস্তু বা ব্রহ্মচৈতন্য কিন্তু পার্থিব পদার্থ ও অজ্ঞানের অতীত। ব্রহ্মবস্তু সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ এবং অজ্ঞান-মালিন্যবিহীন'।

'ব্রহ্ম হ্রাস-বৃদ্ধির ও জন্ম-মৃত্যুর অতীত। তাই বস্তু-হিসাবে, সত্তা-হিসাবে ব্রহ্মের সঙ্গে মনের ও বুদ্ধির কোন সাদৃশ্য নাই। ব্রহ্ম অসঙ্গ, আবার সকল-কিছুতেই তিনি আছেন ! তিনি নিষ্কারণ, আবার সকল-কিছুরই কারণ। তিনি দূরে, আবার সবারই অন্তরে অন্তর্যামীরূপে বিরাজিত। এজন্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে (২৯শ শ্লোকে)—

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।

আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।

পরমাত্মাস্বরূপ ব্রহ্মকে দেখে, শুনে, বলেও তাঁর প্রকৃত স্বরূপ কেউ জানতে পারে না। এজন্যই উপনিষৎ বলেছে দুর্বিজ্ঞেয়, আশ্চর্য ও অসাধারণ। ব্রহ্মকে যদি কেউ উপলব্ধি করেন তাহলেও তিনি ব্রহ্মসম্বন্ধে স্বরূপত কিছু বলতে বা বোঝাতে পারেন না। ব্রহ্মকে বোঝার পথ কঠিন ও দুর্গম—'দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। কবি কিনা যাঁরা জ্ঞানী ও ব্রহ্মবিদ্। ব্রহ্মজ্ঞানীরাই বলেছেন যে, ব্রহ্ম যে কি বস্তু, তাঁকে প্রাণে প্রাণে বোঝা যায় বা অনুভব করা যায়, কিন্তু কাকেও বোঝানো যায় না। বোঝাতে গেলেই তো কথার বা ভাষার দরকার। কিন্তু কথা বা ভাষা তো পার্থিব বস্তু, সুতরাং অজ্ঞানের জিনিস। অজ্ঞানের বস্তু দিয়ে তাই জ্ঞানের বস্তুকে কোনদিনই বোঝানো যায় না। তোমরা হয়তো ভাববে বা বলবে যে, এ'সব তো জানা জিনিস, অনেকবারই আমরা শুনেছি। কিন্তু শুনেও ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবে না। তথাকথিত বিদ্বান ও পণ্ডিত-মানুষও অক্ষম বুঝতে ও বোঝাতে। এজন্যই উপনিষৎ বারবার বলেছে উপলব্ধিবান আচার্যের কথা। ব্রহ্মতত্ত্বকে বোঝা যায় ও জানা যায়, তবে তার পথ ও উপায় সম্পূর্ণ পৃথক। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে (২৩ শ্লোকে) আছে—

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥

সকল আসক্তিহীন বলতে স্বার্থের বাসনা-কামনাশূন্য, মুক্ত অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্মরূপ ভাবের অতীত, তত্ত্বজ্ঞানসমাহিত মন ও বুদ্ধিযুক্ত, আর যিনি ঈশ্বরের পূজা মনে ক'রে সকল কর্তব্যকর্ম করেন, একমাত্র তিনিই ব্রহ্মস্বরূপকে তত্ত্বত অর্থাৎ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে

পাবেন। তার কারণ মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান দূর হয় ব'লে কোন কর্ম আব জ্ঞানীকে ফলভোগ কবার জন্য মোহিত করতে পারে না—'কারণোচ্ছেদেন তত্ত্বদর্শনাৎ বিলীয়তে বিনশ্যতি' ; কিংবা বলেছেন : 'সহেতুকস্য কর্মণো জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধত্বাৎ'—ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি সকল সংশয় ও সন্দেহরূপ অজ্ঞানকে ভস্মিভূত করে সুতরাং অজ্ঞান আর থাকে না। এর নামই মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা'।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : 'মহারাজ, গতসঙ্গ বা সকল বাসনা-কামনাহীন হওয়া কি সহজ কথা? সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান বলতে ব্রহ্মজ্ঞানের—'অহং ব্রহ্মাস্মি' ও 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-তত্ত্বের প্রত্যক্ষ-অনুভূতি না হওয়া-পর্যন্ত 'গতসঙ্গ', 'মুক্ত' 'জ্ঞানাবস্থিতচেতস' হওয়া কঠিন'।

স্বামীজী মহারাজ সহাস্যে বল্লেন : 'আমিও তো সেকথাই তোমাদের বলেছি যে, আগে ব্রহ্মের সম্যক্-অনুভূতি, তারপর সকল স্বার্থের কামনাহীন হ'য়ে সংসারে জীবনযাপন করা। কিন্তু এই ব্রহ্মদৃষ্টি হয় কি করে? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অব্যর্থ একটি মন্ত্রের আভাস দিয়েছেন - যেটি জানলে ও করলে নিজের মধ্যে ও বিশ্বচরাচরের মধ্যে ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি হয়। সে' মন্ত্রটি হ'ল—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

কর্মরূপ যজ্ঞে অর্পণ বা আহুতি ব্রহ্ম, হবিঃ বা দ্রব্য ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, অর্পণকারী কর্তা ব্রহ্ম, সমস্তই ব্রহ্ম। সুতরাং এরূপ ব্রহ্মাত্মক কর্মে যাঁর চিত্ত একাগ্র, তিনিই ব্রহ্মকে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন'।

'এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইচ্ছা, প্রেরণা, কর্ম, কর্তা, করণ, আধার ও আধেয়—সমস্তই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মচৈতন্য। চৈতন্যরূপ সাগরে সকলে ও সকল-কিছুই ডুবে আছে। তাই সত্তা একমাত্র ব্রহ্মরূপ

চৈতন্য। এই জ্ঞানের নাম সর্বাত্মকজ্ঞান, অর্থাৎ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

'তোমরা যখন খেতে বসো, তখন এই মন্ত্র প্রতিদিন উচ্চারণ করো। তার কারণ যে, খাদ্য, খাওয়ারূপ ক্রিয়া, খাদক অর্থাৎ খাদ্য যে গ্রহণ করে—সকল-কিছুই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য-কিছু নয়। ব্রহ্মদৃষ্টির এখানে প্রশংসা করা হয়েছে। এরই নাম মন্ত্রসাধনা ও সিদ্ধি দু'টোই, কেবলই গতানুগতিক উচ্চারণ নয়। কিন্তু তোমরা যখন খাওয়ার পূর্বে মন্ত্র পড়ো, এ'সব কি চিন্তা করো? তবেই বস্তুর ও তত্ত্বের ধারণা ক্যামন ক'রে হবে? দিনই খাও এবং দিনই পড়, অথচ পড়ার ও ধারণার সার্থকতা কিছুই বোঝ না। এখানে আচার্য শঙ্কর বলেছেন : 'যথা প্রতিমাদৌ বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধিঃ, যথাবা নামাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিরিতি,'—অর্থাৎ প্রতিমাতে যেমন দেবতা বা দেবীবুদ্ধি ক'রে পূজা করা হয়, কিংবা নামাদিতে যেমন নামী বা দেবতা ও দেবীবুদ্ধি করা হয়, তেমনি মানুষে, জীবজন্তু ও সকল-কিছুতে ব্রহ্মবুদ্ধি ও ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়। এই বুদ্ধি ও দর্শনকেই আচার্য শঙ্কর 'সম্যগ্‌দর্শন' বলেছেন।

'সম্যগ্‌দর্শন বলতে সকল কর্মে, সকল বস্তুতে সকল বিষয়ে অকর্মরূপ আত্মবুদ্ধি। আচার্য শঙ্কর বলেছেন : 'সম্যগ্‌দর্শনঞ্চ প্রকৃতং কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ'। গীতার সেই মন্ত্র : 'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ' (৪।১৮)। এরই নাম আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি। আর বলতে পারো তিনি পরমার্থদর্শী। সমস্ত কর্মের বা কর্মরূপ সাধনার উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি করা। মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন : 'কর্মানুষ্ঠানং তু স্বরূপতোঽন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারঃ উপযুজ্যতে'। চিত্তশুদ্ধি বলতে চিত্তের বা মনের যে সংকল্প ও বিকল্প দুটিবৃত্তি বা কাজ, তাকে দূর করা অর্থাৎ স্থির করা। চিত্তের বৃত্তি বা চাঞ্চল্য দূর হলেই চিত্ত চৈতন্যে রূপায়িত হয়। তখনই চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্যের মিলন একথা পূর্বে বলেছি। ঋষি পতঞ্জলি একথাই বলেছেন : 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থাম্'। যোগ হ'ল চিত্তবৃত্তিকে

স্থির ক'রে চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করার উপায়—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিঃ নিরোধঃ'। 'নিরোধ'বলতে স্থির করা—সমাধি। চিত্ত বা মন সমাধিসাগরে নিমজ্জিত হওয়ার অর্থই মনের স্বরূপ যে চৈতন্য তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সুতরাং নামে যেমন ব্রহ্মবুদ্ধি, প্রতিমায় যেমন ব্রহ্মবুদ্ধি করতে হয়, তেমনি ভাবতে হয় সকল সংকল্পের ও সকল কর্মের উৎস আত্মা বা ব্রহ্ম। এ'ভাবে সকল চিন্তায় ও সকল কর্মে ব্রহ্মদৃষ্টি ও ব্রহ্মবুদ্ধি আনার অভ্যাস করতে হয়। সেজন্যই 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ' (৪।২৪) মন্ত্র শুধু খাওয়ার সময়ে নয়, সকল সময়ে সকল কর্মের পূর্বেই উচ্চারণ, স্মরণ ও অনুভব করতে হয়। এটিই হ'ল ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায়। তবেই আসবে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই বোধ। এই সামগ্রিক ও সমষ্টিবোধের বা অনুভূতির নামই ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতি।'

॥ পরিশিষ্ট : দ্বিতীয় ॥

উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনকথা' (১ম ভাগ)-গ্রন্থে শৈশবকাল থেকে পাশ্চাত্যে রওহনা হওয়ার পূর্বপর্যন্ত জীবনের ঘটনাবলী সহজ-সরল ভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন এবং তা প্রকাশিত হয়েছে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে। কিন্তু ২৪শে ডিসেম্বর (১০ই পৌষ, শুক্রবার) আঁটপুরে বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দ) বাড়ীতে যখন স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ), স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি সকলে সমবেত হয়েছিলেন, সেই সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নি তাঁর জীবনীতে। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপার্ষদদের জীবনে ঐটি একটি মহত্তর স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। যে'দিন আঁটপুরে বাবুরাম মহারাজের বাড়ীতে সমবেতভাবে সন্ধ্যায় প্রজ্জ্বলিত ধুনির অগ্নিলিহার সম্মুখে সকলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে গৃহত্যাগ করেছেন, তখন গৃহে ফেরার আর কোন সঙ্কল্প তাঁদের জীবনে নাই, তাঁহাদের কাম্য ও লক্ষ্য সন্ন্যাসজীবন। ঐদিন (২৪শে ডিসেম্বর) ছিল যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব-দিবস—The Christmas Day. ঐদিন শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের ছিল প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের পবিত্র মুহূর্ত অর্থাৎ সন্ন্যাসজীবনই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁরা সে'দিন, কিন্তু ঐদিনে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি সেকথা পূর্বে বলেছি।

ঐ স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনাটির বিবরণ এখানে এ' প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ-লিখিত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (১ম ভাগ, ৩য় সংস্করণ, ভাদ্র ১৮৯৭; পৃঃ ২১৩—২১৫) থেকে এখানে উদ্ধৃত করলাম:

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ লিখেছেন: "বরাহনগর-মঠের তখনও সবে প্রাথমিক অবস্থা চলিতেছে এবং ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে সম্ভবত তারক, বুড়ো গোপাল, কালী ও শশী সেখানে স্থায়িভাবে আছেন, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত বাবুরামের বাড়ি আঁটপুর হইতে নিমন্ত্রণ আসিল, বড়দিনে সেখানে যাইতে হইবে। প্রথমে কথা ছিল নরেন্দ্র, বাবুরাম (বাবুরাম তখন কলিকাতায় ছিলেন) প্রভৃতি দুই-চারিজন যাইবেন, কিন্তু ক্রমে জানাজানি হইয়া বেশ একটি বড়দল জমিয়া গেল—নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন,

গঙ্গাধর ও সারদা ট্রেনে চড়িয়া সেখানে (আঁটপুরে) চলিলেন এবং সঙ্গে বাঁয়া-তবলা ও তানপুরা লইতে ভুলিলেন না।...তাঁহাদিগকে পাইয়া বাবুরামের মাতা শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী দেবী আনন্দে আত্মহারা হইলেন ও সকলকে পুত্রবৎ গ্রহণপূর্বক আহার ও শয়নাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন।...পল্লীর শ্যামল নির্জনতার মধ্যে এই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তপরিবারে স্বচ্ছন্দে আহার-বিহারের সুযোগ পাইয়া ত্যাগী যুবকবৃন্দ ভগবদারাধনা ও ভাবচিন্তায় প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা, উপদেশ, আদর্শ, জীবন ও তাঁহার অর্পিত দায় ইত্যাদিই তাঁহাদের অবিরাম সমালোচনার বিষয় হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র ব্যাখ্যা, স্তবস্তুতি, ভজন-সঙ্গীত-কীর্তন ও জপ-ধ্যান তো চলিতেই থাকিল। এইরূপ একটা জমাট ভাবের আকর্ষণে তাঁহারা তখন নিজ নিজ পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া নরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় এক অখণ্ড চৈতন্যসত্তায় পরিণত হইলেন। ইহারই মধ্যে ২৪শে ডিসেম্বর (১০ই পৌষ, শুক্রবার)এক অচিন্তনীয় ঘটনার ফলে আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার অনেক পরে বাহিরে ধুপ জ্বালিয়া নক্ষত্রখচিত উজ্জ্বল মুক্তাকাশের নিচে তাগী শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানবৃন্দ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ধ্যানান্তে তাঁহারা ঈশ্বরালোচনায় রত আছেন এমন সময় নরেন্দ্রনাথ ক্রমে যীশুখ্রীষ্টের ত্যাগ-তপস্যাপুত অপূর্ব জীবনকথা প্রাণস্পর্শী ভাষায় আদ্যোপান্ত অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহারপর সেণ্টপল হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন ত্যাগী শিষ্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মবিসর্জনের ফলে কিরূপে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টসম্প্রদায় প্রচারিত ও প্রসারিত হইল তাহার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে এক ত্যাগৈশ্বর্যমণ্ডিত প্রেরণায় নবীন রাজ্যে লইয়া গেলেন এবং সকলের নিকট সাগ্রহ আবেদন জানাইলেন—তাঁহারাও যেন যীশুখ্রীষ্ট ও তদীয় শিষ্যবৃন্দের ন্যায় পবিত্র জীবন গহণপূর্বক উহা জগৎকল্যাণে উৎসর্গ করিতে পারেন। সেই প্রাণপ্রদ বাগ্মিতার প্রভাবে গুরুভ্রাতার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরস্পরে সম্মুখে ধুনির লেলিহান অগ্নিশিখাকে সাক্ষী রাখিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে স্বীয় অটুট সঙ্কল্প জানাইলেন যে, তাঁহারা সংসার তাগ করিবেন। সম্মুখস্থ প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা তাঁহাদের ভাবোজ্জ্বল বদনোপরি প্রতিফলিত হইয়া সেই আবেগময় প্রতিজ্ঞাকে ভাস্বরতর করিল। সমস্ত বায়ুমণ্ডল যেন. অপূর্ব ভগবৎপ্রেরণায় শিহরিয়া উঠিল, আর স্তব্ধ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া সেই

অনুপম দৃশ্য প্রাণভরিয়া দেখিয়া লইল। পুনরায় সাধারণ ভূমিতে তাঁহাদের মন নামিয়া আসিলে তাঁহারা ভাবিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, সেই সন্ধ্যাটি ছিল যীশুখ্রীষ্টের 'আবির্ভাব-প্রাক্‌ক্ষণ'। পরবর্তীকালে সঙ্ঘগঠনে আঁটপুরের অবদানের কথা স্মরণপূর্বক পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ (তাঁরকনাথ) বলিয়াছিলেনঃ 'আঁটপুরেই আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার সঙ্কল্প দৃঢ় হ'ল। ঠাকুর তো আমাদের সন্ন্যাসী ক'রে দিয়েছিলেনই—ঐ ভাব আরও পাকা হ'ল আঁটপুরে'। এইভাবে আঁটপুরে এক সপ্তাহ কাটাইয়া তাঁহারা মঠে বা কলিকাতায় স্ব স্ব স্থানে ফিরিলেন"।

মনে উচিৎ রাখা যে, আঁটপুরে ঐ খ্রীষ্টমাস-উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের একত্রে সমবেত (মিলিত) হওয়ার পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠার ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার স্মৃতি ও ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে সর্বযুগবাহীরূপে।